

হঠাৎ সেদিন আমার সারামুখে একঝলক রক্ত উজিয়ে গেল, চামড়ার নীচে যার রং ছিল নিশ্চয়ই তাজা, টকটকে লাল। এর নাম কি তখন জানতাম না, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে, এই এখনো যেমন ফুটপাথ দিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি, সব স্পষ্ট হয়েছে। তবু সে কি নিষ্ঠুর বাস্তবতা সম্পর্কে চৈতন্যোদয়, না জীবনের কিছু ঐশ্বর্যের সঞ্চয়—যা শুধু একটু বেদনার রেশ রেখে গেছে? সেদিন সময় করেই গিয়েছিলাম, অনেক আশা বুকের ভিতরে নিয়ে। চীনে লণ্ঠন পাকা দুই থামের উপরে, দারোয়ান সালাম ঠুকে লোহার ভারী দরোজা খুলে দিল।

এক রাশ ঝক্‌ঝক্ কিচ্‌কিচ্ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল, পরক্ষণেই আবার তেমনি নীরবতা।

টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ অবিরাম চলছে আমার হাতঘড়ি। কব্জি উঠিয়ে দেখলাম, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়।

আমি জানতাম, আছেন তবু জবরদস্ত লোকটাকে খুশি করবার জন্য বললাম, সাহেব আছেন তো বাসায়।

সে আবার মাথা নোয়ালো এবং আমাকে খুশি করবার জন্য বলল, জ্বি হাঁ, স্যার আছেন। আপামণিও আছেন।

লুবনা, তুমি ভেবোনা আমি পুরো বেরসিক, কিংবা মাইনাস ফাইভ কাচের চশমার ভিতরে যে চোখজোড়া তা বহির্জগতের সৌন্দর্ন অবলোকনে অক্ষম। পা আমার এগিয়ে গেল। তবু প্রথম নজরেই দেখেছি তোমাদের বাড়িটা কেবল সুন্দর নয়, যেন ঝকঝকে ঐশ্বর্যেরও প্রতিচ্ছবি। সর্বাধুনিক ডিজাইন। নিশ্চয় প্রতিভাবান একজন স্থপতির কাজ। মরশুমী ফুলের সাজি বিস্তৃত লন। দেয়ালের কাছ ধরে সার দিয়ে লাগানো নিম-সুপারি আর মাঝে মাঝে নারকেল গাছ। গেটের দক্ষিণে শিউলি, উত্তরে কাঁঠালিচাপাকেয়ারিকরা ঝাউয়ের চারা। দোতলার সামনেটায় মুক্ত করিডোর, তিনদিক দিয়ে সাজানো লাল রং-করা টব। সামনে, কিছুদূরে একটা পোষ না মানা নদী থাকলে মন্দ ছিলো না ঃ পদ্মা কি মেঘনা, কিংবা কর্ণফুলী। এখানে নদী নেই, কিন্তু লেক আছে। ওই যে সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে ধানমন্ডি লেক, উপর থেকে তাকে দেখতে মন্দ লাগে না হয়তো। নদী নয়, কিন্তু নদীর উপমা। অনেক সময় উপমাই সুন্দরতর। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। অভ্যর্থনা পেয়েছি, তবু বুকের ভিতরটা কিঞ্চিৎ ঢিব্ ঢিব্ করছে আমার। একটু চিন্তিতও আমি। কি বলবেন তোমার অনারেবল্ ফাদার? এককালের বাঘা আদমী যার নামে নাকি বাঘে-মোষে একঘাটে পানি খেত। শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক নেতা। সোনায় সোহাগা। তাঁর বিস্তারিত ভাবনা-কল্পনার রাজ্যে আমি হয়তোবা ছোট্ট একটি মাছির বেশী নই। বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু মরা হাতিও তো লাখ টাকা। রাজ আসে রাজা যায়, তাঁর কাছে আসে সবাই, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয়পক্ষ পাকামাথার পরামর্শ গ্রহণের জন্য। এত ওলটপালট হোল, তাঁর আসন অটুট। তোমার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে শুনেছেন নিশ্চয়ই, নইলে ডাকবেন কেন। আমার এ নরম গালটার উপরে বিরাশি সিক্কা ওজনের একখানা থাপ্পড় মারবেন না তো? তুমিও নিষ্ঠুর। একটু বিবেচনা করলে না। বললে, আসতেই হবে আসতেই

হবে—নইলে, তা আর বললে না। নইলে—আমি বুঝলাম—অভিমান শুধু নয়, হয়তো চিরবিচ্ছেদ। অগত্যা মধুসূদন। সুন্দরী তুমি, কিন্তু তার চেয়েও বেশী, তুমি সংস্কৃতিবতী। একেবারে হালের পশ্চিমী কালচার, ক্ষণে ক্ষণে, ঝাপট মারে তোমার চলনে বলনে, তোমার ঝাঁকড়া কেশগুচ্ছ, অধরের নিপুণ লালিমায়—কানের গলার হাতের ইমিটেশন অলঙ্কারেও ; কিন্তু তোমার টানা-টানা ভুঁরুর নিচে ভ্রমরকালো নয়নের মাঝে যেন একটা গভীরতা, একটা অসহায় মায়া অগাধ হ্রদের মতো। পাশ্চাত্য নয়, এটা প্রাচ্য। এ যে সোনার আগুন। হয়তো এই আমাকে ভুলিয়েছে। আমি এসেছি, যদিও জানি, তুমি এক দূরতমা নীহারিকা। তোমার বিখ্যাত পিতা বিপদে ফেললে আমাকে উদ্ধার করতে ভুলোনা যেন।

দেখ, আমি কত হুঁশিয়ার। তুমি যাতে বিব্রত না হও, বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে পরে এসেছি উত্তম পোশাক।

জমকালো, লংকাট ম্যাকসিটাই : জুতোজোড়া ও যেমন ভারী তেমনি উঁচু। আমার ধরনধারণ, তোমার কাছে রিডিকিউলাস মনে হচ্ছে না তো, আসলে প্রেম জিনিসটা অন্ধ—তোমাকে খুশি করবার জন্য সাজা তো সামান্য, আমি নরকেও যেতে পারি।।

খিলখিল হাসি কানে বাজতেই দেখি আমি সিঁড়ির কাছে হোঁচট খেয়েছি, লুবনা ধরে ফেলল আমাকে। থতমত খেয়ে বললাম, সরি—

বাহ্‌রে, সরি কেন। হালকা গোলাপী জমির ম্যাক্‌সি পরেছে, ও মনোরম গ্রীবা দুলিয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত এলে। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ভেরি মাচ্—

কেন তোমার বিশ্বাস হয়নি আমি আসবো?

হয়েছিল, তবু লুবনা আমতা-আমতা করে, কি বলতে গিয়ে বললো না।

তবু আবার কি—?

বাহ্‌রে, পথ চলতে এ্যাকসিডেন্টও তো হতে পারতো!

তা অবশ্য ঠিক। একটা না একটা দুর্ঘটনায় আজকাল রোজই তো লোক মারা যাচ্ছে রাস্তায়।

আমরা চলছিলাম, সিঁড়ি মাড়িয়ে উঠে দোতলার বারান্দার ওদিকে দক্ষিণের কামরা। লুবনা আমাকে হাত ধরে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। গায়ে শাল জড়িয়ে একটি সোফায় বসেছিলেন থমথমে চেহারার জবরদস্ত বৃদ্ধ, লুবনা আমাকে দেখিয়ে উচ্চারণ করল, ড্যাডি—

ও হ্যাঁ, প্লিজ টেক্ ইউর সিট জাহিদ।

আমার নাম আপনি জানেন?

জানবো না মানে? হা হা হা হা—উনি এমন জোরে হেসে উঠলেন ঘরটা থরথর করে কাঁপল, একটু থেমে বললেন, গর্ব করবো না কেবল বলছি—আমার জানা নেই এমন জিনিস এই সাব-কন্টিনেন্টে কম আছে হে ইয়ংম্যান। বিশেষ করে, সিক্রেট্‌স্। সব জানলে তুমিই বলবে—দিস্ ওল্ডম্যান ইজ এ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব সিক্রেট থিংস্!

সেরেছে রে! লুবনা, আমার চিঠিখানা তো সুবোধ বালিকার মতো পিতাজীর হাতে তুলে দাওনি! তবেই মামলত কেরাসিন। যদিও কাগজটা আসল প্রেমপত্র নয়—কারণ আসল প্রেমপত্র নাকি এমন অশ্লীলতার ফিরিস্তি যার পাশে তুখোড় পর্ণোগ্রাফীও নস্যি মাত্র—তবু আমার মনের কথা তো অনেকই আছে। তুমি জানো, কোনো অপরিচিতার কাছে লেখা এটাই আমার প্রথম

খত। প্রমাণ, 'ওগো' পর্যন্ত বলতে পারিনি। যেসব কবিতার চরণ স্মরণীয়—নিভৃতে আওড়াই, সেগুলো থেকে কোনো স্তবকের উদ্ধৃতি দিতেও বেঁধেছে। কি জানি, তুমি একজন আধুনিকা, যদি কিছু আপত্তি করে বোসো, তখন এই হালকা মধুর বন্ধুত্বটুকুও থাকবে না। এইসব ভেবেছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে আমাকে লেখবার জন্যে। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল, জানালায় ঠাণ্ডা হাওয়া। বই বন্ধ করে জানালায় তাকিয়ে ছিলাম, যদি একটি কবিতা লিখতে পারি। পুকুরের পানিতে ভাসছে এক ঝাঁক হাঁস, তরতর করে বয়ে চলেছে। কিন্তু আমার মনে আসছে না আবেগের কোনো স্রোত। বিরক্ত হচ্ছিলাম—স্বনামধন্য নবীন লেখক হলে কি, লেখাটেখা মনে হয় হবে না আমার দ্বারা—তারপর চট্ করে ভাবলাম, এখন তোমাকেই লিখি। কি আর হবে, আফটার অল ক্লাসফ্রেন্ড তো? দেখা হলেও কথা বলো, মুচকি হাসো। টিউটরিয়াল খাতা চাও। একটু সুবিধে, ক্লাসে আমিই ফার্স্ট বয়। আমার জন্য তোমার ভিতরে কোনো নরম কোণ থাকা বিচিত্র নয়। তবু ভয় করছিলো, তোমার বাবার অগাধ ধনসম্পত্তি, বড়লোকের মেয়ে তুমি, সুতরাং নিশ্চয়ই আদুরে। সামান্যতেই যদি জ্বলে ওঠো? সহপাঠীদের মধ্যে ফাঁস করে দিলে কেলেঙ্কারীর শেষ। তাছাড়া আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত, এইসব বিলাসিতা সাজে না। বাপজান একটি ছোটো অফিসের বড় কেরানী, অত্যন্ত কায়ক্লেশে সংসার চালাচ্ছেন। আমরা, মাশাল্লা, আট ভাইবোন। তাই বিকেলে চারপাশে অনেক কণ্ঠস্বর, অনেক কিচিরমিচির ছিল—হঠাৎ ভাবলাম, বামন হয়েছি বলে কেন চাঁদের আশা করবো না? কবিতা লিখি, আমার একটা মানসী থাকলে কি এমন অপরাধ। কেন আমি বলতে পারবো না—জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল। কিন্তু কিছুই লিখলাম না। তোমার একটা খাতা ছিল, তাই সুবিধে হল। তারই ভিতরে গুটিয়ে দেবো একটা চিরকুট। তাই দিলাম। ওজন করা প্রতিটি বাক্য। বিন্দুমাত্র অভাব ছিলো না সৌজন্যের, তবু তো সুচরিতা ডেকেছি। ভাষার ভিতরে কায়দা করে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছি একটা শব্দ, সুন্দর।

গোপন পদার্থ-ভান্ডার, কিন্তু না না নিশ্চয় উনি এখনো 'আমাদের' সিক্রেট জানেন না। যদি জানতেন এমন দিলখোলা ব্যবহার করতে পারতেন না।

আমি বেকুপের মতো তাকিয়ে আছি, উনি তাঁর ভুঁড়ি কাঁপানো হাস্য থামিয়ে চুরুট ধরালেন।

আন্তরিক খুশিতে ঝলমল, প্রায় নাচতে নাচতে লুবনা বেরিয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত চায়ের তাগাদা দিতে। ওর পায়ের কোমল শব্দ আবার আসবে কখন!

ইয়ংম্যান! আই থিঙ্ক, ইউ উইল এপ্রিশিয়েট—আমার সকল ভাবনা এখন লুবনা।

জ্বি হাঁ, জানি। আমি কিছু না ভেবেই বললাম।

হাতের খসখসে তালুতে একটা ঘষা দিয়ে ভোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন সৈয়দ মঞ্জুর আহমেদ ; তারপর বললেন, সব উপরওয়ালার ইচ্ছা, কি আর বলবো। নইলে আমার নাম তোমরা ইতিহাসের প্রথম পাতায় দেখতে পেতে-হ্যাঁ, অবশ্যই। আমার শেরোয়ানীর ভিতর থেকে কত লীডার বেরিয়ে গেল। কত বড় বড় নেতা। যে কোনো একটা নাম বলো। আমার নিমক খায়নি এমন এক বেটাও নেই—

জ্বি হাঁ, শুনেছি তো, একটা ঢোক গিলে সোৎসাহে বললাম, আপনি কিং মেকার নামে পরিচিত ছিলেন।

যা বলেছ—বরাবর আমি রাজা বানিয়েছি। রাজা মেরেছি, এক মুখ ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন, কিন্তু নিজে রাজা হইনি। রাজা হতে চাইনি। এটাই আমার ফেট।

তাঁকে খুশি করার জন্য আমি বললাম, কি যেন কি আছে আমাদের দেশের শিরার ভিতরে আমরা ঠিক বেড়ে উঠতে পারি না। পরিণতি পাই না।

কিন্তু আমার কেসটা ঠিক তা নয় জাহিদ। সৈয়দ সাহেব বললেন, ইচ্ছা করলেই আমি একটা কিছু হতে পারতাম।

আমি বিভ্রান্ত। বললাম, জ্বি হাঁ, তাতো নিশ্চয়ই।

আমার জীবনের যে ট্যাজেডি তা বড় অদ্ভুত। তিনি যেন আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাননি, নিজের কথার জের টেনে বললেন, এখন লুবনাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আমার একমাত্র সন্তান, তবু যেন আমার নয়। ওর মধ্যে অতিরিক্তি কিছু আছে, যাকে বলা যায়, অলৌকিক। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। অতএব সে যখন তোমার কথা বলল, উৎসাহিত হলাম। ভাবলাম, এই সত্য। ইয়ং জেনারেশন ক্ষয়ে গেছে অথচ আমাদের এখন যা সবচেয়ে প্রয়োজন তার নাম চরিত্র। ও বলল, তুমি শক্তিমান কবি এবং তোমার চরিত্রও আছে। হ্যাঁ, এমন একজনকেই আমি মনে মনে খুঁজছি বহুদিন থেকে—এমন একজনকেই—

[থ্যাক্ ইউ ভেরি মাচ, লুবনা। সব সন্দেহের নিরসন হল। আমি এখন সুখী এবং সন্তুষ্ট এইটুকু শুধু নয়, আমি এখন প্রথম বর্ষায় বেপরোয়া পাহাড়ী হংস। সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে যেন ক্রমান্বয়ে উঠছে ধূম্রাকার মেঘরাশি, কিন্তু সেকি সুড়ঙ্গ, না কারো বিদীর্ণ হৃদয়? জমছে মেঘ, আর আমি তার ভিতরের বৃত্ত দিয়ে উড়ছি। উড়ছি, উড়ছি। ডানা জাপটিয়ে। বুকের ভিতরে আমার বিন্দু বিন্দু প্রত্যাশা, কাছেই কনখল, যার শৈলখন্ডে গিয়ে বসতে পারবো। মনোলীনা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছ, রক্তের আখরে আমি তার প্রতিদান লিখবো। এই আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি। টাকাকড়ি নেই, আমরা সমস্যাপ্রপীড়িত, কিন্তু বলছি দরিদ্র নই। আমার মনের রত্নভান্ডারের ভিতরে নিয়ে যাবো তোমাকে। যা ইচ্ছে তোমার মুঠি মুঠি, আঁচল ভরে নিও। সেখানে আছে হীরক। মণি-মাণিক্য মরকত। আছে গোমেদ চুণি পান্না। কত নেবে! যতই নাও, ফুরোবে না কোনদিন। নাইবা পারলাম দিতে তোমাকে নবরত্ন সেট, নাইবা দিলাম ছয়হাজারী বেনারসী, ইভনিং ইন্ পারীর বাস কি আমাদের বেড়ার ঘরের পাশের বেলফুলের গন্ধের চেয়ে দামী? মৌসুমে মৌসুমে গলায় পরিয়ে দেবো যত্নে-গাঁথা মালা, ফুলের স্তবক হাতে তুলে দেবো। তুমি হবে পুষ্পবতী কন্যা।...ক্ষমা করো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো নিরঞ্জনা, গত আড়াই বছর তোমার সঙ্গে দু'তিনবার কথাও বন্ধ করেছিলাম। এ ছিল আমার রূঢ়তা, এবং বলা বাহুল্য মূঢ়তাও। তোমার স্মার্টনেসকে আমি দুর্বলতা বলে ভুল করেছিলাম। হিরণ হতে পারে ছদ্মবেশী হাইজ্যাকার, কিন্তু আফটার অল ক্লাসফ্রেণ্ড। করিডোরে ওর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলাটা কি এমন দোষের ছিল তোমার? না-হয় বসেই ছিলে দু'দিন লাইব্রেরীর কোণে লনের সবুজ ঘাসের উপর, গ্রুপ বেঁধে চাইনিজ খাওয়াটাও দোষের কিছু নয়। বুঝতে পারছি আমার ঈর্ষা। আমার অবসেসন প্রায় হেলুসিনেশন। কিন্তু তুমি কোনো কন্ট্রাডিকশনে ভুগছিলে না। তুমি এক শব্দস্রোতস্বিনী কুলুকুলু বয়ে যাও। স্ফটিকের স্রোত। একে কেউ ঘোলা করতে পারে না—আমাদের কিন্তু সাবধান থাকা প্রয়োজন। ভালো কাজে শত্রু অনেক। সব চুপচাপ। গোপনে করতে হবে। ফাদার যদি ডেট ঠিক করেন, কাবিনের কাজটা আগে ভাগে হয়ে যাওয়াটাই ভালো। রুহুমত

যে কোন সময় হতে পারে এবং উনি যদি চান জাঁকজমকের সঙ্গে করতেও অসুবিধে হবে না।

আমার ফেমিলীকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার, এবং তারা বরং খুশিই হবেন।

সব ব্যাপারে আমার মুখের পানেই তো তাকিয়ে আছেন ওরা। কি ভাবছো, পড়াশোনা দু'জনে মিলে চালিয়ে যাবো, ডিসকাশন করে পড়বো, সুবিধেই হবে বরং।।

নিজেই যেন বসরার লাল গোলাপ হয়ে গেছে লুবনা, আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। আমার নিঃশ্বাসে এসে মিলছে নিঃশ্বাস ওর। শরীরের মৌ-মৌ সুগন্ধি মদিরা।

কথা বলতে বলতে এক সময় পাশের কামরায় নিয়ে এসেছিলেন ফাদার এবং আরও কথা বলছিলেন, কতকটা স্বগতোক্তির মতোই। না, না কথা নয়, উপাখ্যান। কিন্তু আসলে তিনি জানালেন, উপাখ্যান নয়—ইতিহাস। শাদামাটা, নিরস তথ্যপঞ্জি।

আমি দেখলাম কামরা নয়, একটি সংগ্রহশালা : দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি আলমারী এবং একদিকে খোলা র‍্যাক। কিন্তু সবচেয়ে যা চোখে পড়ে, বুক সমান উচ্চতায় ফ্রেমে বাঁধানো শত শত ফটোগ্রাফ। সব তাঁরই ছবি। প্রেসিডেন্ট, গভর্ণরের সঙ্গে, মন্ত্রী উপমন্ত্রী, এসেম্বলি মেম্বারদের পাশে এবং জনতার মাঝখানে। এইসব জমা করে রেখেছেন এত সংখ্যায়, দেয়ালে জায়গা নেই। তাই নিচে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছেন অনেক। এখানে অভিনন্দনপত্র, স্মারকলিপিই বেশি। লেখার শুরু হে মহাত্মন, মহামান্য, ক্ষণজন্মা, মহাপুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবটা এই, একটু ইচ্ছা করলেই সোনারকাঠি বুলিয়ে তিনি লোহাকে যেন সোনা বানিয়ে দিতে পারেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য তাঁর চোখের ইশারার চেয়ে বেশি কিছু নিষ্প্রয়োজন। এত আশা, এত আস্থা।

অনেক কাহিনী বর্ণনা করলেন। কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা ; কিন্তু কাহিনীর চেয়ে বড়। এখন গাঢ় কণ্ঠস্বর, আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, জানো জাহিদ? আমি সব জমা করে রেখেছি। এই সমস্ত উপকরণ, মালমশলা। ফটোগ্রাফ, মেমোরেন্ডাম। ফাইল, চিঠিপত্র। কাগজের কাটিং। নোট, চিরকুট। শুধু ইনটারেস্টিং নয় হে, এ্যারে-স্টিংও বটে। উপমহাদেশের সত্য ইতিহাসের ম্যাটেরিয়াল্‌স এগুলো।

তাই, ঠিক তাই। আমি মুগ্ধ, বললাম, আশ্চর্য আপনার দূরদৃষ্টি!

তবে এগুলো আমার লাইফেরও ধ্বংসস্তূপ। উনি সংহত স্বরে বললেন, আমার তাম্রলিপ্ত!

তাম্রলিপ্ত! বাব্বাহ্, কি কঠিন শব্দ! লুবনা মন্তব্য করল, তারপর বলল, কিন্তু ড্যাডি খুব ভালো বাংলা বলেন, তাইনা?

আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, রীতিমত অপূর্ব।

জানো? আমার মা বাংলায় এম, এ, ছিলেন। মৃদুস্বরে বলল লুবনা, উনি ভালো গল্পও লিখতেন।

[না, লুবনা। এই যে তোমার পিতার কোঁচকানো চোখের কোণে চিক্‌চিক্ পানি দেখা দিয়েছে, আমি দায়ী নই তার জন্য। এ প্রসঙ্গ তিনি কেন তুললেন বুঝতে পারছি না। হয়তো চাননি তিনি। কিন্তু মানব-মন এমনি বিচিত্র যা আমরা চাই না, অনেক সময় তার মধ্যেই

হাবুডুবু খাই। এই মুহূর্তটি, এই মুহূর্ত শুধু নয় আতীতের মুহূর্তও। নদীর অবিরাম স্রোতের মত তার সঙ্গে সংলগ্ন আমাদের চৈতন্য। এইতো দেখছি। হ্যাঁ, এটাই বোধ হয় তোমার মা'য়ের ছবি, নইলে এমন দর্শনীয় করে সাজানো থাকতো না। বুঝতে পারি, তিনি কেবল বিদূষী নন সুন্দরীও ছিলেন। কিন্তু ভুঁরুর কাছে যেন একটি গোপন দাগ, যার নাম বিষণ্নতা। মলিন ঠোঁটজোড়া। একরাশ বেদনার গভীর হ্রদের ভিতর দিয়ে যেন তাকিয়ে আছেন।

গোটা প্রতিকৃতিটি জুড়ে যেন একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, কিন্তু কে এর ব্যাখ্যা দেবে। তোমাদের জিগগেস করতে পারি না। তা করার অধিকারও নেই আমার। কিন্তু কে এই মহীয়সী? তিনি ছিলেন কি কোন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের বন্দিনী তরুণী? কোন নতুন অভিজাত বড়ঘরের আদুরে দুলালী? অথবা, লুবনা, আজকের তোমার মত, সেকালের এক আধুনিকা—যাদের আঁচলের ছোঁয়া পেলেই আমি শুনেছি যুবকেরা ধন্য হোত। হয়তো সারা ইউনিভারসিটিতে দুর্লভ দু'টি মেয়ের একজন যিনি ব্যাচেলর অধ্যাপকদের গোপন ভাবনার মোনালিসা, উঠতি কোন নজরুলের ফজিলুতুননেসা, কিংবা আরেকজন বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভা সোম– যাদেরকে ঘিরে রমনায় আসত বসন্ত, সারা শহরে গুঞ্জরণ। তবে এমনও তো হতে পারে. ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের একটি সাধারণ মেয়ে—পড়াশোনার দিকে, সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিল এবং বাপ-মা অনেক কষ্ট করে যার সাধ-আহলাদ পূরণ করেছিলেন। এটা তাঁর উত্তর তিরিশের পোর্ট্রেট। ফটো তোলার তারিখ দেখতে পাচ্ছি না। নইলে বলতেও পারতাম। স্বামীর সঙ্গে তাঁর বয়সের ফারাক কত।

এত আয়োজন কেন করছো, লুবনা? ওই যে পর্দার ফাঁকে দেখছি ট্রলিভরতি খাবার। রসগোল্লা, চমচম, ফলমূল এবং কফির পাত্র।

থাক এখন এসব বাজে ভাবনা। তোমার মা-জননীর নয় এখন তোমার কথাই আমি ভাবতে চাই। কোন ফটোগ্রাফী নয়, দেখতে চাই শুধু তোমাকেই। দুই চোখ ভরে, অদৃশ্য আরো হাজার চোখ দিয়ে। তোমাকে কখন পাবো আমার বুকের মাঝে? সেই গন্তব্য কতদূর? আর কতদূর?]

অবিশ্রাম বকরবকর করছিলেন, আমার কানে বিশেষ কিছুই ঢুকছিল না ; লুবনাও যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত, এদিকে এসে বলল, চলনা ড্যাডি কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ও হ্যাঁ, চল্ মা, চল্। হঠাৎ আচ্ছন্নতা যেন কেটে গেল, ম্লান হেসে বললেন, আসলে কি জানিস? আই এ্যাম এ জায়েন্ট বট্‌ল্—টিপা খুলে গেলে ভস্‌ভস্ করে বেরুতেই থাকে কথা, সোডার মতন, হা হা হা হা। চল বাবা চল।

কফির সরঞ্জাম সামনে, আমরা এ ঘরে এসে সোফায় বসলে একটু লাজুক হেসে লুবনা বেরিয়ে গেল। সে বুদ্ধিমতী, তাই এটাই স্বাভাবিক। বুঝতে পেরেছে ফাদার এখন পাড়বেন এমন সব কথা যা ওর শোনা উচিত নয়, অথবা আড়াল থেকেই শোনা ভালো।

উনি হাসছেন, আপন মনে হাসছেন। বুঝলাম, আগের ফরমে ফিরে এসেছেন। বললেন, ওই যে বড় ছবিটি দেখলে ও লুবনার আম্মা জুলেখা। আমার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী।

মনে মনে ভাবলাম, তাই বলুন।

সৈয়দ সাহেব বলতে লাগলেন, বিরাট সংসার ছিল ওদের—ওর বাবা চালাতে পারতো না। ওকে আমি ওর বাবার কাছ থেকে তিন হাজার টাকায় কিনেছিলাম। হ্যাঁ, কেনাই তো,

হা হা হা হা। এখন অবশ্য তিন লাখেরও বেশি হবে!

আমি কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বোবার মতো তাকিয়ে আছি। একটু থামার পর আবার বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, কিনেছিলাম। টাকা ছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন যখন ছিলোনা তখন কেনাই তো বলবো।

আমি এখনো স্তব্ধ। তিনি নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে লাগলেন, আমার মেয়ে বলেছে, তোমার লেখার হাত খুব ভালো। সেজন্যই তোমাকে ডেকেছি। এ আমার অনেক দিনের সাধ। একটা বায়োগ্রাফী লেখাবো, আমার বায়োগ্রাফী। জানো আমার জীবনটা গত জেনারেশনের ইতিহাস, মানে প্রতারণার ইতিহাস। ব্যক্তি হিসেবে আমি লম্পট ছিলাম। যখন যাকে চেয়েছি, তাকে নিয়েছি। তুমি চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ। তাই বলছি, সব লিখবে। কিছু ঢাকবে না। মানুষকে ধাপ্পা দিয়েছি বরাবর, গরীবের রক্ত শুষে অর্থ বানিয়েছি। বাইরে মহাসম্মানিত ছিলাম, যে কেউ দেখলেই বলত আদাব হুজুর। কিন্তু আমি জানতাম, লোকে আমাকে ঘৃণা করে। প্রচণ্ড ঘৃণা এবং আরও একজন ঘৃণা করত। তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, সেই একজন—

হঠাৎ থামলে আমি বিড়বিড় করে শুধোলাম, কে?

জুলেখা। চোখ বুঁজে মগ্নস্বরে বললেন, সবই লিখবে তুমি। কিন্তু এও লিখবে আমি জুলেখাকে ভালোবেসেছিলাম। আর সেজন্যই আমার ডবল ব্যারেল বেলজিয়াম গানের ডগায় পেয়েও, ওর প্রেমিকের সঙ্গে তাকে আমি পালিয়ে যেতে দিই!

নীরবতা নেমে এল, তারপর স্তব্ধতা। আমি মুখ নীচু করে, গালে হাত রেখে আরো অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন, চুপ হয়ে গিয়েছিলেন এবার যেন সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ক্যামেরা প্যানিং—এর মতো করে চারপাশের সবকিছু আবার আমি দেখে ছিলাম, তারপর উঠে চুপচাপ হেঁটে বাইরে এলাম।

সামনে বারান্দা ছাড়িয়ে বাঁদিকে নিচে নামার সিঁড়ি, সেখানে আসতেই ওদিকে প্রাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল।

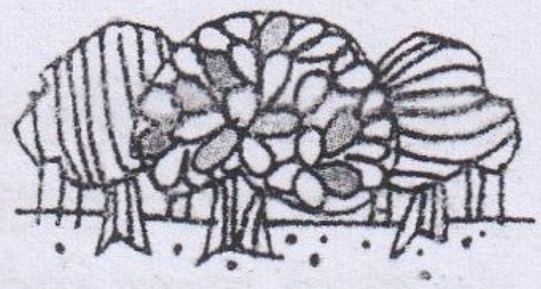
[তোমার স্মার্টনেসের সত্যই কোন তুলনা নেই লুবনা, আমাকে তোমার বাবার সাথে বসিয়ে রেখে এত অল্প সময়ে কেমন করে সাজলে! একটা নতুন শাড়ি, কাঞ্জিভরম, কিছু নির্বাচিত অলঙ্কার। চুলের নববিন্যাস। ভুঁরু ও গালে প্রসাধন। লনের কেয়ারী পথে বহির্মুখী পার্ককরা শাদা গাড়িটার কাছে হিরণ, ভঙ্গি ও পোশাকে ভীষণ তুখোড়, টানছে তোমার হাত ধরে। তুমিও প্রফুল্ল, হাসতে হাসতে ঢলে পড়ছ। এই রোমিওর সাথে যাবে তুমি? বেড়াতে নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায়?

তুমি বেশ আছ লুবনা, আমি এক পা দু'পা করে নামছি সিঁড়ি বেয়ে তোমার বাবার তাম্রলিপ্ত দেখে, আমার মধ্যে যে আরেকটি তাম্রলিপ্ত কচ্ছপের মত আঁধারের আচ্ছাদন কাটিয়ে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে! লুবনা বিদায়।]

একা—একা আমি এখন হাঁটছি, অন্ধের মত হেঁটে যাচ্ছি মহানগরীর রাস্তা দিয়ে—ওই দূরে গাছে গাছে ফুল ফুটছে কি? লাল-লাল পুষ্পসম্ভার, পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া? কি একটা গড়বড় হয়ে গেছে আমার চেতনায়, হঠাৎ সেদিন কি যে হয়ে গেল।

জুন, ১৯৮২

নবরত্নহার



আচমকা একেবারে ঘাড়ের উপরে শাড়ির খসখস, চুড়ির রিনিঠিনি বোল। এবং যেন সদ্যফোটা তাজা রজনীগন্ধার ঝাপটা। নির্জন শয়নকক্ষে অলৌকিক কিছু ঘটনার সম্ভাবনা নেই, পেপারটা পেটের উপর রেখে ফিরে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে চক্ষু চড়কগাছ। আশ্চর্য দৃশ্য, এমন তো কখনো দেখা যায় নি, বিনা উল্লেখে বিনা কারণে প্রায় হকচকিয়ে দেয়ার মতো?

খাটের ধার থেকে গড়িয়ে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং সোনালি ফ্রেমের চশমাটা ডান হাতের আঙুলে ধরে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার রুবা! কোথাও পার্টি আছে নাকি? আমি তো জানি না?

দিলরুবা চকিতে আরো রহস্যময়ী, লাল টকটকে ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বললেন, কেবল পার্টি থাকলেই সাজতে হবে নাকি?

না তা-না তবে কিনা—অফিসে তুখোড় সচিব নজমুল হক স্ত্রীকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন, একটু থেমে বললেন, আজকে কোনো স্মরণীয় দিন নয় তো? কোনো উৎসব? কিংবা আমাদের বিবাহবার্ষিকী?

বাহ্, আমাদের বিয়ের তারিখটাও ভুলে গেছ নাকি?

না, না। তা ভুলবো কেন। হঠাৎ প্রশ্নে নজমুল থতমত খেয়ে বললেন, সব স্পষ্ট মনে আছে। তবে কিনা আই সাসপেক্ট—

হয়েছে আর সাফাই গাইতে হবে না। হাতের চুড়ি রিনিঠিনি বাজিয়ে দিলরুবা ঈষৎ অভিমানের সুরে বললেন, কিন্তু বিয়ের তারিখ ছাড়া আর বুঝি সাজতে নেই!

আছে রুবা। খুব আছে। এক পা এগিয়ে নজমুল সামনা-সামনি দাঁড়ালেন, চিবুক ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, বাহ্! ইউ লুক রিয়্যালি ওয়ান্ডারফুল। মনে হচ্ছে যেন একরাশ পুষ্পিত ফাল্গুন।

সত্যই বড় রমণীয় লাগছিল, চুলে প্রসাধনে অলঙ্কারে হালকা গোলাপী রংয়ের বুটিদার শাড়িতে। কপালের মাঝখানে টিপ, কাজলটানা চোখজোড়া। এত বছর পরেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। অনেকদিন আগে ফেলে আসা একটি পুরাতন রাতের ছবি ঝিল্‌মিল্ করে ভেসে চলে যায়। হঠাৎ করেই হয়েছিল সম্বন্ধটা, তাও একজন কাঠমোল্লা ঘটক মারফত। আসলে তো কেনাবেচার পালা, মনটা শুরু থেকেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতো থমথমে হয়েছিল।

তুমি পাত্রী দেখবে না, বাবা? তোমরা আধুনিক যুগের তরুণ, তা ছাড়া ইলেত-বিলেত ঘুরে এসেছ। খাদ্য দপ্তরের কেরানি শামসুল হক, ছেলের ছোট্ট কামরায় এসে পাশে বসেছিলেন, বলেছিলেন, মেয়ে তোমার পছন্দ হওয়া প্রয়োজন।

আমার পছন্দ আর অপছন্দ কি—এই ধরনের একটা মন্তব্য ঠোঁটের কাছে এসেছিল, কিন্তু বললেন না ; মনে পড়ে, পাঁচ ছেলে চার মেয়েকে খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখতে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে বাবা কত কষ্ট করেছেন ; কোনদিন ভালো খাননি, ভালো পরেননি ; এখন যখন ছেলেকে ঘিরে একটু আশার আলো দেখছেন, যা ইচ্ছে করুন। কোনকিছু খারাপ হলেও, হবে তা ব্যক্তিগত ক্ষতি, পরিবার উপকৃত হলে তা স্বীকার করে নেয়াই সুবিবেচকের কাজ। ঘামেভেজা কাঁচাপাকা দাড়িভরা পিতার করুণ মুখটার দিকে

একবার তাকিয়ে নজমুল উত্তর দিয়েছিলেন, আপনাদের পছন্দ হয়েছে, এটাই যথেষ্ট। আমাকে দেখতে হবে না। ঢাকার বাইরে আমার পোস্টিং হচ্ছে, সব পাকাপাকি করে ফেলুন।

এই তো ঠিক মনোভাব। যখন আলাপ-আলোচনা চলছিল, আড়ালে আবডালে শুনেছিলেন, তার ভাবী শ্বশুর একজন বাঘা শিল্পপতি, উচ্চতম মহল এমনকি করাচি-রাওয়ালপিন্ডিতেও তাঁর ঢের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। একটা লাইসেন্সের জন্য তদবির করতে গিয়ে একজন পাঞ্জাবী আমলা কর্তৃক অপমানিত হয়েছিলেন, আর সেই থেকে তাঁর জিদ। যেমন করেই হোক, একজন সিভিল সার্ভেন্টকে ফ্যামিলিতে আনবেন। তাতে কয়েক লাখ টাকা খরচ হোক আপত্তি নেই।

আদর্শবাদী পিতা, অনেক কষ্টে সংসার চালাতেন, তবু কোনদিন একটি কানা পয়সাও এদিক-সেদিক করেননি। সরকারের একজন নিষ্ঠাবান, সৎ কর্মচারী হিসেবে তাঁর নাম ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এটাই একমাত্র সুযোগ। ঠিক পণ আদায় নয়, সাময়িক সাহায্য ; সেই সঙ্গে ছেলের ভবিষ্যৎও ভাবলেন। তিনি জানতেন, এ রকম একটা চাকরি যার স্বাভাবিক সিঁড়িই উন্নতির রক্ষাকবচ। তবু বড়লোক একজন মুরব্বি পেলে আরো নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর এদিকে লাখ টাকা পেয়ে গেলে মেজোকে দিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। অবশ্য বলতেন, সুদিন এলে এই অর্থ ফেরৎ দেবেন।

সেদিন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বর সেজে কমিউনিটি সেন্টারে রওয়ানা দিয়েছিলেন নজমুল, কানা-খোঁড়া যাই মেলে তাইতো শিরোধার্য।

কিন্তু শুভদৃষ্টির সময়ে আয়নার ভিতরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, তাঁর বাবার দেওয়া দামী জেওর-কাপড় আপাদমস্তক মুড়িয়েছিল বলে নয়, দিলরুবা সত্যই সুন্দরী। তার ভাগ্য এমন একটা দুর্লভ রত্ন নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তা ভাবতে-ভাবতে আন্দোলিত হলেন। বাসরঘরে নববধূর মুখের পানে চোখ মেলে তাকিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন সারারাত।

অস্পষ্ট আলোকে খাটের ধারে বসে গোনাগুনতি কয়েকটি কথা হয়েছিল। একটা হাত টেনে নিয়ে নজমুল বলেছিলেন, দিলরুবা। কিছু বলছো না যে?

আমি কি আর বলবো। ঠোঁটজোড়া যেন নড়ল দিলরুবার, সঙ্গে সঙ্গে নিচুমুখ।

কেন, কিচ্ছু বলবার নেই? যেমন, তোমার কেমন লাগছে নতুন জীবন, আমি কেমন লোকটা। দেখতে ভালো, না ডাকাতের মতো।

যা। দিলরুবা লজ্জা পায়, মৃদুস্বরে বলল, আপনি তো,—

না, আপনি নয়। নজমুল ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলল, বল তুমি—

এখনি বলতে হবে? দিলরুবা জানাল, তা আমি পারবো না। আমি আগে থেকে চিনি নাকি?

আমিও তোমাকে চিনি না। তবু তুমি বলছি।

পুরুষ মানুষ পারে, আমরা পারি না।

এক সপ্তাহের মধ্যেই এডিসির নিয়োগপত্র নিয়ে সিলেট যাওয়ার সময় প্রথম আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিলো। তখন শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত। খামার গ্রাম ছাড়িয়ে আলোছায়া আবছায়ার মায়ালোক দিয়ে গাড়ি খচর-খচর আওয়াজ তুলে যাচ্ছিল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, জানলার ধারে বসেছিল দিলরুবা, তাকে জড়িয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি সুখী হয়েছ, রুবা?

হুঁ, বাইরের জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে দিলরুবার মন্তব্য, কিন্তু তুমি—হওনি মনে হয়।

কেমন করে বুঝলে?

এমনি, আমি বুঝতে পারি। ক্যাম্ব্রিজে এক বছর পড়াশোনা, নিশ্চয়ই শ্বেতাঙ্গিনী

মেয়েবন্ধু ছিল! আমরা তো মাটির মানুষ, তাদের কাছে কি!

ও, এই কথা? দুষ্টুমি করছ, না?

দুষ্টুমি কেন, ঠিকই বলছি। তাছাড়া, তুমি তো আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করনি। আমার বাবা লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে তোমার বাবার কাছে আমাকে গছিয়ে দিয়েছেন।

ছি ছি, রুবা। এমন কথা বলো না। আমি তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। তোমার বাবার টাকা আমি পরিশোধ করবো।

না, না। তা নয়। আমার প্রতি কি তোমার কোন আগ্রহ ছিল? একটুও না। যদি থাকত তাহলে বিয়ের আগে নিশ্চয় তুমি আমাকে দেখতে চাইতে।

হঠাৎ থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন বুদ্ধিমান নজমুল, আমতা-আমতা করে বলেছিলেন, মানে, জানো কি আমি শুনেছিলাম—

থাক্, কি শুনেছিলে আমি শুনতে চাই না। শোনা কথা আর চোখে দেখা এক জিনিস না। একটু নীরব থেকে দিলরুবা বলল, আমাকে যদি তোমার ভালবাসার ইচ্ছে থাকত তাহলে ছোটখাট একটা কিছুও তো দিতে তুমি। যেমন একটা আংটি, কি কানফুল। এটা অভাব অনটনের প্রশ্ন নয়, হৃদয়বৃত্তির প্রশ্ন।

দোহাই তোমার। নজমুল হাতজোড় করে উত্তর দিয়েছিলেন, আমাকে লজ্জা দিয়ো না রুবা। ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। ভীষণ ভুল হয়ে গেছে।

পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার হিসেবে আমি সবই পেয়েছি। একটা বাড়িও পাবো। কিন্তু এটাই কি শেষ?

না, এটা শেষ হবে না রুবা। আমি কথা দিচ্ছি, প্রথম মাসের বেতন থেকেই সোনার চেইন বানিয়ে দেবো তোমাকে। উত্তর দিকে দূরে ঝিকমিক নদীটার দিকে তাকিয়ে নজমুল স্থিরকণ্ঠে বললেন, এবং সময় হলে—তোমাকে উপহার দেবো।

কি?

একটা নবরত্নহার, যা হবে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার স্মারক।

শুনে খুমি হোলাম। স্বামীর মাথার চুল হাতের আঙুল ডুবিয়ে দিলরুবা একটা মৃদু রহস্যময় হাসিতে বলেছিলেন, কিন্তু তোমাকে কিচ্ছুই দিতে হবে না। আমি তোমার মনটা কেবল দেখলাম।

সেই দৃশ্য, সেই কথা। যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি, এত দূরবর্তী মনে হয়। কারণ তারপর বিশ বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে, তিনটি পুত্রকন্যা জন্মালেও ঋণ পরিশোধ কিংবা প্রতিশ্রুতি পালন কোনোটাই সম্ভব হয়নি। এবং তা যে কেবল টাকা-পয়সার অভাবের জন্য, তা বলা যায় না।

প্রথম যৌবনের রঙিন দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নজমুল দেখলেন, কুসুমেও কীট আছে এবং চাঁদে কলঙ্ক। অনিন্দ্য-সুন্দরী দিলরুবার ভিতরে একটা সাপ কিলবিল করে, যার নাম অহঙ্কার। একটু সুযোগ পেলেই সে ফণা মেলে উঠত, ছোঁবল মারত।

ওখানে ছেলে চাকরি করে, একটা সুযোগ। মাসখানেকের মধ্যেই বাবা-মা ছোট ভাইবোন দুটোকে নিয়ে দরগা জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন।

সার্কিট হাউসের একাংশে বাসা ছিল। পিছনদিকে দুটো রুম নিয়ে থাকতেন। একটাতে তাদের জায়গা করে দিয়েছিলেন।

বাবুর্চি রান্নাবান্না করে, কিন্তু তবু দিলরুবার মুখ ভার। একদিন বিকেলে একান্তে ডেকে বলেই ফেললেন, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

কেন, কি হয়েছে রুবা? ওঁদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব?

হ্যাঁ হচ্ছে তো। হবে না কেন। দিলরুবা চাপা আক্রোশের সঙ্গে বলেছিলেন, কিন্তু তা নয়। এখানে থাকার জায়গা কোথায়? স্বজন-পরিজন নিয়ে থাকতেই তুমি ভালবাস। বেশ তাই থাক। আমার কি দরকার?

একি বলছো তুমি রুবা, ও ওঁরা ক'দিন বেড়াতে এসেছেন, চলে যাবেন তো?

কেন যাবেন। ছেলে মানুষ করেছেন, তার কাছেই থাকবেন। আমি তোমাদের কে? পরের ঘরের মেয়ে। আমার জন্য ওঁরা কেন কষ্ট করবেন!

ওখানকার কার্যকাল শেষে ঢাকায় ফিরে এলে বাবাকে আজিমপুরের ফ্ল্যাটে তুলেছিলেন কিছুদিন শুশ্রূষা করার জন্য।

দক্ষিণদিকে ছোট্ট একটা কক্ষে থাকতেন ; খাদ্য দপ্তরের কেরানি শামসুল হক, বুড়ো হলেও চতুর্দিকে সজাগ ছিলেন। তিনি শুনলেন, বৌ বিড়বিড় করছে, যতসব ঝামেলা, একটু যে শান্তিতে থাকবো তার উপায় নেই। আমার অন্য বোনেরা বড়-বড় পরিবারে, কত সুখে আছে। বাবা যে কেন আমাকে ফকিরের হাতে তুলে দিলেন—

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন, রিকশায় ওঠবার আগে ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, বাবা, তোকে বলি, আমাদের জন্য ভাবিসনে। তুই সুখে থাক্ এই আমরা চাই। আমি যে এখন ভালবোধ করছি, তোর মা একলা আছে তাই চলে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে দেখতে আসবো, খোদা হাফেজ।

দেরিতে অফিস-ফেরৎ নজমুল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ছিলেন বাবার মুখের দিকে, বুঝতে পারছিলেন কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু কিছুই বললেন না। সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতলায় উঠে এসে কড়া নাড়লে দিলরুবা দরজা খুললেন। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস কররেন, এত দেরি হল যে?

অনেক কাজ ছিল।

অন্যদের বুঝি কাজ থাকে না?

অন্যের কথা জানিনা, আমাকে একটা প্রজেক্ট প্রোফর্মা তৈরি করতে হয়েছে। নিজের কক্ষে এসে টাই খুলতে-খুলতে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বাবা হঠাৎ চলে গেলেন কেন?

তার আমি কি জানি! কালোমুখে দিলরুবা বললেন, উনি বললেন মা একলা আছেন।

হুঁ। নজমুল গম্ভীরমুখে বললেন, ঠিক আছে। আসলে খোলামেলা থেকে অভ্যাস তো, এই কবুতরের খুপরিতে বোধ হয় ভালো লাগছিল না।

কি জানি বাবা, তোমাদের কত ঢং। আদরযত্ন তো কম করিনি, নিজের হাতে পায়েস করে খাওয়াতাম।

এইভাবে ক্রমে-ক্রমে পরিবার থেকে কখন যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন য়ে গেলেন, তা বুঝতে পারলেন না। উৎসবে ছুটিতে মাঝে—মাঝে গাড়ি করে যেতেন শহরতলীর ভাঙা গলির ভিতরে, রুগ্ন মায়ের কাছে বসতেন। বাইরে থেকে বাবা ফিরে এলে কিছু কথাবার্তা বলতেন। একবার ঈদের সময় সবাই মিলে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তারপর ওখানেই শেষ। দিলরুবা আধভাঙা চৌকি ও ছেঁড়া কাঁথা দেখে বমির ভঙ্গি করে বলে উঠেছিলেন, ওয়াক্, আমাকে নরম পেয়ে কোথায় নিয়ে এসেছ? আমি আর একরাতও এখানে কাটাতে পারবো না। চল, কাল সকালেই—

বৌমার মনোভাব টের পেলেন বাবা, তিনি ছেলেকে সস্নেহে বললেন, বড়লোকের মেয়ে শহরে থেকে অভ্যাস। তোরা বরং চলেই যা। আমরা কিছুদিন পরে আসবো।

কয়েকদিন ছুটি তো যোগ করে নিয়েছি।

অনেক সংযমের সঙ্গে বাইরের সম্পর্কটা ঠিকই রেখেছিলেন, যদিও প্রায় কোনো একটা অছিলায় দিলরুবা খোটা দিতেন, খুব তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে, কিন্তু আমার বাবার এক লাখ টাকা তো গায়েব করে দিয়েছ। কামারকে দিয়ে কুমোরের কাজ হয় না। ব্যবসা যা করলেন, এতগুলো পেট—পুঁজি খেয়ে হজম। কিন্তু মনে রেখ, আমি ছাড়ব না। বাবা আমাকেই টাকাটা দিয়েছিলেন। যদি দিতে না পারো তোমার মরা বাবার কবর থেকে তুলে আনবো।

দিলরুবা! হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, জ্বলন্ত চোখে বলেছিলেন, আমার বাবা হয়তো অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু তার জন্য এতবড় কথা শোনাবে—দিলরুবাও ছাড়লেন না, বললেন, কেন শোনাবো না। দিনের পর দিন তোমরা কেবল ভাওতা দিয়ে চলেছ।

সেই থেকে নজমুল অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছিলেন ; বনানীতে সিঙল ইউনিট দোতলা বাড়িটা সম্পূর্ণ হলে তার ভাড়া থেকে লোনের কিস্তি পাঁচ হাজার টাকা মাসিক পরিশোধ করে বাকি তিন হাজার আলাদা একাউন্টে জমাচ্ছেন। এখন প্রায় লাখের কাছাকাছি উঠেছে। চলতি বছরের শেষ দিকে দিলরুবার একাউন্টে ট্র্যান্সফার করে দিতে পারবেন, মনে করছেন। এতে শান্তি পাবে বাবার আত্মা, এটাই সান্ত্বনা।

আজ স্ত্রীর উচ্ছ্বাসময় আন্তরিক ব্যবহারে হঠাৎ সব বিস্মৃত হয়েছিলেন, মনের কালো পর্দাটা তার অজান্তেই সরে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই এরাশ স্মৃতি ঝাপটা মেরে যায়, তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ক্ষণিকের অভিমান হলেও, স্বামীর প্রশংসায় দিলরুবা আবার উৎফুল্ল, কাছে এসে একটা হাত ধরে হাসতে-হাসতে বললেন, বাহ্ পুষ্পিত ফাল্গুন। তোমার ঘাড়েও কবিত্ব ভর করেছে মনে হয়।

নিজের গাম্ভীর্য কাটিয়ে নজমুল বললেন, সত্যই যদি কবি হতে পারতাম!

আফসোস কেন, কাগজ কলম নিয়ে বসে যাও। বাংলাদেশ তো কবিরই দেশ, গড়গড় করে নেমে আসবে কবিতা, তোমাদের দু'জন বুরোক্র্যাট তো বেশ নামজাদা কবি! তারা কেমন করে পারলেন?

আমিও পারবো রুবা, যদি তুমি এমন রূপ নিয়ে আমার সামনে থাকো!

হয়েছে আর তোয়াজ করো না, এখন কি খাবে বলো তো?

যা খেতে চাই, তা চাইলে রাগ করবে না তো?

বাহ্‌রে। রাগ করবো কেন? দিলরুবা মিষ্টি হেসে বললেন, এখন যা চাও, তাই দেবো।

সত্যি? বলে নজমুল ওর হাত ধরে একটি প্রবল টানে তাকে বুকের কাছে আকর্ষণ করেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আকুলিবিকুলি।

দিলরুবা বাধা দিতে-দিতে বলতে থাকেন, ছি ছি, লক্ষ্মীটি দুষ্টুমি করে না। ছেলেমেয়েরা কাছেই আছে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিলরুবা ড্রেসিংটেবিলের কাছে গেলেন, তার ঠোঁটে মধুর হাসির রেখা। পেপারটা টেনে নিয়ে নজমুল পিছন ফিরে টেবিলটার সামনে চেয়ারে বসলেন, মনের মধ্যে শিরশির আলোড়ন। ভাবছিলেন, যেন যৌবনের এক টুকরো ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু তখনো আসল বাকি ছিল। অনেক তাজা খবর। বুড়িগঙ্গার উপরে সেতুনির্মাণ, বন্যা, পাঞ্জাবে শিখবিদ্রোহ ; কিন্তু কেবল দৃষ্টিই বুলিয়ে যাচ্ছেন কাগজের উপর। কিছুক্ষণ পর টের পেলেন দিলরুবা পা টিপে-টিপে আসছেন, উনি ফিরলেন না! তার মজাটা দেখা যাক।

দিলরুবা কাছে এসে পিছন থেকে গলাটা জড়িয়ে ধরলেন, গালে গাল চেপে ফিস-ফিস

করে বললেন, তুমি সত্যি খুব ভাল। আমি মিছিমিছি তোমার উপর রাগ করি। তুমি তো পাঠিযে দিয়েই খালাস, তারপর নিশ্চয় ভুলে গেছ? দ্যাখ তো আমাকে কেমন মানিয়েছে?

ডান পাশে ঘুরে, একটু নুয়ে গলায় উপর থেকে শাড়ির আঁচলটা সরালে নজমুল দেখলেন, একটি ঝকঝকে নতুন নবরত্নহার!

তোমার পছন্দ আছে, জানতাম ; কিন্তু তা যে এত উত্তম, তা তো কোনদিন বুঝতে পারিনি। সত্যি চমৎকার। আমার তো খুব ভালো লেগেছে! কত দিয়ে কিনেছ গো? কি কথা বলছো না যে?

একেবারে স্তম্ভিত, হতভম্ব নজমুল : তার ধমনীর সব রক্তই যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সতর্ক হলেন, হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, নাহ্ কই? এই কথা বলছি তো?

একটা কাষ্ঠ হাসি দিলেন। অভিমানীর মতো দিলরুবা বললেন, টাকা খরচ হয়েছে বলে যদি কষ্ট মনে থাকে তাহলে আমি পারবো না।

আরে না, না। কষ্ট হবে কেন। এত আমার পরম আনন্দ। তুমিতো জান আমার কতোদিনের স্বপ্ন। তাছাড়া আমি কথাও তো দিয়েছিলাম।

আলতোভাবে পিঠের উপর দিয়ে বাজু ধরে, স্বামীর শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দিলরুবা বললেন, কিন্তু তোমার সবকিছুতেই একটা চমক দেয়ার চেষ্টা!

কি রকম?

কি রকম, তাও ব্যাখ্যা করতে হবে, না? কেন অফিস শেষে নিজেই তো নিয়ে আসতে পারতে, আমার গলায় নিজের হাতে পরিয়ে দিতে। মিঃ সালামকে দিয়ে পাঠালে কেন। অবশ্য লোকটা বেশ ভদ্র ও অমায়িক। আমাকে ম্যাডাম-ম্যাডাম বলতে অজ্ঞান। বেশ সশব্দে হেসে উঠলেন দিলরুবা, তারপর বললেন, মাঝে-মাঝেই আসেন, আমিও কম চালাক নই। এটা-সেটা কাজ করিয়ে নিচ্ছি। তুমি এত ব্যস্ত। হাঁফ ছাড়বার সময় পাও না!

শুনতে-শুনতে স্লিপিং গাউনের নিচে সারাটা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল ; সিলিং পাখাটা হালকাভাবে চলছিল এতক্ষণ, উঠে দাঁড়ালেন পট্‌পট্ ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ কাজের চাপটা খুব বেশি পড়ে গেছে। এই কনফারেন্স, এই কেবিনেট মিটিং। গাদা-গাদা ফাইল তো আছেই। তার ওপর স্পটে যেতে হয় এভরি ফোরটনাইট্।

হ্যাঁ, তুমি এখন ব্যস্ত। আমি বলতে সাহস করি না।

কি?

কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। সেই কবে গিয়েছিলাম। কেন তোমার মনে পড়ে না?

বিয়ের পর-পরই সিলেট থেকে—

হ্যাঁ, সব মনে আছে। জীবনটা এমন দ্রুত কাটছে, মনে হয় এইতো সেদিনের ঘটনা।

সাবধানে, মুখে কোন রকম ভাবান্তর না ঘটিয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে তখন ভীষণ আন্দোলন। তাজ্জব, একেবারেই তাজ্জব। হ্যাঁ, আবদুস সালাম, বন্দরনগরীর একজন উঠতি শিল্পপতি। অফিসের আনাচে-কানাচে ঘোরেন খেঁকশিয়ালের মতো, কখনো লেজ তুলে কখনো গুটিয়ে ; শুনেছেন, নিচের স্তরের অনেকের সঙ্গেই তার খাতির। পঞ্চাশ লাখ টাকার লাইসেন্সের অনুমোদনটা বার করে নিতে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছেন, তার চেয়ে বেশি ন্যায্য দরখাস্তের উপরে টেক্কা দিয়ে। তিনদিন দেখা করে, কাকুতি-মিনতি করেছেন। প্যান্ট বুশ শার্ট পরেন, গলায় সোনার চেইন। বেশ বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু তার বুদ্ধির খেল এমনভাবে অন্দরমহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে তা কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি।

উৎফুল্ল, সস্মত দিলরুবা, কখনো নিচে কখনো পাশে কখনো বুকের উপরে ; কিন্তু তবু সারাটা রাত কাটে যেন কণ্টকশয্যায় নরক-যন্ত্রণায়। পরিতৃপ্ত, শ্রান্ত দিলরুবা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ; অথচ তার চোখের কাছেও আসেনি ঘুম। কেবল ছট্‌ফট্‌ করেছেন।

মাথায় ডাণ্ডা মেরে লোকটাকে ঠাণ্ডা করে দিলেও বুঝি মন শান্ত হয় না। সকালে অফিসে গিয়েই তার ফাইলটা কল্‌ করলেন।

এগারোটার দিকে বাইরে অনেকেই বসেছিল। তাদের মধ্যে উনিও। ক্রমিক নম্বর অনুসারেই তাকে ডাকলেন।

একটা অঘটন আঁচ করেই বোধহয় প্রায় কাঁপছিলেন ; হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। নজমুল আদেশ করলেন, বসুন।

কাঁচুমাচু করে একটা চেয়ারে বসেন, তারপর বিনয়-নম্রস্বরে বললেন সালাম, আপনার শরীরটা ভালো আছে তো স্যার?

বিষের মত এই কণ্ঠস্বর, কপালটা কুচকে যায় ; কোনো ভণিতা না করেই নজমুল দাঁতের ভিতর থেকে একটি-একটি শব্দ ছাড়লেন, আপনাকে ভালো লোক বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু আপনি কি মনে করেছেন মিঃ সালাম—

অপরাধ নেবেন না স্যার, আমি অধম-নচ্ছার। আমার মুখে লাথ্‌থি মারুন। যন্ত্রচালিতের মত দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে সালাম বলতে থাকেন, আপনার দয়া না পেলে স্যার আমি মরে যাবো, একদম মরে যাবে। ইন্ডাষ্ট্রিটা মাত্র শুরু করেছি, কত ধারকর্জ জমিজমা বিক্রি করে স্যার। আমি মরে যাবো।

হ্যাঁ, আপনার মরে যাওয়াটাই উচিত। আপনার মত চালাক লোকরাই দেশটাকে ধ্বংস করছে। অনেক ভেবেছেন বিষয়টা, তার ভালমন্দ সবদিক ; নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন ইতোমধ্যে, এবার অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে নজমুল বললেন, আপনি যা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমি ঘৃণা প্রকাশ করছি। কিন্তু আমি নিরুপায়ও বটে। ঠিক আছে, বলুন কত দামে হারটা কিনেছেন?

তা কেন স্যার, তা কেন। অতি সামান্য টাকা, একদম কম। আপনি চিন্তা করবেন না।

স্টপ ইট। নজমুল ধমক দিয়ে বললেন, বলুন কত টাকা। এক্ষুণি আমি পে করে দেবো।

সঙ্গে-সঙ্গে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে স্যামসোনাইট ব্রিফকেসটা চটাস করে খুললেন, এবং একটা চেকবই বার করলেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে অন্য দৃশ্য। কাঁপছিলেন সালাম, পট করে টেবিলের পাশ দিয়ে দ্রুত নুয়ে পড়লেন এবং দুই হাতে পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠলেন, আপনি মা-বাপ, আপনি আমার পীরদরবেশ। মাফ করে দ্যান স্যার, একবারের মত মাপ করে দ্যান। ষাট হাজার টাকা আর কি। আপনি তা ফেরৎ দিলে আমি রাস্তায় গিয়ে ট্রাকের তলায় পড়ব। আমি শখ করে আমার ম্যাডাম আপামনির জন্য দিয়ে এসেছি, আমাকে কষ্ট দিবেন না স্যার—

অশ্রুজলে গাল ভাসিয়ে তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। নজমুল বিষণ্ন, বিব্রত ; তিনি তার বাজুতে ধরে বললেন, ঠিক আছে উঠুন। আপনার ফাইলে আমি সই করে দিচ্ছি, জিওটা সেকশন থেকে নিয়ে নেবেন। কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনো এমন করবেন না। আর একটা কথা, আমার বাসার ছায়াও মাড়াবেন না।

ঠিক আছে স্যার। রুমালে চোখ মুছে সালাম জানালেন আবদুস সালাম, এবং বললেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার, এখন আসি। কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে রাখবেন না।

হোটেল সোনারগাঁওয়ে একটি আন্তঃপূর্বাঞ্চলীয় সেমিনার ছিল। একটু আগেই গেলেন এবং লাঞ্চ করে নিলেন।

অধিবেশনের পরে বাসায় ফিরতে আবার সেই বিকেল ; বাগানে নেমে এসেছিলেন বেগম সাহেবা দিলরুবা হক। তিনি গাড়ির শব্দ শুনে এগিয়ে গেলেন।

আর্দালী ব্রিফকেসটা নিয়ে ড্রয়িংরুমে রাখল। দিলরুবা সুচারুরূপে সেজেছেন, দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, চল উপরে। আজকেও তো দেরি করে ফিরলে। একটু বিশ্রাম কর।

কিছু মন্তব্য করলেন না নজমুল, স্ত্রীর সহানুভূতিটা বেশ ভালো লাগল। চলতে-চলতে অভ্যেস মতো জিজ্ঞেস করলেন, কেউ এসেছিল নাকি?

দিলরুবা একটু চুপ, তারপর বললেন, না, না। কে আর আসবে। বাসায় লোকজন যত কম আসে ততই ভালো।

আমাকে এক কাপ চা দিতে বলো। শয়নকক্ষে এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নজমুল বললেন, বেশ কড়া এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

দেবো, দেবো। নিজের হাতে বানিয়ে দেবো। দিলরুবা মিটিমিটি হাসতে-হাসতে রহস্যের ভঙ্গিতে বললেন, শার্ট আর টাইটা খোলো তো?

কেন, কি হবে?

হবে, হবে। দিলরুবা ওয়ারড্রবের কপাটটা খুললেন এবং হ্যাঙ্গারে টাঙানো একটা ছাইরঙা স্যুট বার করে এগিয়ে ধরতে-ধরতে বললেন, তুমি আমাকে এত দামী একটা উপহার দিয়েছ আর আমি কিছু দেবো না? পরো তো দেখি, ফিট্ করে কিনা। আমার স্পেশাল অর্ডার ছিল একরাত দুই বিকেলে বানিয়েছে। আমেরিকান কাপড় বেশ মোলায়েম ও সুন্দর।

তুমি আবার এ পাগলামি করতে গেলে কেন রুবা।

পাগলামি? হ্যাঁ পাগলামিও বলতে পারো বটে। কিন্তু এটা আমার মনের তাগিদ। তা পুরা না করে ভালো লাগছিল না।

সত্যি একসেলেন্ট কাট্, আজকাল ঢাকায় ভালোই স্যুট বানায়। বিদেশী টেইলারদেরও হার মানাতে পারে। স্যুটটা তাড়াতাড়ি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন এবং মৃদু হেসে বললেন, পারফেক্টলি অলরাইট, দ্যাখ তো রুবা?

দিলরুবা কাছে গেলেন, এদিক-ওদিক একটু টেনে-টুনে দেখতে-দেখতে হাসতে-হাসতে বললেন, মিঃ হক ইউ লুক লাইক এ সিনেমা হিরো!

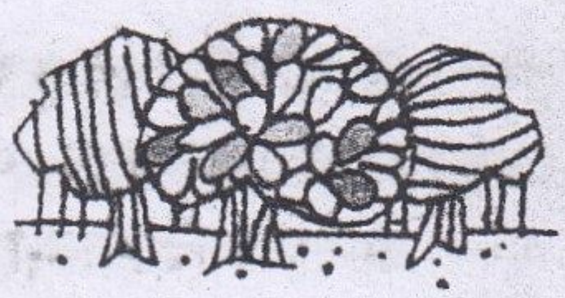
রিয়্যালী?

যাই বলো, মিঃ সালাম লোকটা বেশ ভালো এবং পাওয়ারফুল। তাঁকে দিয়েই করিয়েছি, নইলে এত অল্প সময়ে কে পারত? তন্ময়, আনন্দিত দিলরুবা টাইয়ে একটু টান দিয়ে বললেন, কি অদ্ভুত লোকটা, এত করে সাধলাম—একটা পয়সাও নিল না।

আকাশে স্তরে-স্তরে মেঘ জমেছিল, ক্ষণে—ক্ষণে গুড়্গুড়্ আওয়াজ। রাত নেমে এসেছে। কিছুক্ষণে বৃষ্টি নেমে আসে। ঘড়ির কাঁটা লাফিয়ে চলছে টিক্টিক্-টিক্টিক্। ক্রমে বারোটা, একটা। মশারির ভিতরে দিলরুবা, কাত হয়ে শুয়ে আছে ; নজমুল নিঃশব্দে উঠে করিডোর ছাড়িয়ে বারান্দার কাছে এলেন। দেখলেন চতুর্দিকে কেবল বর্ষণ আর অন্ধকার। তার দু'চোখ থেকে গাল বেয়ে দর্দর্ অশ্রু ঝরতে লাগল।

জুন, ১৯৮৪।

শেষ হত্যাকাণ্ড



এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু মাটির কাঁচা রাস্তার উপরে ঝকরঝকর শব্দ করে ছাইরঙের ছোট গাড়িটা যখন এসে থামলো আমগাছটার কাছে, তখন চারদিকে আবছায়া। অনেক আগেই ডুবে গেছে সূর্য, কিন্তু তার লালিমা দেখা যায়নি। বিকেল থেকেই মেঘ ছিল ; উত্তর-আসমানজোড়া তার আস্তরণ ক্রমে কালো হয়ে উঠছে, অল্প-অল্প বাতাস। কিছুক্ষণ পরেই হয়তো একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু এখন, এই আয়োজনটা ঝড়ের না বৃষ্টির ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গত কয়দিন ধরেই, থেকে থেকে বিরতি দিয়ে বাদলা, বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়ায় একটা কিছু গড়বড় হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন। যা হবার হোক, কিন্তু এই অনিয়ম দেশের মূল ভূখন্ডে ফসলের ক্ষতি করতে পারে এই যা মুশকিল।

অবশ্য যে কোনরকম ক্ষয়ক্ষতির হিসেব ও মূল্যায়ন করার সময় লোকজনের অত্যন্ত কম। যে যে-রকমভাবে পাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে জীবিকার তাড়নায়। ঝপাৎ করে গাড়ির একটা দরোজা ফাঁক হয়ে গেলে ডান হাতটা পিঠের উপর দিয়ে জাপটে ধরে বন্ধুকে নামাবার সময় এমন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আরহামের মনে খেলা করছিল। সম্পন্ন পিতার আদুরে দুলাল ; কিন্তু বেশ সংযত ও বুদ্ধিমান। অর্থনীতির সেরা ছাত্র সহপাঠী আলমগীরের প্রতি তাদের দরদ ও ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর : মনে করত, ও দেশের একটা রত্ন, ভবিষ্যতে উন্নয়নের নেতৃত্বমূলক চিন্তাধারা দিতে পারে।

আহ, অমন করছিস কেন, আমাকে তুই ছাড় আরহাম—। একটা মোচড় মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতে নেশাজড়িত স্বরে বলল, আমি কি মাতাল হয়ে গেছি?

না না। মাতাল হবি কেন, মাতাল হোস্‌নি। আরো সাবধানে জড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল আলমগীর, তোকে এখন শুতে দিতে হবে। তোর ঘুমানোর প্রয়োজন।

ঘুম—। আমার ঘুম হবে না। ঘুম একটা প্রতারণা, আমাকে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখায়।

পিছন-পিছন রেবিয়েছিল আরো দুই জন। তারা কাছে কাছে, সঙ্গে আসছিল। খোলা রাস্তা থেকে ছোট পথে এদিকে কিছুটা এলেই ঝোপ-ঝাড়, কিছু জঙ্গল। এদিক-ওদিক কয়েকটি তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে : এ জায়গাটা পেরিয়ে সরু মাটির পথে আরেকটু এগুলে উত্তরে একটি, দক্ষিণে একটি, দুটো বড় আমগাছ; তিনদিকে বিলাতী মেহেদী গাছের বেড়া, এককালে যাই থাকুক এখন কোনো যত্ন নেই। উপরে-নীচে স্বর্ণলতা লতিয়ে লতিয়ে বেষ্টন করেছে। প্রবেশপথ ছোট। দুধারে দুটি গাছ—, একটি কামিনী, আরেকটি শিউলী। ওখান থেকে তাকালে দেখা যায় বাঁশের বেড়া ছনের ছাউনি : একটি বড়, দুটো মাঝারি ও একটি ছোটঘর, চার ভিটিতে, বেশ পুরাতন। আশেপাশে সকলেই চেনে, এটা বাবর আলি মাস্টারের বাড়ি। সাত চল্লিশ সালে দেশ বিভাগের সময় সহকর্মীর কাছ থেকে অল্প পয়সায় কিনেছিলেন। তখন তরুণ, বয়সে বছর পঁচিশ। পোগোজে ছিলেন। পরবর্তীকালে কলেজিয়েটে আসেন এবং তুখোড় গণিতশিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। অবসর নিয়েছেন, আজ চার বছর: কিন্তু এখনো ডাক পড়ে। পেনশনের টাকা আর কত, চারটে টিউশনিতে হাজার দুয়েক টাকা হয়, তাতেই সংসারটা চলে।

ছোট প্রাঙ্গণ, একটা বাগানও আছে। এক সময়ে ছেলেমেয়েদের কল-কাকলীতে

মুখরিত থাকত। কিন্তু এখন একটি নিস্তব্ধতা।

আরহাম বন্ধুকে ধরে যখন সামনের ছনের ছাওয়া ঘরটার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনো এদিকে কেউ ছিলো না।

এই শূন্যতা, অনেকেই জানে, এক করুণ ইতিহাস। অভাবদারিদ্র থাকলেও উদ্দীপনা কম ছিলো না, বাবর আলি মাস্টারের চার ছেলে তিন মেয়ে। ভালো নম্বর নিয়ে বিএসসি পাশ করার বছর তিন পরে, সাতচল্লিশে, দেশ বিভাগের আটমাস আগে বিয়ে করেছিলেন। এই আট মাসের মধ্যেই জন্ম নেয় প্রথম সন্তান, একটি ফুটফুটে মোটাতাজা মেয়ে। নিজের নামের জন্যই কিনা জানা যায়নি, মুঘল ইতিহাসের তাঁর দুর্বলতা ছিল। মেয়ের নাম রাখলেন নুরজাহান। দ্বিতীয় সন্তান মমতাজ মহল। তৃতীয় সন্তানের জন্ম দু'বছর বছরে, তাও কন্যা, জেবউন্নিসা। চতুর্থ সন্তান, প্রথম পুত্র আকবরের জন্ম হয় তিপ্পান্ন সালে, যখন দেশে পশ্চিমা শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠেছে।

বাবর মাস্টার অনেকটা নিরাবেগ, কাঠখোট্টা লোক। নাকের উপরে চশমা নামিয়ে ছেলেদের অঙ্ক শেখাতেন; কিন্তু তার মধ্যে একটা চাপা-বিদ্রোহীর ভাব ছিল। সবই বুঝতেন, ঘটনাধারা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে, কিন্তু প্রকাশ করতেন না, এই যা। যেটুকু করতেন, তা ঘরের ভিতরে এসে, বৌয়ের কাছে।

কিন্তু তার এই চাপা আগুনই কি ছেলেমেয়েদের শিরায় শিরায় গোপনে সঞ্চারিত হয়ে গেছে? নইলে কেন এমন হবে? কেন ওরা এত অসহিষ্ণু, চঞ্চল? হয়তো তা নয়, বরং অদৃষ্ট : তারা ওদের জন্মদাতার মাটির অংশটাও তো পেতে পারত।

যথা সময়ে ভালো ভালো জায়গায়ই তিনবোনের বিয়ে হয়ে গেছে; ওরা সুখে দুঃখে আছে। কিন্তু চার ভাইয়ের মধ্যে তিনজনই একণ পরলোকগত। আকবার মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে, জাহাঙ্গীর হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার শিকার, এবং শাহাজাহান, পঁচাত্তরে পালিয়ে গেলে, সীমান্তের ওপারে, ক্যাম্পের অদূরে, দলীয় ছেলেদের হাতেই নিহত হয়েছে। এখন টিমটিমে, একবাতি, আলমগীর।

আলমগীরের মা, যিনি মাস্টারগিন্নি নামে পরিচিতা, যথেষ্ট ধৈর্যশীল মহিলা; অন্যেরা, বিশেষ করে স্বামী যাতে মুষড়ে না পড়েন, সেজন্য চুপচাপ থাকেন। কিন্তু সারাদিন এবং যতক্ষণ ঘুমান; সারারাত তার চোখ থেকে নীরবে পানি ঝরে। সোনার টুকরো তিনি ছেলের স্মৃতি এক মুহূর্তও ভুলতে পারেন না।

বড় রাস্তার পোল হয়ে বৈদ্যুতিক তার এসেছে গ্রামবস্তির দিকে, ওদের ঘরগুলোতে একটি করে বাল্ব। আরহাম আলমগীরকে বাংলাঘরের চৌকিতে শুইয়ে দিয়ে পিছন দরোজায় গেল। তখন উঠানের দড়ি থেকে কাপড় তুলছিলেন মাস্টারগিন্নি আফিয়া খাতুন, গলাখাকারি শুনে ফিরে তাকালেন।

আরহাম ডাকদিয়ে বলল, খালাম্মা আছেন।

কে বাবা, তুমি। উনি জলদি এদিকে এলেন।

আমি আরহাম। ও জবাব দিল, আপনি একটু বৈঠকখানায় আসুন।

কেন, কি হয়েছে, বাবা? একটুতেই আজকাল কণ্ঠস্বর শঙ্কার ছায়া নামে, তিনি দ্রুত আসতে আসতে বললেন, আলমগীরের কিছু হয়নি তো?

না, না, কিছু হয়নি।

আমার কেবল ভয় করে, বাবা। কখন কি হয়। আজকাল যা দিন-কাল পড়েছে। মাথাটা একটু নুইয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আফিয়া বললেন, আমার তো ওকে বাইরে যেতে

দিতেই ইচ্ছে হয় না।

ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও। সহপাঠীদের একজন একটা হাত ধরে রেখেছিল, সেটা নাড়া দিয়ে আলমগীর চেঁচিয়ে উঠল।

ওমা, একি হয়েছে গো, আমার জাদু এমন করছে কেন। আরহাম, বাবা, আলমগীরের কি হয়েছে? কি হয়েছে, বল বাবা, বল তুমি।

তিনি আকুলভাবে ছুটে গিয়ে ছেলেকে জাবড়ে ধরলেন।

মা, তুমি কেন এসেছো। চোখ পাকিয়ে আলমগীরের প্রশ্ন। সে আদেশ করল, তুমি চলে যাও। আমাকে ছুয়ে নিজেকে অপবিত্র করো না।

বাবা আরহাম, তুমি তো ভাল ছেলে, তুমি বল ও এমন আবোল তাবোল বকছে কেন। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।

কিচ্ছু হয়নি মা, আপনি ভাববেন না। ওর শরীরটা খারাপ করেছে, এখুনি ভালো হয়ে যাবে।

জ্বরটর আসছে না তো? ওর মাথায় পানি ঢালবো? তিনি ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, তারপর ব্যস্তভাবে ডাকতে লাগলেন সুখী! ও সুখী। তুই কোথায় গেলি? জলদি এদিকে আয়, জলদি।

ওদিকে, উত্তরের ভিটিতে রান্নাঘরে ছিল, ষোড়শী কাজের মেয়েটি দৌড়ে এল, কপাটের কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে জিগগেস করল, আমারে ডাক দিছেন খালাম্মা।

হ্যাঁ, জলদি এক বালতি পানি আর মগটা নিয়ে আয়।

আচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে সুখী ছুটে চলে গেল।

বালিশে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছিল, দুইজন সহপাঠীকে তার দুপাশে বসিয়ে আরহাম বলল, তোরা একটু দেখিস্‌, আমি আসছি। চলুন খালাম্মা।

কিছু বলবে তুমি আরহাম?

জি হ্যাঁ, একটু চলুন বাইরে।

আরহামের সঙ্গে বেরিয়ে এসে শিউলিগাছটার নিচে দাঁড়ালেন, আফিয়া কাতর স্বরে বললেন, তুমি তো জানই বাবা, আমার তিনটা ছেলেকে শত্রুরা মেরে ফেলেছে।

জানি খালাম্মা, আমি সব জানি।

আলমগীর এখন আমাদের একমাত্র আশাভরসা।

ঠিকই বলেছেন। ইকনমিক্সের অনার্স পরীক্ষায় ওর তো এবার ফার্স্ট হওয়ার কথা। পড়াশোনা কেমন করেছে?

সারাদিন সারারাত তো বই নিয়েই পড়ে থাকি। ওর বাপটা তো জানেপ্রাণে খাটছে এ বয়সেও। আমি ওকে চোখে চোখে রাখি, শহরে যেতে দিতে চাই না। তোমাদের ক্লাস তো আর হচ্ছে না।

জ্বি না। সে আজ প্রায় দেড় মাস।

শহরে যেতে চাইলে যখন বলে তোমার কাছে যাচ্ছে কিংবা লাইব্রেরীতে তখন আমি আর আপত্তি করি না।

সে ঠিকই ছিল। আরহাম নিচুস্বরে বলল, জানেন তো বাবা হার্টের রোগী, লন্ডন গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমার অনুপস্থিতির এই এক মাসের মধ্যেই এমনভাবে ব্যাপার গড়াবে বুঝতে পারিনি। তাহলে আপনাদেরকে সাবধান করে দিয়ে

যেতাম।

কি হয়েছে, বাবা, সব খুলে বল। আফিয়া আরহামের একটা হাত নাড়া দিয়ে বললেন, আমার যে ভালো লাগছে না।

আরহাম একটু থেমে থেমে বলতে লাগল জানেন তো ইউনিভারসিটির অবস্থা এদিন স্ট্রাইক, সেদিন প্রসেশন। পলিটিক্স কেবল পলিটিক্স।

পলিটিক্স তো ভালোই, খারাপ কিছু নয়। পলিটিক্স না করলে দেশ চলবে কি করে, বিশেষ করে আমরা এখন স্বাধীন জাতি। তরুণরা রাজনীতি শিখবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সব কিছুরই একটা সময় আছে, একটা সীমারেখা আছে। ছাত্ররা যদি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কেবল দল পাকায়, ঘোরাঘুরি করে তাহলে আর আশা করবার কি থাকে। শত রকম গ্রুপ, আমরা কেউ কাউকে দেখতে পারি না। আমি ছিলাম না খালাম্মা, এই এক মাসে আলমগীর বদলে গেছে। সে আর পড়ার কথা ভাবে না, পরীক্ষার কথা চিন্তা করে না। ইউনিভারসিটি ফার্স্ট হতে চায় না। একটা গ্রুপ ওকে গ্রাস করেছে, সে এখন ওদের দলনেতা।'

আফিয়া খাতুন শুনতে শুনতে থ মেরে ছিলেন, হঠাৎ কাতরে উঠলেন হায় আল্লাহ, আমি কি করবো। কি নিয়ে বাঁচবো আমি।

আজকে আলমগীর সকালেই তো বেরিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ বাবা, অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করেছে, সাড়ে নটার দিকে জাগল। তারপর তাড়াতাড়ি নাশতা দিতে বলল। আমি তো আটটা থেকে তৈরি রাখি। নাকে মুখে কিছু দিয়ে সে চলে গেল। বলল, একটা জরুরী বই আনতে যাচ্ছে।

শুনে হয়তো কষ্ট পাবেন খালাম্মা। আজ দুপুরবেলা।

কি হয়েছে, বাবা? কি হয়েছে।

আজ দুপুরবেলা, আনুমানিক এগারটার দিকে ওদের আংশিক দ্রুপ ওকে মধুর ক্যান্টিনের পিছনে টেনে নিয়ে মারধোর করেছে। আমি ওদিকে ছিলাম, শুনে দৌড়ে গেলাম। ওকে ছাড়িয়ে আনলাম। সে তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর চেহারা। ছাড়াবার চেষ্টা করছিল, লাফাচ্ছিল। আর চিৎকার করছিল। প্রতিশোধ নেবে, প্রতিশোধ। ওর দলের তিনচারজন এসে কোথায় নিয়ে গেল জানি না। আবার চারটার দিকে শুনি গোলমাল।

মনে হল, ওর দলই ওকে মাতাচ্ছে, উস্কানি দিচ্ছে অথচ অন্য সবাই নিরাপদ দূরত্বেই থাকছে। আশ্চর্য, ওকে মদ খাইয়েছে। আর এই দেখুন—

একটা চকচকে কালো পিস্তল পকেটের ভিতর থেকে বের করে দেখালে আফিয়া আঁৎকে উঠলেন। প্রায় মুর্ছা যাওয়ার যোগাড়, কাঁপতে কাঁপতে উচ্চারণ, হায় আল্লাহ্ আমি কি করবো—

আরহাম ধীরকণ্ঠে বলল, একটা অনুরোধ, আপনি ধৈর্য হারাবেন না খালাম্মা। উত্তেজিত হবেন না। আমি কোন রকমে ওকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি, ওকে আর আপনারা বাড়ি থেকে বেরুতে দেবেন না। দরকার হলে তালাবদ্ধ করে রাখবেন। জানেন? শুনে হয়তো তাজ্জব বনে যাবেন, ওদের পিছনে কলকাঠি কার? উনি, শুনেছি খালুজানের এককালের বিশিষ্ট বন্ধু।

কার কথা বলছো তুমি বাবা?

জনাব আশরাফ আলী খান, নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন। লোকে বলে, তার সদস্যসংখ্যা তিন চারজনের বেশি না। আর এদের গ্রুপটি হচ্ছে তার ছাত্রফ্রন্ট। উনি ঘাগুলোক, ঠিকই জানেন এখানেই সাফল্যের চাবিকাঠি। কিছুসংখ্যক ছাত্রকে মাতিয়ে রাখতে পারলে তার বড়নেতা হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। পত্রিকায় কভারেজ পাবেন।

বিবৃতি দিতে পারবেন। পর্দার অন্তরালেই তার কারবার। লাইসেন্স ভাঙিয়ে কিছু কাঁচা পয়সা করেছেন— এবং তার অংশবিশেষ পুঁজি হিসেবে খাটাচ্ছেন—

ওদের ফিস্‌ফিস্ কথাবলার সময়ে কাঁচাপথে বিলাতি মেহেদীর বেড়ার কোণে ঠোকার সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। পরিচিত আওয়াজ, বাবর আলি মাস্টার টিউশনি শেষ করে ফিরে আসছেন। হালকা মেজাজা, সবসময়ই একটা ফূর্তি ফূর্তি ভাব; লোকে বলে, পাষণ্ড। তার হৃদয়ে নরম পদার্থ কিছু নেই, গণিতের মতোই কেবল কঠিন শাঁস, নইলে তিন তিনটা সন্তানের অকালমৃত্যুর পরেও কথায় কথায় এমন হাহা করে হেসে উঠতে পারতেন না। আসতে, আসতে তাই আওড়াচ্ছিলেন তার প্রিয় গানের কলি, একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি—

তুমি বাবা, আলমগীরের কাছে যাও, আমি একটু পরে আসছি। আফিয়া খাতুন বললেন, শুনলে উনি কি আবার কাণ্ড করে বসেন।

আরহাম চলে যাচ্ছে, এমন সময় বাবর ঢুকলেন, আবছায়ার মধ্যে স্ত্রীকে বলে উঠলেন, আফি এখানে কি করছ। আমার প্রতীক্ষায় আছ না? ওই ছেলেটি কে? চলে গেল—

সবদিকে খেয়ালে আছে। আফিয়া বললেন, আরহাম, আলমগীরের কাছে এসেছে একটা প্রশ্ন বুঝতে। চল আমাদের ঘরে।

ওর বাবা অসুস্থ ছিল। ওর সঙ্গে একটু কথা বলবো না?

পরে বলো, এখন চল তো। একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও।

স্বামীর হাত ধরে ঘরের পাশ দিয়ে নিয়ে যেত লাগলেন। এতটা কোনদিন করেন না; তবু বিস্মিত হলেন না, মনে কোনো প্রশ্নও জাগলো না। আফিয়া খুব ভালো মেয়ে, যে-কোনো সময়ে তার ব্যবহারের গভীরতা অস্বাভাবিক নয়।

পশ্চিম ভিটির ঘরে আসার পর লাঠিটা বেড়ার একটা আকসিতে টাঙিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হোমওয়ার্কের খাতাভরতি কাপড়ের ব্যাগটা নিচে জলচৌকিতে রাখলেন।

সুখীটা কোথায়, হাত মুখ ধোওয়ার পানি দিত। আফিয়া থমথমে হয়ে ছিলেন, কিন্তু তার দিকে তাকাচ্ছেন না, ক্যাম্বিসের জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে আপন মনেই বলে চললেন, হাহাহাহা, আজকালকার পোলাপানের কি যে অবস্থা। এখন জালালের মেয়ে রুমাকে পড়িয়ে এলাম। নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সে গাল ফুলিয়ে বলে, আমার মাথায় অঙ্ক ঢোকে না স্যার। হাহাহাহা, আমি বললাম, ঠিক আছে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি গণিতের একটা ড্রাগ আবিস্কার করছি। এক বড়ি খেলেই শুধু বোঝা নয়, একটি অটোমেটিক কমপিউটার হয়ে যাবে, হাহাহাহা। সে সরল বিশ্বাসে মিনতি করে বলল, আমাকে কয়েকটা দিন না স্যার? হাহাহাহা, আমার ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন সচিব, জালাল তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনজন ডিজি এবং দুইজন রাষ্ট্রদূত। আর কি, ইট্‌স গ্রেট এচিভমেন্ট, কেউ মানুক আর নাই মানুক। শোনো ওদের বাসার থেকে বেরুতেই রাস্তায় প্রফেসর রহমানের সঙ্গে দেখা হল। উনি কাছে এসে বললেন, আপনার ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখবেন স্যার। আরে, আমার ছেলেরা কি বয়ে যাবে? যারা চলে গেছে, ওরা মরে গেছে, বাপের ব্যাটা। তবু আমি উত্তর দিলাম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি এটা বললাম না, আমার আলমগীর পোকড়া আম নয়, একটা সলিড গোল্ড। কার হাতে তৈরি দেখতে হবে তো?

আরো কতক্ষণ বকে যেতেন হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতেই দেখেন আফিয়ার চোখে দরদর অশ্রুধারা।

আরে একি ব্যাপার। তুমি দেখি কাঁদছ, ছেলেদের কথা আবার মনে পড়েছে বুঝি।

আহা মায়ের প্রাণ তো। কিন্তু আমি তো কাঁদি না, ওদের জন্য গর্ব অনুভব করি। উনি দাঁড়াতেই আফিয়া তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, উনি বলে উঠলেন, আরে আরে কি হয়েছে, আফি। এমন দুর্বল হলে চলবে কেন—

বাজুতে হাত বুলিয়ে সান্তনা দিচ্ছেন। এমন সময় মাথাটা তুলে আফিয়া বললেন তুমি তো কোনদিকে খেয়াল রাখো না তোমার শেষপুত্র আলমগীরকেও—

হ্যাঁ হ্যাঁ? কি হয়েছে ওর?

আলমগীরকেও ওরা হত্যা করেছে!

না—। একটা তীব্র চিৎকার করে উঠলেন বাবর, গলায় সমস্ত জোর ঢেলে বললেন, তা হতে পারে না। তুমি মিথ্যে বলছ।

মিথ্যে? মিথ্যে কেন বলবো। আঁচলে চোখ মোছার চেষ্টা করে আফিয়া বললেন, এর চেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড আর কি হতে পারে। যাও যাও। বৈঠকখানায় আছে, দ্যাখ গে ওর লাশ!

বাবর কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজও বেরুল না। তিনি উত্তেজিত, ক্ষিপ্তের মতো ঘুরে উঠোনের দিকে ছুট ছিলেনা। আর আফিয়া আসেন ধীর পদক্ষেপে তার পিছু পিছু।

অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করার পর শান্ত হয়ে গেছে আলমগীর, ভর মাথাটা শিথিল হয়ে পড়েছে বালিশের উপর। ডানদিকে ঈষৎ কাত, চোখজোড়া বোঁজা। ধীর শ্বাসপ্রশ্বাস। সহপাঠী দুইজন, তেমনি দুদিকে ওর হাত ধরে, সামনের দিকে আবছায়া, মাথায় কিছু পানি ঢালা শেষ হলে বালতিটার কড়াটা মুঠো করে ধরে দাঁড়িয়েছে সুখী, এমন সময় একরাশ ঝড়ের মত দৌড়ে এসে দাঁড়ালেন বাবর, হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করতে থাকেন, কে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে? কে? কি দিয়ে মেরেছে? এলেমজি, রিভলবার? না ছুরি? বল, বল তোমরা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন। বল, বল।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট করে। কি যেন একটা ঠেলে উঠছে, গলার ভিতরটা টনটন করছিল। আরহাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করল, স্যার—।

মুখটা তো ঠিকই আছে। চৌকির ধারে বসলেন, পাগলের মতো হাত বাড়িয়ে ওর বুকের উপর থেকে কাপড়-চোপড় সরাতে সরাতে বললেন, দেখি কোথায় জখম করেছে? কোথায় ক্ষতচিহ্ন?

বুকের উপরে খস্‌খস্‌ নাড়াচাড়া লাগাতেই চট করে চোখ খুলে যায়, আলমগীর তাকিয়ে দেখল, তারপর চিনতে পেরে দুহাতে ভর করে মাথাটা তুলল। অভিযুক্ত করার বিশ্রী ভঙ্গিতে সে ধমক দিয়ে উঠল, তুমি এসেছ কেন, হ্যাঁ? তুমি এখানে এসেছ কেন, বাবা? যাও, চলে যাও। তোমাকে আমি চিনতে বাকি নেই; মুখে বড় বড় বুলি, সারা জীবন আত্মপ্রবঞ্চনা করেছ। আর আমাদেরকেও ঠেলে দিয়েছ ধ্বংসের মুখে। যাদের নিয়ে গর্ব কর, সেই তোমার প্রিয় ছাত্ররা সব ব্যক্তিস্বার্থবাদী, প্রবঞ্চক শোষকশ্রেণী। আর না, আর না। আমি, আমরা তোমাদের এই মিথ্যের প্রাসাদ ভেঙে গুড়িয়ে ফেলবো। আমার চোখের সামনে থেকে যাও, চলে যাও।

আগুন ঠিকরে পড়ছিল চোখের তারা থেকে, প্রচণ্ড আবেগে কাঁপছিল আলমগীর, ওর বন্ধুরা স্তব্ধ। একেবারে হতভম্ব বাবর মাস্টার, আফিয়া এসে ধরলে উনি আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন; তারপর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামলেন। মাথার ভিতরটা টক্কর খেয়ে উঠল, স্ত্রীকে জড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরে উঠলেন। প্রথম চৌকির ধারে বসেছিলেন, কিন্তু ঠিক থাকতে পারলেন না। সমস্ত রক্ত যেন নিঃসরিত, ভীষণ দুর্বল হয়েছে শরীরটা, তিনি

কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আফিয়া শিয়রের কাছে টুলে বসে মাথায় একটু হাত বুলোতে থাকেন। এবং একটু পরে স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকেন সব কথা; গাল বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা।

একদম ঝিম্ মেরে পড়েছিলেন, কতক্ষণ চলে গেল বলতে পারবেন না। এক সময় বাইরের ঘরে কিছু উচ্চ শব্দ ও কথাবার্তা শোনা যায়, একজন ভদ্রলোক এসেছেন বলে সুখী এসে জানালে ঝট্ করে উঠে পড়লেন। উনি দেখা করতে চান। হে হবেন ভাবতে ভাবতে গিয়ে পৌছতেই দেখেন আশরাফ আলি খান। আলমগীর শুয়ে আছে, চুপচাপ, অন্যেরা দাঁড়িয়ে। আর উনি উৎসাহ দিয়ে হাসিখুসি আলাপ করছেন। উনি ঘুরলেন; এবং দাঁড়িয়ে এগুলেন একটু। করমর্দন করার জন্য ডান হাতটা বাড়িয়ে বললেন, এসো এসো বাবর। তা কেমন আছো? ইয়ংম্যানরা, তোমরা হয়তো জান না, এই তোমাদের শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত শিক্ষক আমার বোজোম ফ্রেন্ড। স্কুল জীবনে দুজন গলাগলি ছিলাম—

বাবর মাস্টার অগ্নিদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন, করমর্দন করলেন না। তার ক্ষুব্ধমূর্তি। একটা ঢোক গিলে পরে বললেন, এসো আশরাফ, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

শিউলিতলায় এসে আশরাফ বললেন, ইউ আর এ লাকি ম্যান বাবর। চারদিকে শুধু তোমায় গৌরব আর সুনাম।

আশরাফ! দাঁতে ঘর্ষণের সঙ্গে একটা চাপা আক্রোশপূর্ণ প্রচণ্ড ধমক, বাবর তার দুকাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, বল তুমি, বল। তিনটা গেছে, আমার একটা মাত্র ছেলে ছিল। কেন তুমি তাকে মেরে ফেলেছ। বল, কেন কেন। আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

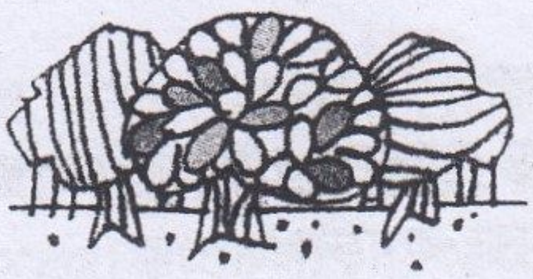
ছিঃ মাস্টার। তুমি এখনো এত সেন্টিমেন্টাল। বন্ধুর হাত ছাড়াতে ছাড়াতে ম্লান হেসে আশরাফ আলী খান বললেন, আমার ছেলে নেই, আলমগীর আমারও ছেলে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও জীবনে আমি কিছু হতে পারিনি। আমি ওকে মিনিস্টার বানাবো, ওর প্রতিভা আছে।

না—। না আশরাফ না, আমার ছেলেকে তুমি ফিরিয়ে দাও। কাতর স্বরে বলতে বলতে কম্পিত দুহাতে বন্ধুর শরীর ধরে, হড়কে পড়তে পড়তে বাবর উচ্চারণ করলেন। তারপর চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

তক্ষুণি নিচু হয়ে মাটিতে সস্নেহে দুহাতে তাঁকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতে করতে আশরাফ সস্নেহে বললেন, পাগল!

শব্দটা কানে গেল, একটু তাকালেন শুধু : তখন তাঁর চোখের ভিতরে ঘোর আচ্ছন্নতা, যেন দেখছেন বিশার জনতার একটা বিক্ষুব্ধ মিছিল আকাশে বজ্রধ্বনি ছুটিতে ছুটিতে এগিয়ে যাচ্ছে মহাপতঙ্গের মত যার পুরোভাগে রোদেপোড়া তামাটে চেহারা আলমগীর, ওর হাতে একটা পতাকা পত্ পত্ উড়ছে। উনি চোখ বুঁজলেন, আস্তে আস্তে মসৃণ হতে থাকে তাঁর মুখের চামড়া, সেখানে পড়ে অন্ধকার শান্ত শীতল গাছের ছায়া।

জুন, ১৯৮৪



মুক্তিযোদ্ধা

একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে মুক্তিযোদ্ধা একজন, প্রথমে অতিরিক্ত পদবী ছিল পঙ্গু, এখন যুদ্ধাহত। গ্রামে জন্মেছে, গ্রামে ছিল। এখনো, সংসদের সম্মেলনে যোগ দিতে কিংবা এমনিতেও মাঝে মাঝে শহরে গেলেও গ্রামেই তার নিঃশ্বাস পড়ে, অন্ধকারের আলো হাওয়ায়।

বহু গরদিশ গেছে স্বাধীনতার পরেও এবং কয়েকটি হত্যাকাণ্ড তো ছিল লোমহর্ষক ; কিন্তু সে এখনো বেঁচে আছে। আশেপাশের চারটি গ্রামে কয়েক লাখ মানুষ, একেকজনের চরিত্র একেকরকম। এবং সে তাদের মধ্যেও আলাদা। আলাদা চেহারায়, আলাদা কথাবার্তায়। কিন্তু সবচেয়ে আলাদা আবেগ অনুভূতিতে, আশা ও কল্পনায়। সে একটু বেশী ভাবপ্রবণ। সহজেই রেগে ওঠে, করে চিৎকার। কিন্তু যখন শান্ত হয়ে যায় তখন নদীর প্রবাহের মতো শীতল সারা অন্তরে কুলুকুলু ধ্বনি শুধু।

সে মুক্তিযোদ্ধা, সে একটা অন্যরকম ইতিহাস।

অন্যরকম হয়ে যায় সে মাঝে মাঝে, এখনও অন্যরকম হয়ে আছে। এখন রাত নেমে এসেছে। আর একটু দক্ষিণ ঘুরে গাছতলার পথ নিলে খুব বেশি সময় লাগত এমন নয়, তবু সে এল সোজাসুজি, বড় বড় ঢেলা ওপড়ানো চষা জমির ওপর দিয়ে, একটিমাত্র পা নরম মাটির মধ্যে ডুবে যায়, সেটা টেনে তোলে। আবার হাঁটে। শরীর ঝাঁকিয়ে এমনভাবে এগিয়ে যায় অতীতের কেমন একটা রেশ ভিতরে ভিতরে শিহরণ জাগায়, যেন সজ্ঞানেই একটা গভীর স্বপ্নের মধ্যে ডুবছে, ভাসছে।

হ্যাঁ, সংগ্রামের সময় কতবার এমনি ভঙ্গিতে হেঁটে গেছে, কখনো দিয়েছে দৌড়। প্রথমদিকে খুব ভয় করত, হঠাৎ বুঝি গাছের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে বুকটা ঝাঁজরা করে দিল। বিশেষত, নিঃশব্দে লঞ্চে করে এসে নিশুতি রাতে যখন গ্রামে নামত এবং দুশমন ব্লক দিত, তখন অবস্থাটা হতো বেশি আশংকাজনক। রাইফেল, গ্রেনেড ছাড়াও ওদের সঙ্গে ভারী অস্ত্রও থাকত। অনুচরদের হাতে থাকত পেট্রোলের টিন, আগুন লাগাবার সরঞ্জাম।

আশ্চর্য, এই ভয়টা একদিন হঠাৎ করেই কেটে গিয়েছিল, যখন সে বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা হাতবোমা ছুঁড়ে মেরেছিল নদীর দিকে। হেলমেট মাথায়, ছোট বোটে পাঁচজন লি। দেখল যতই ভোমা ভোমা হোক না ওরাও ভয় পায়, আর্তনাদ করে ওঠে ঃ আসলে ওরাও আদমের জাত তো, লড়াইয়ে নেমে যতই জানোয়ার হোক না।

তারপর থেকে ওদের আনাগোনার গন্ধ পেলে শরীরের সমস্ত রক্তে যেন আগুন ধরে যেত। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ত, চোখজোড়া নিমেষে লাল। শিকারে গিয়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ার জন্য অস্ত্র হাতে দৌড় দিত।

কিন্তু এখন ক্রাচে ভর দিয়ে যাচ্ছে বলে সে ক্ষিপ্রতা ছিল না। রাতের প্রথম প্রহর চলছে।

গতকাল ছিলো বৃহস্পতিবার, পহেলা বৈশাখ। সন্ধ্যার একটু আগে তুফান এসেছিল। ঘন ঘন বিজলি, বজ্রের আওয়াজ। জোর বাতাস প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে অনেক কাঁচাবাড়ি উড়িয়ে নিয়েছিল। এখনো পথের ওপরে ভাঙা ডালপালা পড়ে আছে।

আধো অন্ধকারে চলার গতি থামিয়ে নদীর কাছাকাছি উঁচু জায়গায় বটগাছটার শিকড়ে

এসে বসল।

আবার ঝাঁকড়া চুল হয়েছে সেই সব দিনগুলোর মতো। ঘাড় ছাড়িয়ে পড়েছে কোঁকড়া কোঁকড়া কালো গোছা। মুখভরা দাড়িগোঁফ এবং চোখে কখনো ছায়া কখনো আগুন।

ডান পায়ের হাঁটু ইস্তক আছে, ভর দেয়ার সরঞ্জাম দুই ইয়ার দোস্তেরই মতো ; আছে না থাকলে অসহায় বোধ হয়। হাতের নাগালের মধ্যেই রাখে সব সময়। ওরা দু'জনই তো থাকত কাছে কাছেই, গলায় গলায় ভাব ছিল। একসঙ্গে চলাফেরা করত, একসঙ্গে খেলত। ঘুরে বেড়াত। এবং অনেক সময়েই একসঙ্গে ঘুমাত। জগদীশ পণ্ডিত মশাই বলতেন, তিনহার। তিন জনের নামের শেষেই হার ছিলো তো—মোজাহার, মোতাহার আর আতাহর। ঘাগটিয়া জুনিয়র বিদ্যালয়ের তিন রত্ন। পঁচিশের রাতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ওরা আরো অনেকের সঙ্গে একত্রেই মেলা দিয়েছিল আগরতলার দিকে। ট্রেনিং নিয়ে সাড়েতিন মাস পরে ফিরে আসে। ফেরার পরে আরও চারজন যোগ হয়। সাতজনের এই গ্রুপটি হয়ে দাঁড়ায় মেঘনা অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও মারাত্মক। লোকে বলত, কালাবিচ্ছু। মেঘনা তীরবর্তী আলগী মানিকনগর বেগমাবাদ এলাকায় প্রথম আক্রমণটির সময় ওরা যেন ততটা তৈরি ছিলো না, তবু মুখোমুখি লড়েছে ; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই দু'জন শহীদ হয়েছিল। একসঙ্গে ছিল। গাছের আড়ালে অসাবধানে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় কপালগুণেই যেন সে নিজে রক্ষা পেয়েছিল।

কি আর লাভ হয়েছে বেঁচে বরং মরলেই ছিলো ভালো। তখন মরে গেলে এখন এত যন্ত্রণা সইতে হতো না।

আস্তে আস্তে ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করল।

গতকাল কিনেছে, হ্যাঁ গতকালই। ছেড়ে দিয়েছিল, আবার ধরেছে। কেন ধরেছে, তার কোনো যুক্তি নেই, যদিও জানে ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবে একটু-একটু বুঝতে পারে নিজের অনুভূতি, এত সংযমে কি লাভ। ধূমপানে যক্ষ্মা কি বা ক্যানসার যদি হয়ে যায়, সেও তো ভালো ধ্বংসের কিনারা দিয়ে যখন চলেছে, তখন হিসেব করে চলা নিষ্প্রয়োজন। যে অবস্থা, আজরাইল যে-কোনো মুহূর্তে জানটা কবচ করে নিতে পারেন। এক শত্রু পরাজিত হয়ে চলে গেছে, কিন্তু এখন চতুর্দিকে শত্রু। একটু সুযোগ পেলেও, ছাড়বে না। এর মধ্যে যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, জীবনটাকে একটু ভোগ করে নেয়াই উত্তম বৈকি।

তবে যত মুশকিল, মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা নামটাই মুশকিল। মুক্তিযোদ্ধা নামটা গৌরবজনক এবং এই পদবী একবার যে পেয়েছে সে তো একান্ত সাধারণত হতে পারে না।

মুক্তিযোদ্ধা, এই নামের সঙ্গে বিজড়িত জাতির সারা ইতিহাস, তরুণের আত্মত্যাগের কাহিনী ঃ এর চাইতে বেশি সুখের আকাঙ্ক্ষা তার আর কি করতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধা একজন?

কিন্তু না, না। সুখের জন্য তো নয়। দুঃখের জন্যও নয়। সুখ-দুঃখের অতীত এ যেন অন্য জিনিশ, এক হিরন্ময় জ্যোতি, যে অচেনা, যার পরিচয় সে জানে না।

নইলে সুখকে তো একজন মানুষ অতিক্রম করতে পারে এবং দুঃখকেও করতে পারে জয় ; কিন্তু তার হৃদয়ের যে আলোড়ন তাকে আয়ত্ত করবে কি দিয়ে? এ সময় একটু নড়েচড়ে সোজা হয় মুক্তিযোদ্ধা মোজাহার ঃ সাঙাতরা যাকে বলে মোজা কিন্তু যার নামের সংক্ষিপ্ত ভদ্ররূপ 'মোজো'টাই বেশি চলতি। আকাশে খণ্ড চাঁদ ও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কিছু তারার নিচে গ্রীষ্মের মেঘনা, এখন রাতে ফুরফুরে হাওয়ায় থইথই করছে। কিছু দূরে, ওপারে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে জিয়া সার কারখানার বিচিত্র আলোকমালা এবং তারপরে সুউচ্চ সাইলো

ও বিশাল মেঘনা ব্রিজের গার্ডার। ওদিকে তাকালেই স্মৃতির জোয়ার, যেন ওথলে ওঠে একেকবার। একাত্তরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর, পুরো নয়মাস, এই অঞ্চল জুড়েই ছিল ওদের সমস্ত কার্যকলাপ। আশুগঞ্জ ক্যাম্প থেকে আক্রমণ আসন্ন হলে, মাঝে মাঝে পিছিয়েছে। কাঁধে অস্ত্র ফেলে চলে গেছে লক্ষ্মীপুর হোসেন নগরের দিকে, গহীন গ্রামীণ ঘুপচিতে কিন্তু এই পশ্চাদপসারণ ছিল কৌশলমাত্র।

হ্যাঁ, রণকৌশলে যুদ্ধের জয়পরাজয়ের অনেকটাই রাঁধা, কিন্তু হৃদয়টা যেখানে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বলছে, কি কৌশলে তাকে জয় করা যাবে? না, না। সম্ভব নয়, সম্ভব নয়।

পবিত্র সমাধি। দুই শহীদ বন্ধুর কবর গ্রামবাসীরা বাঁধিয়ে রেখেছে, তার পাশেই মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিল ঃ একটু আগে মাটি খুঁড়ে তুলে এনেছে ছোট গ্রেনেডের বাক্সটা। সুরক্ষিত ছিল, এখনো তাজাই আছে, নিশ্চয়ই ছয়টা আছে মওজুদ, কিন্তু ওদেরকে উড়িয়ে দিতে দুটোর বেশি লাগবে না।

এ সময় আধো-অন্ধকারে মোজাহারের চেহারাটা কেমন বিদঘুটে হয়ে ওঠে, বিভ্রান্ত চাউনি, সাবধানে খণ্ড খণ্ড অস্ত্রগুলো হাতড়াতে হাত কাঁপে মৃদু থরথর করে। না, কিসের ডর? দারুণ প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, এখনো স্পষ্টই মনে আছে কায়দা-কানুন।

ওইতো দেখা যাচ্ছে, বিয়ে বাড়ির উজ্জ্বল হ্যাজাক বাতির আলো, এমন দূরত্বে লোকজনের কিছু হৈ চৈ শব্দও শোনা যাচ্ছে।

বিয়ে পড়ানো হয়ে গেছে, মেহমানদের খাওয়ানো শুরু হয়েছে মনে হয়। এখন নয়, এখন নয়। উৎসব শেষে জামাইকে যখন অন্দরমহলে নিয়ে যাবে এবং শুভদৃষ্টির জন্য, বসাবে পাশাপাশি, তখনই উপযুক্ত সময়। অবশ্য অভিনয় কিছু লাগবে, কিন্তু সে আর কি কঠিন ব্যাপার? কিশোর কাল থেকেই তো প্রতি বছর নাটক করা অভ্যাস। ভিতরে বিষাক্ত আক্রোশ, বাইরে সুপ্রতিবেশীর সানন্দ চেহারা, এই তো। কোণাকুণিভাবে কিছু দূরেই দাঁড়াবে, দেখবে বরকে নিয়ে এসেছে, আর বসে আছে ঘোমটা টানা জেওরে কাপড়ে বিজড়িত বসন্তের গোলাপ ঝোপের মতো রুবি—

না, না রুবি। ইমুন কতা কইয়ো না। তুমি আমার কাছে কি অপরাধ করছ যে মাফ চাও? এই তো, সেদিন ছিল চৈত্রের আঠারো তারিখ, শুক্রবার, মোজাহার তাদের বেড়ার ঘরের চৌকিতে বসেই কথা বলছিল, রুবি ঝাঁপের আড়াল থেকে এদিকে কাছাকাছি এসেছিল, সঙ্গে মনোয়ারা।

অনেক বেয়াদবি করছি তো, আপনেও জানেন মোজাভাই। মৃদু হেসে তার মুখে তাকায়, তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, মাইন্ষের আয়াত আর কয়দিনের, আর জুদি দেহা না অয়!

তখনো কিছু বুঝতে না পেরে মোজাহার বোকার মত তাকালে তার ছোটবোন মনোয়ারা হেসে উঠল, এবং বলল, ভাইজান, কিছু বুঝতে পারতাছ না? আমার সইয়ের বিয়া! দোসরা বৈশাখ!

এ্যাঁ? হাচাই? হাচা কইতাছস?

হ, হাচাই তো। তুলাতুলির জাহের চৌধুরীর ছেলে, ঢাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তারে বিলাৎ পাডাইব। ওরাও এক লাখ এক টেহার মোহরানা আর কত অলংকার দিব। ও হ্যাঁ, পনেরো ভরি সোনা! ওহ্ কি মজা! আরও কি বলতে যাচ্ছিল মনোয়ারা, রুবি মাথায় কাপড় টেনে চোখের ইশারা করলে থেমে গেল।

দুই চোখ অন্ধকার হয়ে আসছিল, মাথাটা ঘুরছিল, মোজাহার ক্রাচটা ছেড়ে দিল। সেটা সশব্দে নিচে পড়ে যায়। তার মনে হয়, এ সময় মাথার উপরে সরাসরি বজ্রপাত হলে

মন্দ ছিলো না। নিমেষে ঝলসে যেত, কুঁকড়ে যেত। পিছনে হাত ভর করে সে স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ওরা দু'জনও চুপ। যেন উপলব্ধি করে কোথাও কিছু আছে, অন্যরকম।

আরও কিছু আলাপ হয়েছিল কি না মনে নেই, আস্তে আস্তে ওরা চলে গেল। মোজাহার উঠলো না। সে চৌকির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। এটা তারই বিছানা। তবু এমন সময়ে সাধারণত ঘরেই থাকে না। এখানে আসে শুধু রাতের বেলায, ঘুমের আমেজ যখন নামতে থাকে চোখের পাতা ঘিরে।

সমস্ত কথা শুনতে, সব বিষয় জানতে দু'দিনের বেশি সময় লাগলো না। পাশেই খাঁ বাড়ি। এই আসল মুশকিল। বাপজানের দেড়কানি জমি ছিল মাত্র, ওদের কামলাও খেটেছে। তবু যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল তা'কি কিছু অন্যরকম ছিলো না? অবশ্য আমজাদ আলী খান চালাক আদমী এবং রাবেয়া খানম, তার একমাত্র কন্যা। খুবই আদরের, যেন দু'চোখের মণি। সেজন্য মেয়ের চলাফেরায় কিংবা যে কোনো আবদারে বাধা দিতেন না। একাত্তরে মাত্র ওর তিন বছর বয়স এবং তার তেরো বছর। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু সেই তো গ্রামবাসীকে মাতিয়ে রেখেছিল। ছাব্বিশ তারিখে গঠন করেছিল স্বেচ্ছাসেবক দল। ঘরে ঘরে দুর্ঘ নির্দেশটা মনে ছিল। গ্রামের তিনটে পাড়ায় অন্তত প্রধান শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এটা প্রাথমিক। তারপর লড়াই শিখতে ওপারে চলে যায়। ফিরে আসার পরও কিছুকাল গ্রাম আক্রান্ত হয়নি কিন্তু বর্ষার পানি যখন বাড়তে লাগল তখন থেকে বিপদ আসছিল।

একদিন রাতে ব্লক দেবে জনরব উঠে গেলে খাঁ-বাড়িও পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার জন্য তৈরি। পাশের বাড়ির ছেলে মোতাহার , মুক্তির একজন। সে সঙ্গে গেল। সকাল সাড়ে দশটায় রওয়ানা দিয়েছিল, পিরিজকান্দির রাস্তা দিয়ে গকুলনগর। মনে পড়ে শিশু রুবিকে সে কোলে নিয়ে চলেছিল কয়েকবার। যুদ্ধের পর সতেরো বছর গেছে, এখন তো অপর দুনিয়া।

খাঁ বাড়ির মেয়ে রাবেয়া খানম ওরফে রুবি এখন অষ্টাদশী, সুন্দরী যুবতী ঃ সঙ্গে বাপের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং ধনদৌলত।

আপন বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে এসে এদিকেই বেশি থাকত রুবি, ছোটবেলা থেকেই মনুর সঙ্গে সারাক্ষণ। নিজেই সই পাতিয়েছিল।

তখন থেকেই গভীর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কতবার হাত ধরে টেনে কোলে নিত। গালে চমু খেত। আদর করত। পরবের ময় লাল-নীল ফিতে কিনে এনেছে দু'জনেরই জন্য, এনেছে আহলাদী পুতুল।

যদি ও মাত্র জুনিয়র বিদ্যালয় পাস, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হল। দেশের জন্য যুদ্ধে পা হারিয়েছে। এটা ছিল তার গ্রামবাসীদেরই বিশেষ বিবেচনা। এছাড়াও, লেখাপড়া করত। যতবার ঢাকায় যায়, বই কেনে। মুক্তিযুদ্ধের যে ক'টি বই বেরিয়েছে, সংগ্রহ করেছে। চৌকির কাছে টেবিল তার ওপর সাজানো। আরও রয়েছে পত্র পত্রিকা, সাপ্তাহিকী। এই গ্রামে একমাত্র দৈনিক কাগজটি ডাকযোগে তার কাছে আসে। কয়েকটি প্রাইভেট টিউশনি আছে।

এমনিতেই রুবিও আসে পড়া দেখাতে, বাংরা, ইংরেজী ও সমাজ বিজ্ঞান। নিজের সমস্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা উজাড় করে দিত।

অত্যন্ত মায়াভরা চেহারা রুবির, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কাটা কাটা চোখমুখ। প্রধান বৈশিষ্ট্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কাছে না থাকলে ওর কথাগুলো কানের কাছে গুঞ্জনের মতো ফেরে। রুবিকে কি সে ভালোবেসে ফেলেছে?

অনেক নিভৃতে কিংবা চিৎ হয়ে শুয়ে বই পড়তে পড়তে প্রশ্ন করেছে নিজেকে ঃ ভালোবাসা! হা হা হা হা, এতো অসম্ভব!

আশ্চর্য, একদিন বিকেলে রুবির কি হয়েছিল রুবি নিজেও হয়তো জানতো না। সেদিন মেঘলা আকাশ ছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া। চাদর গায়ে দুপুরের নিদ্রা শেষে শুয়েই ছিল মোজাহার, কাছাকাছি তেপায়ায় বসেছে রুবি বই খুলে। একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে মোজাহারের মাথায়। একটু হাসল। তারপর রুবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, জানো রুবি?

কি? রুবি মুখ তুলে তাকায়।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার!

কি অদ্ভুত! জলদি কন্।

একটু আগে একটা খোয়াব দেখলাম!

কি খোয়াব!

দেখলাম—একটু থেমে বলল মোজাহার, একটা এলেমজির ব্রাশ ফায়ার আমার বুকটারে ঝাঁজরা কইরা দিল। আমি মইরা গেছি।

আপনে মইরা গেলে—কিছু না ভেবেই, সহজভাবেই যেন বলল রুবি, আমিও মইরা যাইয়াম!

একটা শেষ করে আরেকটা ধরিয়েছিল, সেটা ঘন ঘন টানতে লাগল। ওপরে ধোঁয়া ছাড়ছে।

ওইটুকু কথা হয়তো ছিল ক্ষণিকের আবেগ, কিন্তু আরও গুরুতর কথাও তো বলেছিল রুবি একদিন সন্ধ্যায়।

হালকা হাসি ঠাট্টার ছলেই আলাপ চলছিল, একটু হেসেই বলছিল মোজাহার—আমি তো একটা দুর্ভাগা। শত্রুর গুলী খাইয়াও মরলাম না। এইভাবেই জীবনডা কাডাইয়া দিমু। আমার তো কোনো ভবিষ্যৎ নাই।

কেডা কইছে, নাই?

না রুবি, হাচাই নাই। আমার পা নাই, আমি পঙ্গু। আমারে কেডা দেখবো, কেডা দেখবো!

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুবি চট্ করে বলল, আমি আপনেরে দেহুম! হ্যাঁ, আমি। বিশ্বাস অয় না?

রুবি? কেমন কইরা বিশ্বাস করুম, রুবি! পৃথিবীডা অন্য রহম। অহন তো তবু আও, কিছুদিন পর আমার কাছে তো তুমি আইতা পারবা না।

বাজানের কতা কইতাছেন? রুবি হাসল, তারপর বলল, টেহা পইসা সম্পত্তির বিষয়ে উনি খারাপ কিন্তুক আমার বিষয়ে খুব ভালা।

কিন্তু উনি রাজি অইবেন না, এইড্যা তো সইত্য।

না অইলে আপনেরে লইয়া আমি পলাইয়া যামু গা!

কও কি রুবি!

হ্যাঁ, সত্যই কইতাছি!

হ্যাঁ, সত্যই তো। সত্যই পালিয়ে যাবে রুবি। তবে তার সঙ্গে নয়, অন্য লোকের সঙ্গে অন্য কোথাও। যেদিন প্রথম জানতে পারে অস্থির যন্ত্রণায় বিছানায় গড়াগড়ি দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ঝট্ করে উঠে পড়েছিল। ভুখ লেগেছিল তবু এক গেলাস পানিও খেল না। বেড়ায় ঠেকিয়ে রাখা ক্রাচদু'জোড়া টেনে নিল এবং বাইরের কামারাঙাতলা থেকে মা ও ছোটবোন দেখার আগেই পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

যন্ত্রণাকাতর মুখ, হাঁটতে হাঁটতে দুই বন্ধুর বাঁধানো কবরের কাছে এল আমগাছতলায়।

আতাহার-মোতাহার তোরা যইয়া পেছন-কবরের পাকায় মাথাটা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে তোরাই ভাগ্যবান। আমি অহন বাঁইচ্যা থাহুম কিয়ের লাইগ্যা। তোরা কইয়া দে। আমারে পথ দেহা। আমি পঙ্গু তাই বইল্যা কি আমি ভিখারীর জীবন যাপন করুম?

তুই মুক্তিযোদ্ধা। তাজ্জব, মোজাহার শুনছে, হ্যাঁ শুনছে মাটির ভিতর থেকে গম্‌গম্ কথা আসছে, মুক্তিযোদ্ধার মতই বাঁইচ্যা থাক্।

না না। সেই একলা বিজন জায়গায় চিৎকার করে ওঠে মোজাহার, অন্যকিছু ক। অন্যকিছু!

তার চিৎকার বনাঞ্চলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। অন্য কেউ শুনলো না।

আলগীর হাটবার ছিল সেদিন ; বেভুলের মতো ক্রাচ ভরে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে শত শত লোকের ভিড়ে চলে এসেছিল।

এক জায়গায় ভিখারীদের দল। সারি সারি বসেছে। টুপি, ছেঁড়া কাপড়। হাত-বাড়িয়ে পয়সা নেয়, টাকা চাইছে এবং শরীর ঝাঁকিয়ে উচ্চৈস্বরে একত্রে দরুদ পড়ছে, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রসুল সালাম আলাইকা--একটু দয়া করেন হুজুর—রহম করেন। যে যেমন পারেন সাহায্য করেন। বেহেশত হাসিল করেন। যে আল্লাহ্ হে বারে খোদা—তোমার বান্দা তোমার মহব্বতে তোমার মিছকিন রে—

প্রায় এক মাইল পথ ছিল, বেজায় ক্লান্ত ঃ ফকিরদের কাছাকাছি গাছটায় গোড়ায় এসে বসে পড়ল। পাশাপাশি, মাটির উপরে রাখে ক্রাচ জোড়া, একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। লোকজন বাজার করছে, এদিক দিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হওয়ার সামান্য বাকী। তেরছা হয়ে এসে পড়েছে ঘরবাড়ির আড়াল থেকে রঙিন আলোকমালা।

পিছন ফিরে বসেছিল মোজাহার, তার মুখে আবছায়া। তিনজন লোক ভাবলো ভিখারী। তারা কিছু কাঁচা পয়সা ও এক টাকার একটা নোট ছুঁড়ে মারল তার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট গোঙানির মত একটা শব্দ বেরিয়ে আসতে চাইল তার গলার ভিতর থেকে ; কিন্তু গলাটা যেনবন্ধ হয়ে আছে। একটা অস্থিরতায় সে কাঁপতে লাগল। এখান থেকে উঠে পড়তে চায়, কিন্তু উঠতে পারলো না। এদিক দিয়ে আরও লোক আসে। আরও আরও। আরও কিছু টাকা-পয়সা পড়ল।

এমন সময় ছোট করে ছাঁটা চুল কালো একটি ছেলে এগিয়ে এল, মনে হল ছাত্র, ওর কাঁধের কাছে দাঁড়াল।

সে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, এ আপনেরা কি করতাছেন। ইনি ফকির না, ফকির না। মিছকিন না, মিছকিন না। উনি ভিখারী না। এই যে মুখটা দেখুন তার মুখটা দেখুন। উনি মোজাহার আলী, এলাকার বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা।

ও মুক্তিযোদ্ধা! লোকগুলো খল্‌খল্ করে হেসে উঠল, তারপর তার সামনে ছড়ানো টাকা-পয়সা খাবলা দিয়ে দিয়ে কিছু তুলে নিয়ে চলে গেল। প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল। ভেবেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। চিৎকার ক'রে জানায় প্রতিবাদ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, কি লাভ। তার অবস্থা তো ভিখারীর চাইতে উন্নত কিছু নয়। তিনজনের সংসার, তবু চলে না। বাপের জমিটুকুন কয়েকবারে বেচে ফেলতে হয়েছে এবং এখন আছে শুধু ভিটেটুকুন আর ওই বাঁশের ঘর। মা'র শরীর ভালো যায় না, মনোয়ারার বিয়ে-শাদী দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় ভাতা যা পায়, তার সঙ্গে মিলায় সামান্য বেতন ও টিউশনির টাকা। বেশ কষ্টেই চলছে। জামাকাপড় প্রায় ছেঁড়া, খাদ্য বড়জোর ডালভাত। তাও একবেলা। অন্যবেলা রুটি।

আজ দুপুরেই ঘটে চাল ছিলো না। মনোয়ারা বোধহয়, পাশের বাড়ি থেকে আধা সের কর্জ করে এনেছিল। ফিরে যাচ্ছিল যখন, মনে পড়তেই তোতা মিঞার দোকানের সামনে দাঁড়াল। বেশ ব্যস্ত, তবু দেখতে পাওয়ামাত্র তোতা কথা বলল, কি, মোজাম্মেল কিমুন আছ? আজকাল বেশি দেহি টেহি না। অহন কিছু লাগবো নিহি?

একটু এগিয়ে যায় মোজাম্মেল, ক্রাচ ভর করে দাঁড়িয়ে কাঁচুমাচু করে বলল, জানি তোতা তোমার একশ টেহার বেশি পাওনা অইয়া গেছে। জানো? আমি চিঠি পাইছি। স্বাধীনতা দিবসে আমাগো ভাতা বাড়বো। নতুন রেটে উৎসব ভাতাও নাকি পাইয়াম, তার ওপর চিকিৎসা ভাতা। আগামী মাসেই।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। একদিকে চায়ের ছোট স্টল, সেদিকে আদেশ করে, ওরে আবুইল্যা, মাস্টার মিঞারে এক কাপ চা দে, আরেকটা কুকিস বিস্কুট! তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল আবুল, তারপর মুখ চোখা করে বলল, টুলে বহেন। চা তো দিমু, কিন্তু কোনদিন পয়সা আপনে দেন না।

পয়সা দিব কিরে! পেয়ালা ধুইছিল যে সঙ্গী ছেলেটি বলল, মোজা চাচা মুক্তিযোদ্ধা না?

হুঁ, ঠিক কইছস। সর্বহারারা ত রাতের আন্দাইরে দল বাইন্ধ্যা আছে, ডাইক্যা নিয়া গলা কাডে। আমরার মুক্তিযোদ্ধা গো খাতির করা উচিত।

ওদের কথাবার্তায় এমন একটা ভাব, ইচ্ছে হচ্ছিল থাপ্পর মারে, কিন্তু কিছুই করলো না। চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিলে চুপচাপ খেল। আড়াই সের চাল মাপিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে।

হ্যাঁ, এটাই বোধ হয় সত্য। প্রতিবেশী, খাঁ বাড়ির মেয়ে রুবি যদি তাকে ভালোও বেসে থাকে, এমনকি কথাও দিয়ে থাকে তবু ওকে সহধর্মিনী হিসেবে আশা করা, বইয়ে থাকে বলে আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। কিন্তু এটা কেমন? রুবি যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে, নিঃশব্দে পিছনে সরে গেল কেন। অভিভাবকরা হয়তো বুঝিয়েছেন। কিন্তু সে তো সহজে পোষ মানবার মতো নয়। তবে তরুণ, সুপুরুষ স্বামী? স্বামীর উচ্চশিক্ষার জন্য টাকা-পয়সা দিয়ে নিজেরও বিদেশ যাওয়ার লোভ? শুনেছিল, স্ত্রীর্যাশ্চরিত্রম দেব ন জানন্তি, হ্যাঁ এখন এটাই তো ঠিক মনে হচ্ছে। কি নির্বিকারভাবেই না মাফ চেয়ে চলে গেল। এগিয়ে গিয়ে সে তো প্রথম প্রেমনিবেদন করেনি? রুবিই এগিয়ে এসেছিল। হাতে ধরেছিল। সুতরাং রুবি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। এটা স্রেফ, নির্জলা বিশ্বাসঘাতকতা।

এর একমাত্র শাস্তি, মৃত্যু। রুবিকে সে হত্যা করবে, একমাত্র রুবিকেই হত্যা করবে একজন মুক্তিযোদ্ধার মতো তারপর হয়তো নিজেও করবে আত্মহত্যা।

হঠাৎ রক্তের মধ্যে যেন শিহরণ জাগে, চোখজোড়া শ্বাপদের মতো ধক্‌ধক্ করে জ্বলতে লাগল।

কম্পিত হাতে ক্রাচজোড়া টেনে নেয়, তারপর বগলের মধ্যে চেপে উঠে দাঁড়াল। ছোট বাক্স থেকে দুটো গ্রেনেড আগেই পকেটে ভরে নিয়েছে। ওইদিকে বিয়ে বাড়ি, আরও হৈ চৈ গোলমাল। একমাত্র মেয়ের শুভ বিবাহ। গ্রামের সবাইকে দাওয়াত করেছেন খান সাহেব এবং আশপাশের বহু সম্মানিত লোকদেরও। শহর থেকে এসেছে বরের বন্ধু-বান্ধব। আলো ঝলমল বিয়েরবাড়ির এলাকা। গাছের নিচ থেকে একপা দু'পা করে এগিয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দেখছে। আঁচ করে নিতে চাইছে অবস্থাটা, এইসঙ্গে ভাবছে, একটা জলজ্যান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নিশ্চয়ই বেআইনী হবে না।

এমন সময় একেবারে সামনেই একদল লোক, যেন হুড়মুড় করেই এসে পড়ল। লুঙিপরা, গামছাপরা, প্রায় সবারই খালি গতর। স্বাস্থ্য ভালো নয়, রোদে পোড়া, ভামাটে

চেহারা। কাউকে কাউকে চিনল, চরের কৃষক।

ওই তো মোজাভাই, আমি কইছিলাম না গাঙের পারে বট গাছতলায় থাকতে পারে!

কি ব্যাপার! তোমরা এহানে কেন। অস্থিরভাবে একটু এগিয়ে যায় মোজাহার। জিজ্ঞেস করল, কি অইছে?

সর্বনাশ অইছে মোজাভাই, সর্বনাশ।

কি সর্বনাশ, কও জলদি।

এদিকে তো বিয়াশাদি হৈ চৈ আনন্দ উৎসব, ওইদিকে খান সাহেবের লোকজন লাঠিয়াল গুণ্ডারা তৈয়ার, ওই চর আক্রমণ করবো। আমাগো সব বাড়ি-ঘর আগুন লাগাইয়া দিব। প্রায় হাতজোড় করে বলতে থাকে মেঘার বাপ, আমাগো জমিভাঙা চরে আমরা বাড়ি—ঘর বানাইছি, গিরস্তি সাজাইছি অথচ খাঁ সাহেব নাহি বন্দোবস্ত নিয়া আইছেন। আমাগো উৎখাত করবেন। আমাগো বাঁচাও মোজাভাই? এতো সব অবিচার, এত বড় অন্যায়, জুলুম! তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কইরা দেশ স্বাধীন করছ, তুমিই আমাগো বাঁচাইতে পারবা।

শুনতে শুনতে হঠাৎ পাথরের মত জমাট বেঁধে গেল, তারপর ধীরে ধীরে ভিতরে যেন বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে অবিরাম তার আশ্চর্য রূপান্তর ঘটতে লাগল। যে পাটা হারিয়েছিল, সেটা যেন বলিষ্ঠভাবে গজিয়ে গেছে, মাটিতে স্পর্শ করেছে। দু'পকেটে দু'টো মারাত্মক গ্রেনেড। হাতের ক্রাচ রিকয়েললেস রাইফেলের মতো দুলতে লাগল। দূরে নদীর ওপারে অগ্রসরমান শত্রু জাহাজ দেখে যেমন করে একদিন নদী পাড়ে গাছের আড়ালে পজিশন নিয়েছিল, এখন তেমনিভাবে দাঁড়িয়েছে। সমবেত জনতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোজাহার উচ্চারণ করল, ঠিক আছে। তোমরা আমার লগে লড়াই করতে পারবা তো?

পারবো, পারবো। ওরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল।

তাইলে চলো ওপারে, দেরি করার সময় নাই। এখনো ক্রাচ ভর করেই যাচ্ছে, কিন্তু যাচ্ছে আরও দ্রুত। ওপারের কৃষকরা যাচ্ছে দল বেঁধে আগে আগে। ওদিকে ডিঙিগুলো ভেড়ানো ছিল। ওরা গিয়ে উঠল। হাতে হাতে বৈঠা। আধো অন্দকার চলতে লাগল, মেঘনার পানিতে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ। ওপারে প্রায় একমাইল এলাকা জুড়ে চরের ঘর-বাড়ি শস্যক্ষেত। আগেই খবর পেয়েছিল, অনেক লোকজন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, কোথাও সারি সারি, কোথাও জোটবাঁধা।

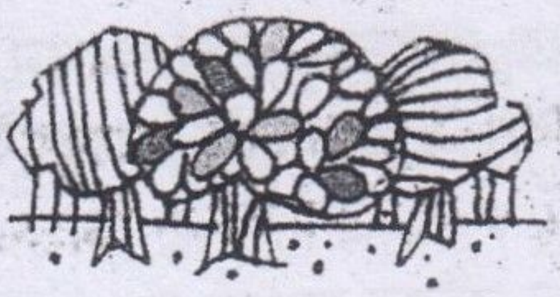
ওরা ওপরে গিয়ে পৌঁছলে প্রথমে ভিড় জমালো চতুর্দিকে সবাই এসে, কিন্তু কিছুক্ষণেই চলে গেল যে যার জায়গায়। মোজাহার নির্দেশ দিয়েছে। ওপারে মেঘনার বিস্তীর্ণ পাড় জুড়ে সারি সারি মশাল জ্বলতে লাগল।

একটি মশাল শক্ত হাতে ধরে আছে, একজন তরুণ কৃষক তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

মুক্তিযোদ্ধা মোজাহারও দাঁড়িয়ে, যেন ব্যূহের সম্মুখভাগে সেনাপতি তার ডানহাতে ধরা গ্রেনেড। সে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওপারের দিকে যেখানে গাছপালা ছাড়িয়ে গ্রামের একটি বড় বাড়ির প্রাঙ্গণ জুড়ে জ্বলছে আলোকমালা। সেখান থেকে ছোঁড়া একটি আতশবাজি আকাশের অনেক উঁচুতে সুই করে উঠে লাল-নীল ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ঘাড় উঁচু করে ওটা তাকিয়ে দেখল মোজাহার, চোখের কোণে চিক্‌চিক্ অশ্রুবিন্দু ; এবং ফিস্‌ফিস্ করে প্রায় অস্পষ্ট, গুঞ্জনধ্বনির মত উচ্চারণ করল, রুবি! রুবি! তুমি সুখী হও।

এপ্রিল, ১৯৮৮।



জলোচ্ছ্বাস

অবিরাম, একটানা। ঝরঝর ঝম্‌ঝম্‌। আবার, আবার। এমন ভয়ঙ্কর একটা তছনছ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও একটা মাসও গেল না আজ রাত বারোটার পর থেকে আবার শুরু হয়েছে অঝোর বর্ষণ। আসমান জোড়া কালোমেঘ। গুড় গুড় গর্জন। একটু পর পর বিজলি চমকও দেখা যায়। জানালার কাচ খোলা ছিল, পর্দাগুলো একবার বাতাসের ঠেলা খেয়ে ভিতরে আসছে, আবার গিয়ে লাগছে কি আসছে আবার কে জানে, চারদিকে তো কেবল গজব। এইতো, সেদিন।

সোমবার, পনেরোই বৈশাখ, ঊনতিরিশে এপ্রিল।

সাতটা তিরিশ মিনিটে খাওয়া ও দশটা তিরিশ মিনিটের মধ্যে বিছানায় যাওয়া এটা অনেক বছরের অভ্যাস।

এই তো, দোতলার দক্ষিণ উয়িং জুড়ে সুসজ্জিত মাস্টার বেডরুম, বেশ বড়সড়, ইচ্ছে করলে দৌড়ানো যায়।

তিনদিকে তিনটা এয়ারকুলার লাগানো, যদিও একটার বেশি কখনো ছাড়েন না। এক শ্রেণীর লোক আড়াল আবডালে তাকে যে বলে জিএমটিটি এটা একেবারে মিথ্যে নয়।

জাতে মাতাল তালে ঠিক, বাইরে বেশ খোলামেলা প্রায় মহাপুরুষ, কিন্তু ভিতরে অন্যরকম, পান থেকে চুনটুকু খসতে দেন না। তিনিও জানেন এই বদনাম। গায়ে মাখেন না। আসলে টিপ্পনীকারীরা যদি বুঝত তিনি কিরপিন নন, হিসেবী, তাহলে কোনো অসুবিধে থাকতো না। হিসেব মানে পরিকল্পনা। পরিকল্পনা ছাড়া দুনিয়াতে কী হয়? এটা হয়তো পুরাতন বিদ্যা, তবু ছাড়তে পারেন না।

সেগুন কাঠের তৈরি বিশাল ডবল খাট, ফ্রেম পায়া বেশ মোটা ও শক্ত, জমিদারী পালঙ্কের মতো, কিন্তু কারুকার্যহীন। পুরাতন জিনিশের প্রতি মোহ তার অত্যধিক, এটা আরেকটা প্রমাণ।

যেমন স্ত্রী। রায়হানা খন্দকার, চিররুগ্না। হাঁপানি আছে, মাঝে মাঝে কথাও বলতে পারেন না ; তবু আদর করে, ভালোবেসে তাকেই ধরে আছেন। প্রথম সন্তান হওয়ার পরই ইউটেরাস কেটে ফেলে দিতে হয়েছিল, অগাধ সম্পত্তি, ইচ্ছে করলে আরেকটা বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু, এমনকি বৌয়ের অনুরোধ সত্ত্বেও করেননি। অনেকের তো এক সন্তানও থাকে না, আল্লাহ্‌ একটা দিয়েছেন তাতেই সবুর। আসলেই এমনি ভাবতেন। অথচ এই আত্মত্যাগের মূল্য পাওয়া গেল না। এখন তো চরম।

এখন নেটের মশারির ভিতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। অঘোরে ঘুমাচ্ছেন আবু আহমদ খন্দকার। অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারা যেন গভীরতা এনেছে, চৈতন্যের অতলে তলিয়ে গেছেন। গোলগাল চেহারা, মাথায় চকচকে টাক। পেটের দিকটা মোটা, কিন্তু বেশ ফর্সা। ভালো পোশাক পরলে সুপুরুষ মনে হয় এবং মনেই হয় না বয়স বাহান্ন। বরং বিয়াল্লিশের মতো লাগে। ক্লাব পাগল ব্যক্তি, হাসিখুশি থাকতেন। চিটাগাং ক্লাবের সচিব হয়েছেন দু'বার এবং একবার সভাপতি। এখন সবশেষ।

চিটাগাং ক্লাব, ভাবতেন ধরাতলে স্বর্গরাজ্য, যেখানে দু'তিনবার এবং সন্ধ্যার সময় অবশ্যই, না গেলে পেটের ভাত হজম হতো না, এখন সেখানে যান না। ঘরেই বসে

থাকেন। একলা একলা চুরুট টানেন, গিন্নি দূরে থাকলে ক্রিস্টালের গেলাসও বার করেন। মাঝে মাঝে হাউমাউ করে ওঠেন, তাও একা। নসিব, নসিব। হায় এরই নাম কি ললাটলেখন?

একটি মাত্র ছেলে, একমাত্র সন্তান। প্রসবের সময় ওর মা'য়ের জীবন সংশয় হয়েছিল, সেজন্যই মা'য়ের নামে নাম রেখেছিলেন আবু রায়হান খন্দকার। ডাক নাম, ক্লাবের সবার সেরা বন্ধু মঞ্জুর সাহেব রেখেছিলেন, লিও। লিও মানে নাকি সিংহ। ছেলে ভবিষ্যতে সিংহপুরুষ হবে, এটাই ছিল কাম্য। একেবারে যে কিছু হোত না তাও নয়। কিন্তু হায়, সবশেষে একটিমাত্র ছেলে একমাত্র সন্তান ঊনত্রিশে এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস তাকে এক ছোবলে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকার সমুদ্রতলে, চিরকালের মতো। কত ছুটোছুটি, কত খোঁজাখুঁজি। কয়েকজন এসে খবর দিয়েছিল পতেঙ্গার সৈকতে ভিড়েছে। চকোরিয়া থেকে পতেঙ্গা, কিভাবে সম্ভব? কিন্তু সাগরতরঙ্গের খেয়াল—খুশি কখনো বোঝা যায় না। জীপে করে হাই স্পীডে গিয়েছিলেন। সে সাইক্লোনের তিনদিন পর, লাশ ফুলে উঠেছে। অনেকটা ওরই মতো যদিও ঘড়ি আংটি চশমা ছিলো না, কিন্তু মন মানলো না। সে হারিয়ে গেছে, সেই ভালো।

দুঃখ, দুঃখ। দুঃখ কাকে বলে? কাকে বলে ব্যথা? বেদনা, যন্ত্রণা? সব একস্রোত, সব একাকার। বসে থাকলে মাথাটা কেবল দোলে হাওয়ায়।

যেদিন খবর পেয়েছিলেন সেদিন থেকে ঘুম হারাম এবং এখনো তাই, শুধু একটু ব্যতিক্রম অন্যরাতে খাটের প্রান্তে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকেন, আজ স্বামীর কাছাকাছি এও খেয়াল বৈ কিছু নয়। জোয়ানকালের একটু রেশ মিছে আছে, হয়তো এইটুকু।

ঘুমের ঘোরেই আবু আহমদ কোলবালিশটা টেনে নিলেন, সেটাকে কাউরি দিয়ে ধরলেন—আসলে রায়হানা।

রায়হানা আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন এমন সময় একটা চিৎকার, কেয়ামত! কেয়ামত!

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন আবু আহমদ, রায়হানা ভাবলেন উনি জেগেছেন—কিন্তু না, পরক্ষণেই তার মাথাটা ঝপ্ করে বালিশে পড়ে গেল। তিনি আর শব্দ করলেন না। এবারে, অচেতন অভ্যাসমতো আসল কোল বালিশটাই জড়িয়ে ছিলেন।

বিছানা থেকে নিচে নামলেন রায়হানা, একটা জানালার কাছে গেলেন। আশ্চর্য, বৃষ্টিধারা শাদা পর্দার মতো আসমান থেকে ঝুলছে।

আরিক্কিনি হন খালামা আরিক্কিনি হন নইলি বাঁচিবেন কেন গরি। এতবড় সংসার ত টিকাই নাহন পরিবো। ভাইউরে আল্লাহ লই গেয়িগুই, ইবা জোয়ান আছিল ত হনকিয়ার নিক্কা চখ ন লাগাইতো, বড় গম আছিল—আরে হত ভালবাইস তো, আপন বড় বইনুর মত আইনতো—গত ঈদের সমত হত উগ্যা হোত্বা দিয়িলি।

দূর হ হারামজাদী, দুর হ! জানালার পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে এদিকে তাকালেন, কিন্তু দরোজা বন্ধ এবং মেঝের দিকে একটু ছায়াও ছিলো না, বুঝলেন মনোবিকার তবু বিড়বিড় করলেন, আমাকে আর জ্বালাসনে। কিছুতেই মরণ যখন হচ্চে না, আমি না খেয়েই মরবো।

আচ্ছা মুশকিল। লেংড়ির মা আয়েশা খাতুন বান্দী, বান্দী। একদম নাছোড়বান্দী। সে খাওয়াবেই, না খাইয়ে ছাড়বে না। ভাত না হলে রুটি। রুটি না হলে পাউরুটি, না হলে গরম দুধ। তাও না হলে, হরলিক্স। কলার ফানা, আপেল, কমলালেবু, আরও কত ফলে মিটসেফ ভরতি। থাক, ওসব থাক।

আবার জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরাতেই চক্ষুস্থির। হায়, হায়। একি অদ্ভুত। অঝোর বৃষ্টি ধারার শাদা পর্দা, তার উপরে সোনার থালির মতো পূর্ণিমার চাঁদ। তার থেকে একটা সিঁড়ি নামতে লাগল। এবং নেমে এসে লাগল যেন এখানেই করিডোর বারান্দায়। সেই সিঁড়ি বেয়ে জ্যাকেটের দু'প্রান্ত উড়িয়ে সানগ্লাস চোখে হাসতে হাসতে নেমে আসছে লিও, প্রাণাধিক পুত্র, শত জনমের সাধনার ধন।

মুহূর্তে রায়হানা দিশেহারা, কি করবেন, বুঝতে পারছেন না। এদিকে এসে এক ঝটকায় মশারির খানিকটা তুলে স্বামীর দু'পা ধরে প্রাণপণে টান দিলেন। আচমকা ঘুম ভাঙল বোধ হয় আবু আহমদের, তার গলা থেকে আর্তধ্বনি বেরুতে লাগল, আ-আ-আ। আমাকে ছাড়ো। আমাকে ছাড়ো কেয়ামত। আমাকে ছেড়ে দাও।

এরপর বাইরে তেমনি বৃষ্টি ধারা, আর মশারির ভিতরে বসে দুইজন, পরস্পর জড়িয়ে যা স্বাভাবিক নয় যেন দৈবী ঘটনা। কারণ, বহুকাল একে অন্যকে ধরেন না, ছুঁয়েও দেখেন না। কেয়ামত, কেয়ামত। হ্যাঁ কেয়ামত। সেদিন রাতে আসল কেয়ামতই নেমে এসেছিল চারদিকটাকে ঘোর তমসায় আচ্ছাদিত করে। বাইশ তারিখ থেকেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছিল। রেডিও এবং টেলিভিশনে। আটাশের সতর্ক সংকেত সর্বোচ্চের দিকে যেতে লাগল। তারপর শেষবার, ঊনত্রিশে এপ্রিল। সাড়ে আটটা থেকে শুরু। প্রথমে যেন অনেক দূরে সর্‌সর্‌ শন্‌শন্‌ আওয়াজ। অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল, এবং বাতাস। ক্রমে বাড়ছে। বাড়ছে, বাড়ছে।

এক সময় সব বাতি চলে গেল। তারপর কেবল অন্ধকার। অন্ধকার, জুলমত। ছোটবেলায় সেই হুজুরের গল্প ঝিলিক মেরে যায়, যখন ইস্রাফিলের শিঙ্গা বেজে উঠবে এক লহমায় আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা একটা আচানক ঘূর্ণিচক্রে ওলট-পালট হতে থাকবে, এই কেয়ামতের শুরু; আর তখন কেউ কাউকে চিনবে না। মরদ, আওরতকে না; মা সন্তানদেরকে না; ভাই বোনকে না; বোন ভাইকে না; সবদিকে কেবল এক আওয়াজ—আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌। কিন্তু আল্লাহ্‌ কিছু শুনবেন না।

অন্ধকারে প্রচণ্ড আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্যে তখনও আজানের ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, যদিও ছেঁড়া ছেঁড়া, কারণ তুফানের ঘোর আওয়াজকে ভেদ করে আসতে পারছিল না। এটা আরেক আলামত। তখন বাড়ির দু'দিকের নারকেল গাছগুলো দুড় ম দুড় ম উপড়ে পড়ছিল, একবার ভয়ানক আওয়াজে বিরাট একটা কি যেন এসে পড়ল। নড়ে উঠল ঘরবাড়ি। ওরা সিঁড়ির নিচে এসে পড়েছিল, সেখানে প্রবল বেড়ে ঝলক ঝলক পানি আসতে লাগল। আবু আহমদ হাত বাড়িয়েছিলেন, চিৎকার করে উঠেছিলেন রায়হানা, খবরদার, শ-য়-ভা-ন।

আশ্চর্য নয়, অদ্ভুতও নয়। এতো নিদারুণ ঘৃণা। তার কারণ জানতেন না, ওকে দোষ দেওয়া যায় না।

তিনিই তো প্রায় জোর করে আটাশ তারিখ বিকেল বেলায় পুত্রকে চিংড়ি প্রকল্পে পাঠিয়েছিলেন, চকোরিয়ায়। ওখানে সম্পদ, কোটি টাকার বেশি। যে রকম ঘোষণা চলছে। জলোচ্ছ্বাস একটা হবেই। জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচতে হবে সারা প্রকল্পকে। মালিখ সামনে না থাকলে কামলারা কাজ করবে না, যতই হুকুম দেওয়া থাকুক। আর আজকাল তো সব ফাঁকিবাজ।

আসলে পুত্রকে কাজে লাগিয়েছিলেন এই প্রকল্প তৈরি করে। আবু রায়হানই এর

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক। তিনি ব্যাঙ্ক ঋনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মাত্র।

তিনি দোষী। হ্যাঁ, হতে পারেন তিনি অপরাধী, তাও বলা যায় কিন্তু সবই তো ভাগ্য। সবকিছুই কি তগদীর নয়?

ওই যে মঞ্জুর সাহেব, আলহাজ্ব মঞ্জুর সাহেব, আলহাজ্ব মঞ্জুর আলম, তার তিন কোটি টাকা বেঁচে গেল এবং শেষ পর্যন্ত নিজেও বাঁচলেন, তাও তো কপালগুণ। স্ক্র্যাপ কারবারী। জানে খেটে দাঁড় করিয়েছেন, সীতাকুণ্ডস্থ শীতলপুর বীচে খোলা কারখানা! এক জাপানী কোম্পানী থেকে কিনেছেন চীনা জাহাজ। নাম দাচাং যেহেন। ওজন এলভিটি পাঁচ হাজার পাঁচশত টন। অনেক সময় ফোরকাস্ট ঠিক হয় না, আয়োজন বিফলে যায়, কিন্তু তিনি জবর হুঁশিয়ার আদমী। জাহাজটাকে শিকলে বেঁধে পঁয়তিরিশ জন জোয়ান মজুর মওজুদ রাখলেন। নিজেও অফিস ঘরে হাজির। ঘরটা ছোট কিন্তু শক্ত, পাকা দোলান। কিন্তু বিশাল ভয়াল দৈত্যাকার পর্বতের মতো সাইক্লোন যখন হামাগুড়ি দিতে দিতে গেল তখন দেখা গেল সব নস্যিমাত্র ; সেই আক্রোশে এক থাবড়ায় এংকোর ছিঁড়ে শিপটাকে ফিরতি তরঙ্গে কোথায় নিয়ে গেল, তা দেখাও গেল না। শ্রমিকেরা অসহায়, তারা জলোচ্ছ্বাসে ভাসতে ভাসতে, ডুবতে ডুবতে বাঁচবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাজী সাহেবকে নিয়েই হল মুশকিল, তিনি তখন, পাগলের মতো হয়ে গেছেন। অফিস ঘরটা ডুবে যাওয়ায় তার ছাদের উপর কোনরকমে উঠে দুই হাতে বুক থাবড়াচ্ছেন আর ভাঙা গলায় নাচেন, খতম। তিন কোটি, তিনকোটি, তিনকোটি, তিনকোটি—

তিনি জলোচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রে তলিয়েই যেতেন যদি না তার সহকারী তাকে প্রাণপণে জাবড়ে ধরত। কামলাদের মধ্যে সবচে কমবয়েসী যে ছেলেটি, নাম আকবর, ওকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

যাই হোক, ভাগ্য, কপাল। তার ভাগ্য, কপাল ভালো ছিল সেজন্য জাহাজটি পাঁচ মাইল দূরে অডুবন্ত অবস্থায় পেয়ে গেলেন, যদিও জাপানী নাবিকদের দিয়ে রিবিচিং করাতে তিন হাজার ডলার খরচ হল। নইলে এতদিনে ন্যাংটা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। এবং আগ্রাবাদের ছায়াও মাড়াতেন না। কারণ লোনটা দিয়েছিল সিটি ব্যাঙ্ক, আগ্রাবাদ ব্রাঞ্চ। যিনি ঋণের ব্যবস্থা করেছিলেন, এই শাখার ভিপি শফিক সাহেবের কি দশা হত, বলা যায় না; হয়তো হাওয়া হয়ে যেতেন। অথবা ঘাপটি মেরে থাকতেন কিছুকাল। কিন্তু এটা হোত বোঝবার ভুল। এটা তো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যার উপরে কা'র কোনো হাত ছিলো না। অবশ্য হ্যাঁ অবশ্য। কিছুটা দায় আছে। যে অবাঞ্ছিত, কিংবা অপ্রতিরোধ্য তাকে মোকাবিলা যখন করতেই হবে, সেই মোকাবিলার বুদ্ধি ও কৌশল বিচারের আওতাধীন। সকল মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টি এবং প্রতিরোধ উপাদানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার ক্ষমতা। সুতরাং দায়িত্ব বেশ আছে বৈকি।

কতক্ষণ কেটে গেল? হয়তো অনেকক্ষণ, হয় তো খুব বেশি নয়। তেমনি অক্লান্ত বারিপাত। তার গলা থেকে শিথিল হয়ে পড়ে রায়হানার হাতটা, একটা জানালার পর্দা খানিকটা খোলা সেদিকে অপলক তাকিয়ে তিনি বিড়বিড় করছেন, সে কেন এলো না? সেদিন সেও তো আসতে পারতো। আসে প্রায়ই, টিনা। সেদিন এলো না কেন, কি কারণ ছিল। আসলে এসেছিল নিশ্চয়, দেখতে পাওয়া যায়নি। একটা বাড়ি পরেই ওদের বাসা। বাইরে চলে যাবে, হোক না এক রাত্রি, এমন কোমল প্রাণ ওর, না এসে কি থাকতে পারে? এমন কোমলপ্রাণ আজকাল দেখা যায় না। টিনা মোমতাজ, খুব কোমল বলে দুষ্টুমি করে সে ডাকত, কেবল মোম বলে। মোমে একটু আগুনের আঁচ লাগলেই গলে যায়। হয় তো

এসেছিল টিনা এবং বিদায় দিয়েছিল, নইলে সে যেতো না। কিন্তু, কিন্তু। আমি কি করলাম? আমি যদি না বলতাম, যেতে পারতো না সে কিছুতেই। শুনছো, ওগো শুনছো? তুমি, তুমি তুমি নও—

আমি কি করেছিলাম? ওকে খুব চাপ দিয়েছিলাম কি? কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছেন না, আবু আহমদও যেন স্বগতোক্তি করছেন, আমি আমার ছেলেকে একমাত্র ছেলেকে, আসন্ন দুর্যোগে কর্তব্যকর্মে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম মাত্র। আর তো কিছু করিনি? বাকি ডিসিশন সে-ই নিয়েছিল। অবশ্য আমি না করতে পারতাম। না আমি করিনি। সে জীপটাতে উঠল, তারপর নেমে এল। আমার পায়ে কদমবুচি করল, কদমবুচি করল মা'য়ের পা'য়েও। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। ইঞ্জিনটা ঘড়র-ঘড়র আওয়াজ করে উঠল। সে বিদায় নিল। সেই-হবে চিরবিদায়, কে জানত। না, না। মানি না, আমি মানি না। ওগো, বৌ কান্না থামাও। চোখ মুছো। আমার কি মনে হচ্ছে, জানো? লিও মরেনি। জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে, নিশ্চয় কোনো দ্বীপে উঠেছে। সে আসবে—

আসবে। সত্যি বলছো, আসবে?

হ্যাঁ সত্যি বলছি গো, আসবে সে ফিরে। তোমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারে? থাকতে পারে আমাকে ছেড়ে? না, না। টিনাকে ছেড়ে ও থাকতে পারে না। ওর বাবার সঙ্গে তো কথা পাকাপাকিই করে ফেলেছিলাম। ওদের বিয়ে দেবো। বেশি দেরি করবো না। নতুন বাড়ি, রংটা করিয়ে নি। বহুৎ শানশাওকত হবে। ঝলমল করে উঠবে সারা বন্দরনগরী। আসবে সে। কখন আসবে? কেন এত দেরি?

আসলে দু'জনেই স্থবির, নির্বাক্ পাথরমূর্তির মতো বসেছিলেন। একটু একটু বাতাস বইতে লাগল, ক্রমে দু'একটি যে গাছ আছে সেগুলোর মাথা দুলছে। বৃষ্টির সঙ্গে যেন অজানা গুঞ্জন ধ্বনি।

আস্তে আস্তে, স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন আবু আহমদ, গভীর কী ভাবছেন, তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললেন, এখনো ছেলের কথা ভাবছো?

না রায়হানা জবাব দিলেন, ভাবছি না। কখনো আর ভাববো না। সে তো আমার কোলেই আছে। সেই সুন্দর নাদুসনুদুস শিশু।

ঠিক বলছো। তোমার কোলেই আছে নাদুসনুদুস শিশু। তোমার কোলে যদি শিশু থাকে তাহলেই তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না? এবার আদর করে জড়ালেন, এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে মগ্নস্বরে বললেন, জানো বৌ? বড় কষ্টে আছি, বারবার কেয়ামত আমাকে দেখা দিচ্ছে। স্বপ্নে দেখি। জাগরণেও, যেদিকে তাকাই, কেয়ামতকে দেখতে পাই। দেখতে পাই, কিন্তু সে ক্রুদ্ধ। ভীষণ ক্রুদ্ধ। ওর চোখ ঠিকরে আগুন ঝরে। ঝক্‌ঝকে বল্লম উঁচিয়ে সে ছুটে আসে আমার দিকে—

বোবার মতো স্বামীর মুখটা আধো-অন্ধকারে দেখলেন রায়হানা, কিছু বললেন না। ঝড়ের রাতের সে দৃশ্যটা ঝিলমিল করতে লাগল।

আসমানজোড়া কালোমেঘ, ক্রমে আরও নিবিড়। কখন সুরুজটা ডুবে গেল, বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, মগরেবের আজানের একটু আগেই ওরা এসেছিল। কেয়ামত আলী, এবং তার বৌবাচ্চা। বৌয়ের নাম করিমন। তার কোলে দু'বছরের ছেলেটা, শরাফত, সংক্ষেপে শরা, আরেকটি পেটে, সম্ভবত আটমাস। বেশ ফোলা। গ্রাউণ্ডফ্লোরে ড্রয়িংরুম, সেখানেই দু'জনে ছিলেন। টিলিভিশনে বারবার আবহাওয়া বার্তা প্রচার করছে তাই দেখছিলেন চা খেতে খেতে। বাইরে, অফিস ভবন গুদাম সব কিছুর সঠিক ব্যবস্থা করে এসেছিলেন।

হঠাৎ একটা চেনা গলা শুনে দু'জনেই একসঙ্গে তাকালেন। দেখতে পেলেন, দরোজার কাছে সপরিবারে দাঁড়িয়ে।

আবু আহমদ যেন তাজ্জব হয়ে গেলেন। বলে উঠলেন, আরে কেয়ামত। তুমি? তুমি এখানে কেন?

কি করুম চাচাজান। হগলতে কইতাছে সাংঘাতিক তুফান অইব। কাতর স্বরে বলল কেয়ামত আলী।

বাজে কথা, একদম বাজে কথা। প্রত্যেবারেই তো ঘোষণা দেয় কই বিশেষ কিছুই হয় না। কেবল মানুষের ভোগান্তি।

না চাচাজান, এবার নাহি—

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন আবু আহমদ, একটু চোখ পাকিয়ে বললেন, আবার আমার মুখের উপর কথা? যাও, এক্ষণি স্পটে চলে যাও। ওখানে আমার কয়েক লাখ টাকার মালমাত্তা।

কিছুই অইবো না চাচাজান, কেউ চুরি করবো না। আজগার রাইতটা খালি আপনের বাসায় থাকতে দ্যান, বিহান অইলেই চইল্যা যামু। গড়গড় করে বলতে বলতে কেয়ামত প্রায় কেঁদে উঠল, দ্যাখতাছেন তো বৌডার অবস্থা। খুব ভয় পাইয়া গ্যাছে। বড় তুফান অইলে তো রক্ষা নাই!

আর কি কথা আছে, বল্। আর কি কথা? যতসব ভণ্ড, হারামী। এত পয়সা খরচ করে তোমাকে কেন এনেছিলাম? কি জন্য? ঘরবাড়ি করে দিয়েছিলাম, ভালো বেতন দিচ্ছি। তিনি চেয়ে দেখলেন করিমনের ময়লা কাপড়, বাচ্চার উদোম গতর—ওর নিজের পরনে একটা ছেঁড়া শার্ট ও পুরাতন লুঙি, এবার একটু শান্তস্বরে বললেন, ঠিক আছে। এই নাও তিন শো টাকা। এমনি দিলাম। তোমাদের কাপড়চোপড় কিনো। আর বাজে কথায় কান দিয়ো না। বুঝতে পারছো না? আমার উন্নতিতে অনেকে ঈর্ষান্বিত, তারা চায় আমার ক্ষতি হোক। তোমাদেরটা তো ছনের ঘর। বড় তুফানেও টিকে থাকে ছনের ঘর, উড়ে যায় না। যাও, এক্ষুণি রিকশা করে চলে যাও।

মাথায় কাপড় টানল, করিমনের ঠোঁটজোড়া নড়ে উঠেছিল কিন্তু কিছু বললো না। বাচ্চাটা বাপের কোলে গিয়েছিল, ড্যাব্ড্যাব্ করে তাকিয়ে আছে। একেবারে ঠাণ্ডা কেয়ামত, বৌর হাতে টাকার নোটগুলো গুঁজে দিয়ে মাধাগলায় বলল, চাচাজান, তাহলে বৌবাচ্চা এহানে থাক। আমি যাই।

এই কথায় আচমকা গায়ে আগুন লেগে গেল যেন আবু আহমদের, তিনি চিৎকার করে উঠলেন এবং ইংরেজি ভাষায় বললেন, নো নো। ইউ অল্ গো। গেট আউট।

সময় চলে যায়। সে সময়ও চলে গেছে। সময় চলে যায়, কেবল কখনো কখনো রেখে যায় বিরাট আফসোস। সে সময়টা তো অন্যরকমও হতে পারত। কি আর এমন হোত যদি ওরা এতবড় এই বিল্ডিংটার ভিতরে কোথাও মাথাগুঁজে থাকত, বৈঠকখানার করিডোর কোণে কিচেনে কিংবা সিঁড়ির বারান্দায়? বরং ঝড়ের সময় অনেক কাজে লাগত। কর্ণফুলী ব্রিজের অদূরে বিয়াল্লিশ একর জমি নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স গড়ে তুলছেন সেখানে একটি কাঁচাপাকা লম্বা দুগাত, তাঁর সঙ্গেই লাগানো ওদের কুঁড়েঘর। রড বালি সিমেন্টের বস্তা কাঠ ইট সুরকি আছে গুদামঘরে কিন্তু এত আর হবে দাম। লাখ টাকা হলেও, ভেসে গেলে কি এমন ক্ষতি হোত। চলে যাওয়ার সময় বৌটার চোখে পানি চিক্‌চিক্ করছিল। সে আঁচলে তা মুছেছিল এবং পোলাটা যেন একটু আদর চাইছিল। কেয়ামতের চাউনিতে যেন একটা

মারাত্মক ধিক্কার।

সে ভয়াল রাতের কাহিনী শুনতে শুনতে থ মেরে গিয়েছিলেন, তখনো চকোরিয়া থেকে কোনো খবর আসেনি। প্রবল ঘূর্ণিঝড়। আর জলোচ্ছ্বাস। একটা প্রচণ্ড আঘাতে ওদের কুঁড়েঘর উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ; বৌ ধরে ডান বাহুতে আর বাচ্চাটাকে বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে অনেক কষ্টে জনপথ বিভাগের সড়কের কাছে, হামাগুড়ি দিতে দিতে গিয়েছিল। ছিল কাছে ভিতরে আরও কিছু লোক। সড়কটা বাঁধের মতো, কিছু দূর পর পর সিমেন্টের খাম্বাও আছে। একটাকে বাঁ হাতে আকশির মতো ধরে, করিমন ডান হাতে ওটা আর বাঁ হাতে ওর কোমর ধরেছিল। বাচ্চাটাকে পিঠের উপরে তুললে ওর দুই হাতে তার গলা আঁকড়ে ধরল। শনশন জোর হাওয়া চারপাশের সকল কিছু ছিঁড়ে নিচ্ছে, মুহূর্তে আবার একটা প্রচণ্ড গর্জনে সড়কটার উপরে আচড়ে পড়ল, সঙ্গে শক্তিমান জলস্রোত বয়ে চলে। শোনা যায় না, তবু একটা তীব্র চিৎকারে কান বিদীর্ণ করে করিমন, যখন অজগরের মতো তরঙ্গের নিষ্ঠুর থাবায় শরাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল ঃ সেই শিশুর শেষ কাতর কণ্ঠস্বর, মা—! বাজান্—!

কেয়ামত বিভ্রান্ত, বৌকে খাম্বাটা ভালোমত আঁকড়ে ধরতে বলে বিপরীত দিকে পাগলের মতো সাঁতার কেটে যেতে লাগল। পানির ভিতরে হাত দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল অনেক দূর ইস্তক। কিন্তু পাওয়া গেল না। পরদিন মাইলখানেক দূরে একটা গাছের ডালে আটকা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল।

কেয়ামতের তোমার উপর ভীষণ রাগ, ঠিকই তো আছে। গরিবদের দান খয়রাত করো ঠিকই কিন্তু তুমি গরিবদের ঘৃণা করো। তাঁর ছেলের মৃত্যুর জন্য তোমাকে দায়ী করেছে কেয়ামত। তুমি কেন তাকে সে রাতে আশ্রয় দিলে না?

একটু টেনে টেনে বলছিলেন রায়হানা, একেকটা শব্দ সাজিয়ে যেন নিয়তির কথা, খুব উচ্চ নয় কিন্তু স্পষ্ট।

আবু আহমদ একটু চুপ থাকার পর মুখ খুললেন, কিন্তু তুমিও তো ছিলে, তুমি কেন কিছু বললে না?

তোমার ঘরবাড়ি তোমারই সম্পত্তি। তুমি তোমার কর্তব্য করছো—আমি আর কি বলতে পারতাম। তাছাড়া তুমি যেমন করে চেঁচাচ্ছিলে, আমিও ভয় পেয়ে গেলাম।

হুঁ বুঝেছি। হঠাৎ ক্ষুব্ধ, বলতে লাগলেন, কিন্তু আমি কি তোমার কথা শুনি না—

হ্যাঁ, শোনো বৈকি। রায়হানা ঠাণ্ডাস্বরে মন্তব্য করলেন, যেসব কথা শোনো সেগুলিই তোমার রক্ষাকবচ।

নইলে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতাম, তাই না?

হ্যাঁ তাই। তুমি টাকা করেছ কিন্তু তার মধ্যে একটা পবিত্রতা আছে।

হ্যাঁ, সে শুধু তোমার জন্য। বেশ, আমি স্বীকার করি। কিন্তু বলো, বলো কেয়ামত কেন আমাকে ক্ষমা করতে পারছে না, আমার একমাত্র ছেলেও তো মারা গেছে। এটা কি পাপের শাস্তি নয়? ঠিক আছে। আমি ওকে খুঁজে বার করবো। আমি মাফ চাইবো ওর কাছে। আমি ওকে খুশি করবো। আমি তোমাকেও খুশি করবো। তোমার কোলে একটা বাচ্চা দেবো। বলো, খুশি হবে?

হবো, খুব খুশি হবো। কিছু না ভেবেই মন্ত্রের মতো বললেন রায়হানা, তখন বাইরে বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে।

এতক্ষণ কথাবার্তা বললেও ছিলেন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন, একসময় শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন রায়হানা—স্বামীর বালিশের কাছ থেকে নিজের বালিশটা দূরে নিলেন না, গায়ে কম্বল

টানলেন। অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

আবু আহমদ ঘুমালেন না, ঘুমুতে পারছেন না। তিনি আস্তে করে উঠলেন এবং মশারির বাইরে এলেন। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, আবার যেন বাড়ছে বর্ষণ। ধূমপান করতে ইচ্ছা হল। প্যাকেটটা বার করলেন। একটা সিগারেট ধরালেন লাইটার জ্বালিয়ে। পায়চারি করছেন, আর কি ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে ভাবনার একটা গভীরতায় যেন ডুবে গেলেন। আস্তে আস্তে হাঁটছেন, কিন্তু সে হাঁটা নিজের নয়।

একি! তাজ্জব কাণ্ড! ঝর্‌ঝর্‌ ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টিধারা, তার মধ্যেই হঠাৎ শোনা গেল শিশুর উআঁ উআঁ কান্না। নিচের দিকে, মনে হয় গ্যারেজ থেকে আসছে। ফিরে এসেছে কি কেয়ামত? ফিরে এল কি? কেয়ামত ছাড়া আর কে হবে? আর তো কারুর এমন সাহস থাকবে না। করিমনের পেটে যে ছিল, ইতোমধ্যে সে জন্ম নিয়েছে!

আচমকা মাথায় কি একটা আইডিয়া খেলা করতেই অস্থির, বালিশের নিচ থেকে সাবধানে স্টীলের আলমারির চাবির তোড়াটা বার করলেন।

হুঁশিয়ার, সাবধান। রায়হানার ঘুম না ভাঙাই উত্তম। আস্তে করে আলমারি খুললেন। এবং দেরাজ টেনে বার করলেন পাঁচ শো টাকার নোটের তোড়া, বেশ কয়েকটা। সেগুলো ঢোকালেন। তারপর কপাটের কাছে যান। মনে পড়তে ফিরে এসে টর্চটা তুলে আনলেন। এখন বাতি জ্বালানো ঠিক হবে না।

আস্তে করে বাইরে বেরিয়ে কপাটটা ভেজিয়ে দিলেন। সিঁড়ি বেশি দূরে নয়, সেখানে গিয়ে পা টিপে টিপে নামতে লাগলেন। এখন কান্নাটা শোনা যাচ্ছে না, বোধ হয় বুনি খেতে দিয়েছে।

সিঁড়ির নিচে নেমে দাঁড়ালেন, বৃষ্টি বাতাস আর অন্ধকার। মেইন গেইট তালাবন্ধ কিন্তু বাড়িতে কোত্থেকে কে কখন কিভাবে ঢুকে পড়ে, বোঝা যায় না। গ্যারেজের উপরে কোঠায় থাকে মোহসিন ড্রাইভার। ওর ঘরে দু'তিনবার চুরিও হয়েছে, একবার নিল একব্যাণ্ডের রেডিও আরেকবার কাপড়-চোপড়। এক মাসে বেতনের টাকা পুরোটাই নিয়ে নিয়েছিল। ও একটু আপনভোলা গোছের, খেয়াল রাখে না। নাইটগার্ড হিম্মত তো আরও এক কাঠি উপরে. একবার চোখ বুঁজতে পারলে বেহেশত—দোজখ থাকে না। সাইক্লোনের দিন থেকে এইখানে দাঁড়িয়েছেন আরও কতবার, ভদ্রলোক, ছোটলোক কত লোকের সঙ্গেই না মোলাকাত করেছেন। অফিস স্টোরকিপার সফর আলি এক সপ্তাহ পরে এখানেই এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল, কেন খবর না দিয়ে দেশে চলে গেল। তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন এবং রাগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন ঠিক কথা বলতে নইলে বন্দুক দিয়ে মারবেন। তখন কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেছিল, গুলী করেন আর যাই করেন, আই আর কি কমু। আর ব্যাক গ্যাছে গৈ—মা, বাপ বৌ হুৎ ঝি কেউ নাই—বাড়িগরের কোনো চিহ্নই নাই—সব ধু ধু—

আদিনিবাস নোয়াখালীতে ছিল, এখন সন্দ্বীপবাসী। এমন সর্বনাশের কথা শুনে মেজাজ পড়ে এসেছিল, তিনি জিগগেস করেছিলেন, এখন কি করবে ভাবছো?

সে মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, কি আর করুম, তগদীরে যা আছে তাই অইব। আই আর উগ্‌গা বিয়া করুম।

এইভাবেই বুঝি বাঁচে মানুষ, ধ্বংসের মাঝেও জীবনের উৎস খুঁজে পায় ঃ আসলে এটা একটা অন্ধ নিয়ম। কে চালাচ্ছে, কি করছে। অজানা, অচেনা। তিনি নেশা করেননি কিন্তু মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। উপর থেকে গ্যারেজের চাবি এনেছিলেন,

এনেছিলেন গেইটের চাবি তারপর নিজের হাতে সব খুলে যতটা সম্ভব কম শব্দ ছড়িয়ে বেরিয়েছিলেন। দু'টো বেচে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, রাত কি খুব বেশি? না, বেশি নয়। বন্দরনগরীতে স্বাধীনতা আছে, সারারাতই গাড়ি চলে। আগেকার দিনে ক্লাব থেকে দেড়টা-দু'টোর আগে ফিরতে পারতেন না।

কেন বেরিয়ে পড়লেন এমন বৃষ্টিতে দুর্যোগের মধ্যে? নিজের মনের মধ্যে প্রশ্ন উঁকি না দিয়েছে এমন নয় ; কিন্তু সব ধোঁয়া। উত্তর মেলেনি। সে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে গ্যারেজ ইস্তক গিয়েছিলেন। টর্চ মেরে দেখেছিলেন। গ্যারেজ বন্ধ ছিল। এখানে সেখানে একটা ভিখিরীও ছিলো না। কোত্থেকে এসেছিল শিশুর কান্না? তাও অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য।

কিন্তু ভীষণ একরোখা তার স্বভাবটা, কেয়ামত আসেনি, কেয়ামতকে খুঁজবেন। কেয়ামতকে তাঁর চাই।

আরেফিন লেন থেকে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, বড়ো রাস্তায় নামবার পর দেখলেন বৃষ্টির মধ্যে সারি সারি সোডিয়াম বাতি। দু'একটা ট্রাক, পাস করে গেল; কিন্তু প্রাইভেট কার একটাও না। এই দুর্যোগে যে রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে হয় সে পাগল, নয় মাথা খারাপ। কোন্‌টা তার অবস্থা নিজেও জানেন না; কিন্তু এইটুকু মনে হতে লাগল, আলিবাবার মতো দুর্লভ ধনরত্ন পেতে যাচ্ছেন।

অনেককে প্রশ্ন করেছিলেন, কেয়ামত কোন্‌দিকে গেছে। দেশের বাড়িতে যায়নি; গেলে অবশ্যই খবর পেতেন। কারণ এখনো গ্রামকে ছাড়েননি, গ্রামও তাকে ছাড়েনি। নিয়মিত যাওয়া-আসা করে লোকজন। আত্মীয়স্বজনও চাকরির আশায় নয় ব্যবসার।

একজন লেবার ঠিকই পাত্তা দিয়েছিল, মনে হয় ওটাই ঠিক। পতেঙ্গার কাছাকাছি, দু'তিনটা আশ্রয়শিবির গড়ে উঠেছে। এনজিওরা কাজ করছে সেখানে, বিদেশীও আছে। ওদিকে নাকি দেখেছিল।

আগ্রাবাদ হয়ে যেতে হয়, ঘূর্ণিঝড় একটা বাড়ির ছাদের উপরে যে একটা মাঝারি জাহাজ তুলে রেখেছে সেই পথ দিয়ে।

তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন, ঘুমের ঘোরে না তন্দ্রায়? বুঝতে পারেন না। কিন্তু সবকিছু ভাসে, যেন সামনেই আছে।

একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে মৃত্যুর দিকে চলেছে রায়হানা, তাকে বাঁচাতে হবে। সে আর কি এমন কঠিন কাজ।

এমন একটা প্রস্তাব নিশ্চয়ই পা'য়ে ঠেলবে না কেয়ামত, এমন একটা প্রস্তাব—যাতে সারা জিন্দেগীর সুখ। ঘূর্ণিঝড়ের কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয় ওদের নতুন শিশু জন্ম নিয়েছে, ওকেওবা কতদিন আর বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। মরবেই শিশুটা, হয় অসুখে নয় অপুষ্টিতে। অথচ তিনি দেবেন, আশ্রয়শিবিরের ছোট্ট দরোজায় বসে ব্রীফকেস চটাস করে খুলবেন এবং তিনি দেবেন বাড়িয়ে তাড়া তাড়া নোট, পাঁচশত টাকার নোটের অনেকগুলো বাণ্ডিল—আবেগভরে বলবেন, নাও, নাও। নাও কেয়ামত, নাও করিমন। এক টাকা, দু'টাকা নয়। তিনি লাখ, পুরা তিন লাখ টাকা। কেয়ামত তুমি ব্যবসা করবে এই টাকা দিয়ে, চাটগাঁয়ে না-হয় ঢাকায়, কিংবা নারায়ণগঞ্জে। নরসিংদীতেও শুরু করতে পারো। আমি সাহায্য করবো। তোমার এই অভাব দারিদ্র্য থাকবে না, তুমি বড় লোক হয়ে যাবে, বেশ বড় লোক হবে দু'চার বছরে। তোমাকে আমি খুশি করতে চাই কেয়ামত। আমার উপর রেগে আছো তুমি, তোমাকে আমি খুমি করতে চাই। তোমরা কি দেবে আমাকে? কিচ্ছু না বদলা কিচ্ছু চাই না। কেবল ওই বাচ্চাটাকে দিয়ে যাও। সে তো মরে যাবেই অভাবে নয়

অসুখে, ওকে দাও। বছর খানেক পরেই তো আবার তোমাদের বাচ্চা হবে, তোমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না।—

তোমরাও বড়লোক হবে, তোমাদের হবে বাড়ি-গাড়ি। দেখবে তোমরা এই পৃথিবীটা আনন্দের ফোয়ারা। কি কথা বলছো না কেন? নাও নাও—টাকাগুলো নাও। বাচ্চাটাকে আমার কোলে তুলে দাও। গাড়িতে আমি সময় কাটাবো, নয় পতেঙ্গায় যাবো, শুনবো সাগরের কলধ্বনি। যখন ভোরে হবে, বাসায় ফিরে যাবো। ওর নতুন মা'য়ের কোলে তুলে দেবো ওকে জিগগেস করলে বলবো, টোকিওতে একটা কল বুক করা ছিল ভুলেই গিয়েছিলাম। কাউকে বিরক্ত না করে অফিসে একলাই গেলাম। ফেরার পথে, কুড়িয়ে পেলাম। এখন তুমিই এ শিশুর মা এবং আমি বাপ। কি দেবে না? তোমার পায়ে পড়ি কেয়ামত, দিয়ে দাও—

অনেকদিনের অনভ্যাস তবু চালিয়ে যাচ্ছিলেন, চারদিকে আলোছায়া। কোথায় এসেছেন? ওই তো বাঁ দিকে একসারি আশ্রয় শিবির।

এখানে আলো নেই, এই পথে অন্ধকার। সামনেও অন্ধকার, যদিও দূরে জেটিতে আর বাহির নোঙরেও জাহাজে জাহাজে আলোর পুঞ্জ। কি একটা বেদনা, একটা যন্ত্রণা বাঁ দিক দিয়ে উঠছে, মাথার ভিতরে ঘোর, চোখজোড়া আরও ঝাপসা হয়ে আসছে।

হ্যাঁ, দিমু না ক্যান্? এই দিতাছি। উহ্ ঐ তো, ঐ তো কেয়ামত, কিন্তু ওর চোখে এখনো এত আগুন কেন, যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। না, না শুধু আগুন না, হাতে যে ঝক্‌ঝকে ধারালো বল্লম।

না, না। দয়া করো, মেরো না আমাকে মেরো না। স্টিয়ারিং হুইলেই ছিলেন, বর্শাটা সামনে উয়িণ্ড ভেঙে বিদ্যুৎগতিতে তার বুকের বাঁ দিকে এসে বিদ্ধ হল।

আহ্—প্রথমে একটা তীব্র চিৎকার তারপর গোঙাতে গোঙাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। লেদার সীটে কাত হয়ে পড়েছেন, হাত দু'টো ঝুলছে। এমন সময় পতেঙ্গার দিক থেকে একটা টহল পুলিশের গাড়ি এই ফকফকে শাদা গাড়িটার কাছে এসে থামল।

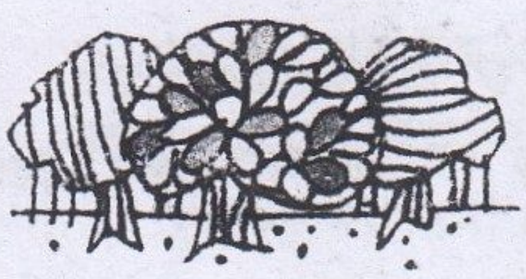
পরদিন পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় লেটনিউজ হিশেবে ছবি ছাড়া যে খবরটা ছাপা হল তা নিম্নরূপ ঃ

শোক সংবাদ

[পুলিশসূত্রে প্রাপ্ত]

দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আবু আহমদ খন্দকার (৫২) গতকাল গভীর রাতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে...রাজেউন)। অধিক রাত্রে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নিজে ড্রাইভ করিয়া তিনি অজ্ঞাত কারণে আগ্রাবাদ অফিসের দিকে যাইতেছিলেন। ড্রাইভিং সীটেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মরদেহ আজ বাদ জুম্বা দাফন করা হইবে।

মে, ১৯৯১।



হেড মিসট্রেস

এই মেয়ে, মুখ নিচু করে আছে কেন—কা'র সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছ জানো? হেড মিসট্রেস, তিনি হেড মিসট্রেস! টিচার থেকে পিয়ন পর্যন্ত যাকে যমের মত ভয় করে। আর তুমি কিনা তাঁকে টহল দিতে দেখে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলে? বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, পিছন দিকে সারি সারি আলমারি। একদিকে স্পোর্টসের নানা আকৃতির কাপ ও শীল্ড সাজানো। সামনে দুই সারি ও দেয়াল ঘেঁষে চেয়ার। নিজ অফিসকক্ষে আপন কুশনের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে ধমকাচ্ছেন হেড মিসট্রেস হামিদা মাবুদ। এই মেয়েটির পিছনে আরও তিনটি মেয়ে। বোঝা যায়, সহপাঠী। তিনি ওদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই মেয়েরা, তোমরাতো ছিলে, তোমরা দেখেছ। ও হাসেনি?

ফ্যাকাশে চেহারা তিনজনেই নামতা পড়ার মত একযোগে উত্তর দিল, হেসেছে ম্যাডাম।

দেখেছ? ওরা ভালো মেয়ে, ভদ্রঘরের সন্তান, সবাই সত্য কথা বলেছে। চোখের চশমা ঠিক করে উনি মন্তব্য করলেন। রাগে তাঁর নাক ফুলতে লাগল।

আমি হেসেছি আপা—দুত্তরি, ম্যাডাম, গ্রীবা উঁচু করে ফারজানা বলল, কিন্তু হেসেছি আপনাকে দেখে নয়। একটু আগে একটা মজার গল্প হয়েছিল তো? হঠাৎ তা মনে পড়তেই আমার পেটের ভিতর থেকে ভস্‌ভস্‌ করে।

দেখেছ তোমরা, কেমন বেহায়া? কত কথা বলছে। আমাকে উল্টাপাল্টা সম্বোধন করেছে। কি দুঃসাহস! আগে আপা ছিল, তিনিই ম্যাডাম চালু করেছেন ; কিন্তু কেউ কেউ পূর্ব অভ্যাসমত আপা বলে ফেলে, এটা মেয়েটির দোষ নয় ; তবু উনি চোখ পাকিয়ে হাত তুললেন এবং ওর গালে ঠাস্‌ঠাস্‌ দুটো চড় মেরে গর্জে উঠলেন, যাও। আর কোনদিন বেয়াদপি করলে ইস্কুল থেকে বের করে দেবো—যাও।

গালে হাত দিল জানা, কিন্তু কাঁদলো না, সে ঘুরল এবং আস্তে হেঁটে বেরিয়ে গেল। ওর প্রিয়সখি কস্তুরী তিনজনের একজন। সে বলে উঠল, একি করেছেন ম্যাডাম!

কেন কি হয়েছে? ইতোমধ্যে বসেছেন, তিনি জিগগেস করলেন।

কেন, আপনি চেনেন না? ও তো চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে—

কোন্‌ চেয়ারম্যান? তিনি ধমকে উঠলেন, বলো কোন্‌ চেয়ারম্যান?

আমাদের ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান! কস্তুরী বলল, ওর নাম ফারজানা আহমেদ, ডাক নাম জানা।

ওরা ভেবেছিল উনি ভড়কে যাবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। কি ভাবলেন, তারপর বললেন, কে কার মেয়ে সেটা বড় কথা নয়। ঠিক আছে, তোমরা যাও।

এইটুকু, বলা যায় ছোট্ট ঘটনা, সারা বিদ্যালয়ের কলরব ও ব্যস্ততার মধ্যে যার মিলিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা গেল না। তিলকে তাল করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। চোখে পড়ে, এখানে ওখানে শিক্ষকদেরও জটলা। হয়তো কানাঘুষা করছেন। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে। সপ্তম শ্রেণীর ক্লাস নিয়ে বেরিয়েছি, কস্তুরী কাছাকাছি এল। কথা বলছি, হাঁটতে হাঁটতে। সে সবিস্তারে সব বর্ণনা করল। একটু উদ্বিগ্ন হলাম। সময়কাল যা পড়েছে, ব্যাপারটা না খারাপের দিকে যায়। জিগগেস করে জানলাম, ক্লাস করছে মেয়েটা এখনো হয়তো

মিটমাটের সুযোগ আছে। এ বিষয়ে আমার নিজের কিছু দায়িত্ব আছে, অনুভব করলাম।

হেড মিসট্রেস হামিদা মাবুদ আমার একমাত্র খালা। আমাকে খুব ভালোবাসেন এবং শুধু পারিবারিক সম্পর্ক সূত্রে নয়, তার একটি ইতিহাসও আছে।

আমার নাম রিনা সুলতানা। ছয় ভাই বোনের মধ্যে বাবা মা'র পঞ্চম সন্তান। হামিদা খালার দুই কন্যা, আর একটিমাত্র ছেলে। ওর নাম ছিল মারুফ, ডাকনাম বুড্ডা। সংগ্রামের সময়ে ওর জন্ম। আমি ওর মাত্র দু'বছরের ছোটো।

কিন্তু আমরা জানি না, কি খেয়াল হলো হামিদা খালার, তিনি আমাকে তাঁর ছেলের জন্য বুক করে ফেললেন। আমাদের খান্দানী পরিবার, বাবা আবুল মোমেন খান, ডিপিআই অফিসের সেকশন অফিসার। তিনি নাকি, প্রস্তাবটা শুনে, হাসতে হাসতে বলেছিলেন ছোট গিন্নি, আমার মেয়ে তোমার কাছে যাবে সেত বড় ভাগ্যের কথা! আমারও কপাল খুলবে, তোমাকে বেশি করে পাবো।

হয়েছে, খালি কলসী-বেশি ডবর ডবর করো না। আমার মা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, রিনাকে হামির হাতে তুলে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়—ওকে গড়ে পিটে মানুষ করতে হবে। নইলে তাল মেলাবে কেমন করে তার সঙ্গে। এইসব ছিল। লোকে বলে হায়াত মওত রিজিক এবং বিবাহ খোদার হাতে—কপালে যার সঙ্গে জুটি লেখা হয়ে যায় তা কেউ রদ করতে পারে না। ওরা এসব জানতেন ; তবু ব্যাপারটা কেবল ঠাট্টা মশকরাই ছিলো না। আমার শিক্ষাগ্রহনের ধারা নির্ণয়, খালার ইচ্ছের প্রভাব তারই প্রমাণ। তাঁর ইচ্ছেতেই আমি বাংলা নিয়েছিলাম এবং এখন, অনার্সের চৌকাঠ ডিঙিয়ে মাস্টারস পড়ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন ধরে গোলমাল, প্রায় বন্ধ। বাসায় অলস দিন কাটাচ্ছিলাম, খালা আমাকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর ইস্কুলে বাংলা ক্লাস নিতেও দিচ্ছেন।

হুঁ, হামিদা খালা একটু বেশি কড়া বৈকি, যদিও আমার সঙ্গে প্রায় কুসুমকোমল। তাঁর কাজে কর্মে অটুট শৃঙ্খলা, পান থেকে চুন খসতে পারে না। টিপ্‌টপ্‌ থাকেন। টিপ্‌টপ্‌ থাকা তাঁর নিয়ম।

আরেকটা দিক, তিনি স্বনির্মিত ব্যক্তিত্ব। প্রবেশিকা পর্যন্ত অভিভাবকের কিছু অবদান ছিল। কেরানী বাপজান, অভাব অনটন লেগেই আছে ; প্রবেশিকার পর পরই জীবনযুদ্ধে প্রবেশ করেন। শিক্ষকতা পেশা, প্রথমে প্রাইমারীতে ঢোকেন। চাকুরী করতে করতে প্রাইভেটে আই এ পাস করেন। পরে বি. এ. বিটি। এবং এম. এ-ও। কত দুর্ব্যবহার পেয়েছেন। বোঝা যায় কেন তাঁর পাষাণহৃদয়।

কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে যে ফস্‌ করে জ্বলে ওঠেন, তার কারণ অন্যকিছুও হতে পারে, আমার আন্দাজ।

আমি তাঁর অফিসে ঢুকে একটু দূরে বসলাম ; চুপচাপ। তিনি খাতা লিখছিলেন।

এসেছ মা? বসো, আমরা একসঙ্গে যাবো। নিচে দৃষ্টি, তবু টের পেয়েছিলেন বোধ হয়, একটুখানি মুখ তুলে আমাকে বললেন এবং কলিং বেল টিপলেন। বেয়ারা আক্কাস চর্কির মত দৌড়ে আসে, একটা কাঁপুনি খেয়ে উচ্চারণ করে, ম্যাডাম!

চা। আর শোনো, সঙ্গে বিস্কুট দিয়ো। কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে তো?

ইয়েস ম্যাডাম। সব ঠিকঠাক চলছে, এবরিথিং ওক্যা।

আমার দিকে তাকাল। তারপর আক্কাস চায়ের সরঞ্জাম রাখা সংলগ্ন ছোটকক্ষে যাচ্ছিল, খালা তাকে ডাকলেন এবং গম্ভীর স্বরে বললেন, শোনো আক্কাস, আর কোনদিন যদি তোমার মুখে ইংরেজি শুনি, তাহলে তোমার চাকরি থাকবে না।

আচ্ছা ম্যাডাম আচ্ছা। আর কোনদিন আমি ইংরেজি বলবো না। তওবা, তওবা। বলতে বলতে নিজ কানে ধরে ওদিকে গেলে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

হেসো না রিনা। বেকুপ মনে হলে কি হবে আসলে জাতে মাতাল। মৃদু হাসির রেখা খেলে যায় হামিদা খালার ঠোঁটের কোণে, তিনি বললেন, ইস্কুলের ফলমূল বিক্রি করে, আর সাধুভাষায় বলে দুর্যোগপূর্ণ রাত্রের আঁধারে চুরি হয়ে গেছে।

চা এল, তিনি কিছু কথাবার্তাও বললেন; কিন্তু যা ভাবছিলাম তার ধারেকাছেও যাননি। চড়প্রসঙ্গ সজ্ঞানেই যেন এড়িয়ে গেলেন।

আমি একটু চিন্তিত ছিলাম বৈকি। অপমানিত হয়তো হবেন না, কিন্তু নাজেহাল হতে পারেন। একজনের মন্তব্য, কমনরুমের কাছ দিয়ে আসার সময়ে কানে বেজেছিল, ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরেছেন, এবার ঠ্যালাটা বুঝবেন মহিলা দারোগা।

কথাটার গুরুত্ব থাকতে পারে বুঝলাম, কারণ চেয়ারম্যান সাহেব সম্পর্কে ইতোমধ্যেই কিছু শুনেছিলাম। ভূগোল শিক্ষক মিন্নাত আলি, জোক করতে ওস্তাদ। বিশেষত অভিধানে, আমাদের মত লোকজনের নাম নিয়ে সুযোগ পেলেই রসকস করেন। একদিন টিফিন পিরিয়ডে বেশ আড্ডা বসেছিল, তিনি যেভাবে বুঝিয়েছিলেন, মনে আছে। চেয়ারম্যান সাহেবের নাম আশরাফউদ্‌দীন, তিনি এমনই রাফ তার কাছে কেউ, বিশেষ করে দীন আদমীরা কিছুই আশা করতে পারে না। তারপর আহমেদ। আহ্ যন্ত্রণাসূচক, যেকোনোভাবে তিনি তা দিতে পারেন। চাকরি জীবনে ডিআইজি হয়েছিলেন এবং তখন আহমদ লিখতেন ; কারণ তখন তিনি একটু আধটু মদ খেতে অভ্যস্থ ছিলেন। কিন্তু পরে, রক্তের তেজ কমে এলে, স্ত্রীর শাসনে তা ত্যাগ করেন, কিন্তু ইতোমধ্যে দেহে চর্বি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল, ভুঁড়িও মন্দ হয়নি এবং তার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্য আহমেদ চালু করেছিলেন। ব্যাখ্যা যাই হোক পরিবেশনের ভঙ্গিটা বেশ কৌতুকাবহ-আমরা একসঙ্গে হেসে উঠেছিলাম।

আমি লক্ষ্য করছি, ইস্কুলে হামিদা খালার উপস্থিতি সাধারণ শৃঙ্খলা অটুট রাখত। হৈ চৈ চেঁচামিচিও কম হোত।

কিন্তু উনি যখন বাসার সীমানায় পারা দিতেন তখন সঙ্গে সঙ্গে নামত এক অস্বাভাবিক নীরবতা। তখন সহজে কেউ কথা বলতো না।

ফেব্রুয়ারী মাস, একুশে আসছিল। আমার উপরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব, যার প্রধান আকর্ষণ একটি গীতিনকশা। আজকে বারো তারিখ। রিহার্সাল ছিলো না, তবু বাসায় ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। শহরের প্রান্তিক এলাকা, নতুন দালানকোঠা গড়ে উঠতে থাকলেও পুরনো কাঁচাপাকা বাড়িঘরই বেশি। গাছপালা আছে এবং মাটির রাস্তাও।

আমাদের রিকশা খড়রখড়র করতে করতে বহির্বাটির সীমানায় এসে পড়েছিল, এমন সময় দেখা গেল ইস্কুলের বয়স্ক মৌলভী সাহেব আপনমনে হি হি করতে করতে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসছেন। বিদায় দিয়েছেন, দরোজায় দাঁড়িয়ে খালুজান। সামনে পড়ে যাওয়ায় সালাম দিলেন। ছাড়িয়ে যেতে যেতে বললেন একুশ আসছে, কাজও বাড়ছে-হেহেহেহে।

লক্ষ্য করলাম, তাঁর হেড মিসট্রেস—হামিদা খালার চেহারা একটু কুঁচকে গেল। কারণ ছিল। মৌলভী সাহেবের নাম তমিজউদ্দিন। তিনি তমিজের ঠাণ্ডা তরমুজ, বিনয়ের অবতার। তবে আরও দু'টো প্রধান গুণে গুণান্বিত তিনি একটা কিছু ঘটলেই ঢোল বাজাতে পারদর্শী এবং তিলকে অতি সহজে তাল করেন।

আন্দাজ করলেন যথার্থই হামিদা খালা আজকের ঘটনাটির উপর রং চড়িয়ে তিনি খালার স্বামী মাবুদ সাহেবের কাছে বয়ান করে গেছেন।

পাকা দেয়াল উপরে টিন। এটা ওদের নিজের বাড়ি। যে কামরাটিতে বুড্ডা থাকত আমি সেখানেই থাকি। সিঙল খাট, একটি ইজি চেয়ার। টেবিলে তেমনি বই সাজানো আছে। দু'জন পপ গায়কের বড় ছবি টাঙানো এবং ম্যাকগাইভার। তার কাছাকাছি, তার নিজেরও একটা বড় পোর্ট্রেট ; রুপালি ফ্রেমে বাঁধানো হাতে ক্যামেরা, দাঁত বার করে হাসছে। এতই জীবন্ত যেন কথা বলে উঠবে।

হাত মুখ ধুয়ে এসে কাত হয়ে আছি ওরই বিছানায়। পাশেই করিডোর, চওড়া বারান্দা। ওখানে বেতের একটি সোফাসেট এবং কয়েকটি চেয়ার।

আওয়াজ পাই, খালাখালুজান এসে বসেছেন। কাজের মেয়ে মালেকা প্লাস্টিকের খাঞ্চায় করে চা নিয়ে এসেছে।

বারবার গলাখাকারি দিচ্ছিলেন খালুজান জনাব আবদুর রহিম মাবুদ, একসময় হামিদা খালার নরম বক্রোক্তি শুনতে পেলাম, গলায় তোমার কি হয়েছে? এনি সেনসেশান?

ও নো, নো। কেন জানি, খুস্‌খুস্‌ করছে। আমি দুঃখিত।

আমল দিলেন না এই উত্তরকে, হামিদা খালা বললেন, আমি জানি, তুমি কেন অমন করছো। মৌলভী সাহেব তোমাকে কিছু সবক দিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই।

না। তেমন কিছু তো বলেননি। বেতের চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, তুমি নাকি আজ একটু বেশি রেগে গিয়েছিলে?

উনি বয়ান করেছেন আর তুমি তা বিশ্বাস করছো। জানের জান দোস্ততো?

আহা। আচ্ছা ঠিক আছে। রাগ নয়, তাহলে কি?

মনে হল, হামিদা খালা গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং স্বামীর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, বলতে পারো প্রশাসনিক কর্তব্য।

বুঝলাম, কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব নাকি—

ব্যস, আর বলতে হবে না। খালা কঠিনস্বরে বললেন, শোনো, দরকার হলে আমি রিজাইন করবো।

হ্যাহ্? চাকরি ছেড়ে দেবে তুমি, বলছো কি? এদিকে আমার চলছে এলপিআর।

ভাবছ বুঝি আমার চাকরি না থাকলে না খেয়ে মরবে তুমি? তেতো গলায় জিজ্ঞেস করলেন হামিদা খালা।

না, তা নয়। তা নয়। আসলে চাকরি না থাকলে তো সময় কাটে না। আমার কি অবস্থা, দেখতে পাচ্ছ না? কচ্ছপ, একটা কচ্ছপ। কেবল ধূলিবালি আর শুকনা পাতা গায়ে এসে পড়ে।

এসব কথা যেন শুনছেন না, হামিদা খালা বলতে লাগলেন, চিরটা কালতো তোমার সংসারের ঘানিই টানলাম। এখন আমার আর কি আছে। মেয়ে দু'টো বিদায় নিয়েছে। ছেলেটা চলে গেল আমরা নাকি মানুষ গড়ার কারিগর। হ্যাঁ তাতো বটেই। দু'পয়সার বিনিময়ে অন্যলোকের মেয়েদের পড়াই। ওরা মানুষ হয়ে উঠুক, জান প্রাণ দিয়ে এইতো চাই। অথচ কেউ দুষ্টামি করলে একটু শাসনও করতে পারি না। নানারকম হুমকি আসে। আমরা কি শুধু বেতনভুক্ত চাকর? বলতে বলতে গলা ধরে এসেছিল, খালুজান ব্যতিব্যস্ত, বললেন, আহা, এতদুঃখ পাচ্ছ কেন। দুনিয়াটা বদলে গেছে, সেজন্যই তো সাবধানতা প্রয়োজন। নইলে শিক্ষকদের আগে কত সম্মান ছিল। আল্লাহর পরে মা বাপ, তারপরেই গুরু। খারাপ কিছু বলেনি মৌলভী, সে আমার ইয়ার তো? আগেভাগে একটু হুঁশিয়ার করে গেছে। আসলে ডিআইজি সাহেব রিটায়ার করার পর বাড়িতে এসেছেন তো, নিজেকে এখন

আইজি মনে করেন। চড়টা একটু জোরে লেগেছে, ফারজানার গাল নাকি ফুলে উঠেছে। লম্ফঝম্প বেশি করেন, কিন্তু এখনো কিছু ক্ষমতা আছে তাঁর। কিছু যদি একটা করে ফেলেন, সেটাই ভয়। এসব লোকের তো অতিরিক্ত ডাট। তবু, হেহে এত সোজা না, যেমন বিঝাড়া ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। আমি ভাবছি, তাঁর উপরের কাউকে ধরবো। একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাবে, না?

না। হামিদা খালা উচ্চারণ করলেন।

কি, না? বুঝতে পারছি না।

তোমাকে কিছুই করতে হবে না।

তাহলে তোমার উপরে বিপদ আসবে যে।

আসুক, আমি নিজেই তার মোকাবিলা করবো।

এরপর দু'জনেই চুপ। কেবল চায়ের কাপের টুংটাং শব্দ শুনলাম। বেলা পড়ে এসেছিল, খালা উঠে কিচেনের দিকে গেলেন।

অস্থির খালুজান, পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর আমার রুমে ঢুকে ইজি চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লেন। আমি উঠলাম। তিনি বললেন, কি বিপদ দ্যাখ তো মা, তোমার খালা আমার কথা শুনছেন না।

আমি আর কি বলবো। চুপ হয়ে থাকি।

উনি বলে চললেন, কখনো আমার কথা শোনেন না। কখ্খনো না। তাঁর মতামত আমার উপর চাপিয়ে দেওয়াই অভ্যাস। তুমিই বিচার কর, মা। বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমিও তো কিছু একটা করতে পারি, কি বলো? প্রভাবশালী ব্যক্তি, যদি আঘাত করেন, তবে সর্বনাশ।

স্টপ ইট, আই সে স্টপ। ওকে কিছছু বলবে না, কিছছু না। আমাকে তুমি ধ্বংস করেছ। হামিদা খালা কি প্রয়োজনে এদিকে এসেছিলেন, কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে সম্ভবত কান পেতে শুনেছেন স্বামীর কথা, অগ্নিদৃষ্টি ঝরিয়ে তিনি বললেন, তুমি একটা অপদার্থ শুধু নও, একটা স্বার্থপর জানোয়ার।

আর কারুর এমন ক্রুদ্ধমূর্তি কখনো দেখিনি, তাই আমিও প্রায় বলা যায়, ভিতরে ভিতরে কাঁপছিলাম। হঠাৎ যেন একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই সবকিছু স্বাভাবিক গতিতে চলে। ইজিচেয়ার থেকে উঠে খালুজান করিডোরে গিয়ে বসলেন। তাঁর চেহারা কালো হয়ে আছে, থ মেরে সামনে তাকিয়ে থাকেন। কিছু বলেন না।

আমি ঘর গুছিয়ে বাইরে এলাম। তখন উনি বললেন, রিনা মা, আমাকে এক গেলাস পানি খাওয়া তো।

ভিতর থেকে একগেলাস পানি এনে দিতেই একচুমুকে পান করলেন। তারপর আবারও স্তব্ধ, নির্বাক।

এমন সময়, বাইরের প্রাঙ্গণের লাগা কাঁচা রাস্তায় মেরুন রঙের একটি গাড়ি এসে থামল। ড্রাইভার বেরুলে দেখা যায় মিঃ আশরাফউদ্দীন আহমেদ। ইভনিং ওয়াক পোশাক-পরনে শাদা জিনস ট্রাউজার, গায়ে নীল রেখা গেঞ্জি এবং পা'য়ে কেডস। হাতে ছড়ি নয় ; একটা নাতিদীর্ঘ ব্যাটন। মাথায় চটকদার মাঙ্কি ক্যাপ। আগে গোলটোপর ওভালশেপ সাহেবী শোলার টুপি পরতেন। ওটা ছিল পিতার স্মারক। তিনি কো-অপারেটিভ ইনসপেক্টর ছিলেন। খাকীর হাফপ্যান্ট আর ওটা পরে তিনি সাইকেলে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। ইংরেজ শাসকের উজ্জ্বল নমুনা। ওটা এখন নাকি তাঁর ড্রয়িংরুমে বাঘের ছালের সঙ্গে একটা পেরেকের মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছেন।

দূরে থাকতেই ঝট্‌পট্‌ উঠে দাঁড়ালেন খালুজান, এবং একজন কনেস্টবলের মতো সালাম ঠুকলেন। চেহারা ফ্যাকাশে। মনে হয়, তার ভিতরে যা আশংকা করা হয়েছিল তাই ঘটল, এই ভাব।

ডানহাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি, লাঠিসহ ডানহাতটা দোলাতে দোলাতে গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে এলেন।

আস্‌সালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপন স্যার। কি সৌভাগ্য। গরীবের দুয়ারে হাতীর পারা।

শোনোন মিস্টার মাবুদ, ডোন্ট প্রেইজ মি টু মাচ, আই ওয়ান্ট টু বি এ্যান্ড অর্ডিনারী ম্যান।

ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ভেরী গুড। আমরা জানি, আপনি নেক্‌স্‌ট সংসদ ইলেখশনে দাঁড়াবেন। আমরা আপনাকে ভোট দেবো, স্যার.....

আশরাফউদ্‌দীন সৌজন্যের অপেক্ষা না করে লম্বা পায়ে বারান্দায় উঠলেন এবং ঝপ্‌ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তিনি টুপি ও লাঠি তেপায়ায় রেখে হাঁপানো নিয়ন্ত্রণ করতে করতে জিগগেস করলেন, আই এ্যাম ইন এ হারী, এক্ষুণি টেনিস কমপ্লেক্সে যেতে হবে। ম্যাডাম আছেন তো?

কপাটের আড়াল থেকে দেখি, খালুজান ঢোক গিললেন এবং তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আছেন স্যার, আছেন।

একটু যদি সালাম দ্যান।

অবশ্যই, স্যার অবশ্যই—এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি।

সামনে মুখ তুলে তাকাতেই দূরে দেখলাম গাড়ির সাইড গ্লাস নামানো আর ড্রাইভারের বাঁয়ের সীটে একটি মেয়ে, সে এদিকে চেয়ে আছে। চেনা গেল, ফারজানা।

ঠিকই চলছে কাণ্ডকারখানা।

শাড়ি পাল্টে ধীরস্থির পদক্ষেপে এসে সামনের বেতের চেয়ারে বসলেন হামিদা খালা, হেড মিসট্রেস হামিদা মাবুদ। সামনে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান। দু'জনে এখন মুখোমুখি।

আশরাফউদ্‌দীন বিনয় দেখিয়ে বললেন, অসময়ে এলাম, অসুবিধা করিনি তো?

হামিদা খালা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, জ্বী না।

আমি চলে যাবো, স্যার? মাবুদ খালু কাঁচুমাচু করে জিগগেস করলেন।

না, থাকুন। কোনো অসুবিধে নেই।

মুখ তুললেন হামিদা খালা, শান্তস্বরে বললেন, আপনি কি জন্য এসেছেন আমি জানি স্যার। আপনি যদি আমাকে জবাবদিহি করতে বলেন, আমি করবো না। রেজিগনেশন লেটার আপনি নিয়ে যেতে পারেন। নিজের সন্তান যখন মানুষ করতে পারলাম না তখন এসবের কি প্রয়োজন—

সেজন্য আমি আসিনি। ওয়ান মিনিট। এইটুকু বলে উঠলেন এবং দুলকিচালে হেঁটে গেলেন গাড়ি পর্যন্ত। ওখান থেকে ফারজানাকে নিয়ে এলেন। ওরা দেখছেন, উনি বসলেন আবার। সালুয়ার কামিজ ওড়নাপরা, কাছাকাছি মাথানিচু করে দাঁড়িয়ে ফারজানা। আশরাফউদ্‌দীন বললেন, ওকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, ম্যাডাম। ও আপনার পা ধরে মাফ চাইবে! জানা—

ফারজানা নিচু হয়ে হামিদা খালার পা বাড়িয়ে ধরতে গেলে উনি বাধা দিলেন এবং

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, লক্ষ্মী মা, এসব লাগবে না। তুমি বসো।

না, না ম্যাডাম। আপনি নরম হবেন না। আপনার সঙ্গে বেআদবী করেছে এতবড় দুঃসাহস। আপনি তো কিছুই শাস্তি দেননি। এমনসব কথা যখন বলছিলেন আশরাফউদ্‌দীন ওরা তাকিয়ে ছিলেন, কিছুটা অবাক।

হামিদা খালা বললেন, আমার ইস্কুলের ছাত্রীরা, প্রত্যেকেই আমার মেয়ে। নবীন বয়স, ওরা প্রাণচঞ্চল। দুষ্টুমি তো করবেই। আমিই ভুল করেছিলাম। রাগের মাথায়—

না, আপনি কোনো ভুল করেননি, কড়া শাসনে না রাখলে পোলাপান নষ্ট হয়ে যায়। দেখছেন না চারদিকের অবস্থা? সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারী কারা? ওরা আমাদেরই আদরের ধন। উনি মেয়েকে হুকুম করলেন, জানা! ম্যাডামকে কদমবুচি করোষমা চাও।

একটু তাকিয়ে হামিদা খালার মনের অবস্থাটা যেন বুঝবার চেষ্টা করল, তারপর নুয়ে কদমবুচি করে। পা টেনে নিলেন না হামিদা খালা। শেখানো বুলির মতো ফারজানা মৃদুস্বরে বলল, ম্যাডাম! আমি অন্যায় করেছি। আমাকে মাফ করে দেবেন!

ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও!

হঠাৎ যেন মনে পড়ল। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে উঠে পড়লেন, আশরাফউদ্‌দীন বললেন, ওহ্‌হো ইট্‌স্ হাই টাইম। আমি আসি এখন?

সেকি, স্যার। এককাপ চা খেয়ে যাবেন না?

জ্বীনা, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। আরেকদিন সময় নিয়ে আসবো। আশরাফউদ্‌দীন বুক পকেট থেকে একটি খাম বার কররেন, সেটা হামিদা খালার হাতে দিয়ে বললেন, সময় পেলে, পরে একটু পড়ে দেখবেন! আচ্ছা আসি।

ওরা বারান্দা থেকে নেমে জলদি হাঁটতে লাগল এবং রাস্তায় গিয়ে গাড়িতে উঠল। কিছু যান্ত্রিক আওয়াজ হওয়ায় ধোঁয়া। শহরতলী পথে ওরা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই আমি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ওদের এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন খালুজান, আর হামিদা খালা হতভম্বের মতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু আগে যা ঘটে গেল তা যেন অবিশ্বাস্য। কিংবা অন্যরকম চিন্তাধারাও হতে পারে। চেহারার কাঠিন্য চলে গেছে, নেমেছে কোমলতা। ধীরে তা বৃষ্টিগর্ভ কালো মেঘের মতো ভারাক্রান্ত। আমার অনুভূতি মিথ্যা ছিল না। সহসা ভেঙে পড়লেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমাকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে উচ্চারণ করলেন, রিনা! রিনা মা। মাগো, আমি কি করবো। আমি কেমন—

কি হয়েছে খালা, কি? অমন করছেন কেন? কিন্তু আমার কথা শুনছিলেন না, আমাকে ধরে বুড্ডার কামরায় ঢোকার পর, আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওর বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ ঘষছেন আর বলছেন, আমার বাছাকে তোমরা এনে দাও। এনে দাও। বুড্ডা, বুড্ডা কইরে। কোথায় গেলি তুই বাবা মারুফ। ফিরে আয়, ফিরে আয়। আহ হা হা হা হা...ফিরে-আ-য়! তুই ফিরে এলে আমি হেড মিসট্রেস থাকবো না, রিজাইন করবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলছি—

খালা আম্মা! খালা আম্মা। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু তিনি আমাকে সজোরে সরিয়ে দিতে উঠে পড়লেন। কাছেই দেয়াল। একটু এগুলেন। দু'হাত বাড়িয়ে ছেলের ছবিটাতে টান দিতে ওটা আলগা হয়ে এল। তারপর বুকে চেপে ধরে রোদন করতে লাগলেন।

এসময়ে মাবুদ খালুজান এসে পড়লেন, তিনি বললেন, কি হয়েছে? কি?

স্টপ, স্টপ। স্টপ ইউ স্লেভ, মোস্ট হেটেড বিস্ট! আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। সবকিছুর জন্য দায়ী তুমি। তুমি, তুমি কি, এমন চাকরি ছিল তোমার? সারা মাসের চালডালও কেনার মরুদ হতনা। অথচ দিনরাত, সারাক্ষণ, তুমি মন্ত্রণালয়ের হিসেব রক্ষক হিসাবে হিসাব করেছ। মেয়েদুটোর যা হবার হোত। কিন্তু ছেলেটির দিকে একদিন, একবারও নজর দাওনি। খালুজান কাষ্ঠমূর্তি। কিন্তু আশ্চর্য। খালা নিজেকে সামলে নিলেন। ছবিটা পাশে রেখে আঁচলে চোখ মুখ মুছলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে তো মা? যে লোকটাকে বাজে ভাবতাম, তাঁর ব্যবহার। শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য মেয়েটাকে নিয়ে এল। আমার ছেলেটাকে আমি তো, শাসনই করেছিলাম। ওর পিঠে দু'তিনটা স্যান্ডেলের বাড়ি, এইতো! এ যদি ওকে ধরত। আদর করত। একবার আমার কাছে নিয়ে আসত। বাপ হিসেবে এটা কি তার কর্তব্য ছিলো না? ছেলেটা রাত্রে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিকমত খোঁজও নেয়নি। সকালে অফিস—

সে ঘটনা কেবল করুণ ছিলো না, মর্মান্তিক। ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়েছিল, ধানমন্ডির একটি দুষ্টগ্রুপের পাল্লায় পড়ে। প্রথমে ইয়ারেরা খাওয়াত, অভ্যাস করাবার কৌশল। নিজের টিফিনের পয়সাতো বেশি থাকতো না, সুতরাং গোপনে বাসা থেকে নিয়ে এটাসেটা বিক্রি শুরু করে। সোনার বালা চুরি করবার সময়েই ধরা পড়েছিল, আর সব ফাঁস হয়ে পড়ে ; কিন্তু তখন ফেরাবার বিশেষ সময় ছিলো না। পাড় নেশাখোর হয়ে পড়েছিল। মায়ের হাতের পিটুনি খেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরলো না। পরে শোনা গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে কি ঝগড়া হয় ; ছয়দিন পরে লেকের ধারে বুড্ডার ছুরিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলেন, আমি দ্রুত এক কাপ চা বানিয়ে এনে তাঁর হাতে দিলাম। উনি তখন চেয়ারম্যানের চিঠিটা পড়ছিলেন। চায়ের কাপ নিলেন, সেটা আমাকে পড়তে দিলেন। আমি চোখ বুলিয়ে গেলাম। তাতে লেখা আছে, আমার মেয়েকে শাসন করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আরেকটু উপকার করবেন। ফারজানা আমার পালিতা কন্যা। আর কোনদিন, বেয়াদপি করলে ওকে ইস্কুল থেকে এক্সপেলে করে দেবেন। আমি এই শাস্তিকে অভিনন্দিত করে জনসভায় একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে চাই। আপনার নাম আমি বছরের সেরা শিক্ষয়িত্রী পুরস্কারের জন্য মিনিস্ট্রিতে রিকমেন্ড করে পাঠাবো। অবশ্যই আপনি পুরস্কার পাবেন। আপনি শিক্ষার মহান গৌরব। আপনার মত দু'চারজন থাকলে আমাদের এত অধঃপতন হতো না!

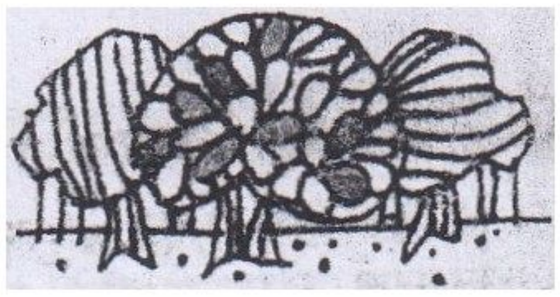
পড়েছ? আমাকে জিগগেস করলন, কাপ থেকে মুখ তুলে আমি উত্তর দিলাম, জ্বী হাঁ।

তিনি আবার জিগগেস করলেন, ভালো করে পড়েছ তো?

আমি আবার বললাম, জ্বী হাঁ।

আমাদের আগের ধারণাই ঠিক ছিল। আধা খেয়েই চায়ের কাপটি টেবিলের কোনে রাখলেন এবং চিঠিটা, আমার হাত থেকে টেনে নিলেন। চেহারার সুস্থির গাম্ভীর্যে ক্রোধ সঞ্চারিত হল ; কিন্তু ছিঁড়তে গিয়েও কি ভেবে তা ছিঁড়লেন না। সেটা ভাঁজ করে খামে পুরতে পুরতে স্বগতোক্তির মতো বললেন, আমার সন্দেহ হচ্ছিল নিশ্চয় একটা কিন্তু আছে। দেখলে তো কেমন বহুরূপী? মুখে মধু, অন্তরে বিষ। ব্যাটা বদমাশ, আমাকেও কাজে লাগাতে চায়! আমাকে দেখে ঠিকই, কিন্তু বোঝে না যে আমি একটা হেড মিসট্রেস!

সেপ্টেম্বর ১৯৯১।



টেলিফোন

এখন নিশুতি রাত। আশেপাশের বাড়িগুলোতে সবাই যখন ঘুমে মগ্ন, এবং অনেক দূরে শুধু দু'একটা কুকুরের ঘেউঘেউ, তখন নীলাভ আলোকে ছাওয়া নিঝ্‌ঝুম কক্ষে টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং। বাজতেই থাকে অনবরত ; অবিচ্ছিন্ন, একটানা, তার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে নীরবতা ভেঙে ভেঙে পড়ে।

খাটের পায়ার কাছে শিয়রের দিকে তেপায়া, তার উপরেই রেখেছে। হাত বাড়ালেই তোলা যায় রিসিভারটা, কোনো কষ্ট হয় না।

এমন নয় যে অনেক আগে বারোটা বেজে গেলেও রাহিজা ঘুমিয়ে পড়েছিল : তন্দ্রাচ্ছন্ন, তাও বলা যায় না বরং চেতনার ভিতরেই যেন স্বেচ্ছায় বুঁদ হয়ে থাকা, যখন ভাবনা ও অনুভবের ধারাগুলো একান্তে চলতে থাকে। এমনি করে সে, কল এলে চুপচাপ নিষ্ক্রীয় থাকে কিছুক্ষণ। বাজনা কান ছুঁয়ে যায়। তার প্রশ্ন, তার ভাষা। তার আলাপ, যা একটু পরেই শুরু হবে, তা আগেই বুঝতে পারে। ও প্রান্তও জানে যেন বিষয়টা, সেজন্য ঝট্ করে ছেড়ে দেয় না। হ্যাঁ একমাস। একমাস হয়ে গেল, চলছে এমনিভাবে।

একই খাটে, চারটি ছেলেমেয়ের মাঝখানে শোয়, এটা কখনো অভ্যাস ছিলো না। এখন শোয়, আগে এমনভাবে শুত না। আগে ওরা পাশের কামরায় একটা বড় মশারীর ভিতরে থাকত।

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেলে মাঝ থেকে উঠে কিনারায় এল। বড় ছেলেটাকে একটু সরিয়ে আলুথালু বেশে বসে এবং রিসিভারটা বাঁ কানের কাছে ধরে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করল, হ্যালো!

হ্যালো, মিসেস আলম বলছেন? আসসালামু আলাইকুম রাহী ভাবী, অসময়ে আপনাকে আবার বিরক্ত করছি। কিন্তু আমি জানি, যদিও রাত প্রায় দুটো, আপনি ঘুমাননি। আপনি ঘুমাতে পারেন না, এটাই সত্য। ভাবী, আজকেও একটা জরুরী কথা বলার আছে, আশা করি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। টিকটিকি তো লেগেই আছে সারাক্ষণ, স্পেশাল স্কোয়াডও বিশেষ তৎপর। আট কোটি টাকার মামলা। বিরাট ব্যাপার। এ কাজ চুনোপুঁটিরা করতে পারে না। ওরা ঠিকই বুঝেছেন এর সঙ্গে কয়েকজন রাঘববোয়াল জড়িত রয়েছেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ওরা, মহাপ্রতাপশালী।

আপনি কি বলতে চান, বলে ফেলুন। রাহিজা বলল, আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করছে। আমি বিশ্রাম নিতে চাই।

ও হ্যাঁ, আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, এত বড় একটা দুর্ঘটনা—তার মানসিক চাপ সহ্য করা মুশকিলই বটে। কানের কাছে টেপের মতো চলতে থাকে কণ্ঠস্বর, শুনুন ভাবী, এতদিনে এটুকু নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন আমরা আপনার মঙ্গল চাই। আপনার ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক, আপনি শান্তিতে থাকুন। গোড়াতে, আপনি বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছিলেন সেজন্য আপনার উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। মঞ্জুর আলম, আপনার স্বামী। হ্যাঁ, আমরা একবাক্যে স্বীকার করি ফেরেশতার মতো ব্যক্তি ছিলেন। এমন সজ্জন ও সত্যবাদী লোক আজকাল দুর্লভ। হ্যাঁ সত্য, সত্য। সত্য না বলে পারতেন নাবলেই তাকে অকালে বিদায় নিতে হল। তার অফিসে তিনি কতদিন, কতবার আমাকে চা-নাশতা খাইয়েছেন। চাইনিজ, তাও বাদ দেননি। সত্যি আমি, ব্যক্তিগতভাবে, খুব ফিল্ করি ভাবী, বিশ্বাস করুন। আহা, তিনি যদি কিছু মিথ্যা বলতে পারতেন—

আস্তে আস্তে কমতে কমতে অনেক দূরে যেন সরে যায় রহস্যময় কণ্ঠস্বর। আবার ফিরে আসবে। জোয়ার ভাঁটা খেলা।

সেদিনটা শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও তার কাজ এদিনেও পুরোপুরি গর হাজির থাকে না, বরং অনেক সময়ই চলতে থাকে আগের দিনের জের, এমনকি কোনো কোনো সময় আগ্রাবাদের বড় রাস্তার উপরে একটা তেতালা ভবনে যে অফিস, তা খুলেও বসতে হয়। ইন্ডেটিং ক্লিয়ারিং এজেন্টের এমনি জীবন। সকলে যদি অফিসিয়াল ধারায় চলে, কোনো অসুবিধা থাকে না ; অনেক ক্লায়েন্ট যে অন্যরকম চায়, আর সেখানেই মুশকিল। তবু এরই মধ্যে উপভোগ করে কম না, সেসব সচেতন প্রয়াসের ফল। পাথর থেকে যেন রস আহরণ। ছাত্র থাকাকালে কলেজ টীমের সেরা খেলোয়াড় ছিল, সেই থেকে সবকিছুকে সহজভাবে নেবার অভ্যেসটা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কঠিন দায়িত্ব পালনের মাঝেও পরিবার নিয়ে যায় প্রায়ই পতেঙ্গা, এমনকি কখনো কখনো রাঙামাটি। এবং কক্সবাজারে। নিজেই ড্রাইভ করে। টিফিন, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে, ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতে টেবিলেও বসে এবং খেলার সময় উৎসাহ দেয় খেলতে। নিজেও তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। নাশতার পর আজকেও এদের সঙ্গে হৈচৈ করছিল, খেলছিল। টিভি গেইম। তারকাযুদ্ধ, ব্যাঙ্কক থেকে আনিয়ে দিয়েছে বড় ছেলে সুমনকে। খেলতে খেলতে হাততালি দিয়ে উঠল।

এ সময় বাইরের করিডোরে একটি গাড়ি এসে থামার শব্দ। এক ব্যক্তি উঠে আসে দ্রুত পায়ে এবং কলিংবেল টিপল।

হেই, শুনছো? তোমাকে ডাকছেন একজন। হাতে ধূমায়িত চা'য়ের কাপ নিয়ে কাছে গেল রাহিজা, যে-কোনো অতিথি এলে প্রথম অভ্যর্থনার ভার তারই উপর।

আমি খেলছি। তুমি দ্যাখ না, কে এসেছেন?

মনে হয়, তোমার কোনো কলিগ্।

একটু বসতে দাও। এক কাপ চা দিতে পারো। অপারেশন বক্সের বোতাম টিপতে টিপতে অন্যমনস্কভাবে বলল আলম। ভীষণ ফাইটিং, এখন তার আক্রমণের পালা।

বড়ই লক্ষ্মী মেয়ে রাহিজা আলম। স্বামীর কথা তামিল করতে সামনের দিকে গেল।

এই যে ভাবী মঞ্জুর ভাই কোথায়? চোখে গগল্স, বুশশার্ট পরা এক যুবক জিগগেস করল।

ঐ যে, আজকে ছুটির দিন তো, বাচ্চাদের নিয়ে খেলছেন। আপনাকে বসতে বলেছেন। একটু বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

না, না ভাবী, এখন নয়। এখন ভীষণ তাড়া। মুরুব্বিরা গাড়িতে বসে আছেন। মঞ্জুর ভাইকে নিয়ে যেতে হবে।

এদিকে গরম আলাপ শুনে মঞ্জুর আলম খেলা ছেড়ে এল। চেনা লোক। দেখতে পেয়েই বলল, কি ব্যাপার সেলিম?

এক্ষুণি এক জায়গায় যেতে হবে, মঞ্জুরভাই, জরুরী সাক্ষাৎকার। আপনাকে আমি নিতে এসেছি, মুরুব্বিরা গাড়িতে বসে আছেন!

ও আচ্ছা, আচ্ছা। আমি এক্ষুণি তৈরি হয়ে আসছি। বলে দ্রুত বেডরুমে গিয়ে ঢুকল মঞ্জুর, এবং চট্পট্ তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। শার্ট প্যান্ট টাই পরেছে, চোখে কালো চশমা।

যখন বুঝতে পারল বেরিয়েই যাচ্ছে, কিচেন থেকে জলদি এদিকে এসে দাঁড়াল রাহিজা, হাতে হলদীর দাগ, মুখ তুলে জিগগেস করল, যাচ্ছ তো, ফিরকে কখন?

প্রশ্নটা লুফে নেয় সেলিম, সে উত্তর দিল, এইতো একটা, বড় জোর দেড়টা। এর বেশি দেরি হবে না ভাবী।

এর সঙ্গে যোগ করে মঞ্জুর স্ত্রীর ভার-ভার মুখের দিকে তাকিয়ে, হ্যাঁ ভাই। আজকে এর বেশি কোথাও থাকতে পারবো না।

মনে মনে বলে রাহিজা, আজকে না বেরুলেই কি চলতো না? এমন নরম মানুষ নিয় মুশকিল, নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা কখনো বলতে চায় না।

একটি ছোট্ট ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ ছোট্টই তো। বিবাহ বার্ষিকী। কোনদিন একে নিয়ে হৈচৈ করেনি। নীরবে এসেছে, নীরবেই চলে গেছে। আঠারোটি বছর। শুধু একটু ব্যতিক্রম ঃ দিবসটা ক্রমে এগিয়ে এলে, কাজেকর্মে মাঝে মাঝে তাকায় ; একে অন্যকে দেখে, যেন চলে উভয়ের মধ্যে নিঃশব্দ সংলাপ। এই দিনটি উপলক্ষে কখনো উপহার হিসেবে শাড়ি কিনে আনে না। মিষ্টি আনে। আর একটা কিছু অলঙ্কার। হয় ইয়ারিং, নয় নাকফুল। বেশির ভাগ দিয়েছে আংটি। এবারও দিয়েছে তাই। দামটা একটু বেশি নীলাসেট। বোঝা যায়, ভালো আয় হচ্ছে। পয়সা বাড়ছে।

ওমা, কি সুন্দর! এত টাকা খরচ করতে গেলে কেন বলো তো? এই তো, গতকাল বিকেলেই, কৃত্রিম রাগে রাহিজা বলেছিল, মাঝে মাঝে—

কি? মঞ্জুর হেসে প্রশ্ন করল, কি বলো?

ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা তুমি ভুলে যাও!

ভুলে যাই? মোটেই না। চক্ষের নিমেষেই যেন আঠারোটা বছর কেটে গেল—তোমাকে তো কেবল কষ্টই দিয়েছি।

ছি, ছি। এমন কথা বলছো কেন।

কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলনি সেজন্য আমার বেশি আফসোস।

হয়েছে, এতবেশি আফসোস করতে হবে না। আংটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি, কেমন হলো তো? উচ্ছল ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে মুখ বাড়িয়ে আচমকা থেমে যায় রাহিজা, ম্লানমুখে বলল, ওহহো জানো? নীলা আমার আনলাকী স্টোন। বড় ভাবীর নীলার আংটি পরেছিলাম, তার একটু পরেই তো আমার পা গর্তে আটকা পড়েছিল!

কুসংস্কার—! একটু হেসে বলল মঞ্জুর আলম, এ কিছু না।

কিছু না, হয়তো এই ঠিক। কিন্তু তবু—তবু—

কি বলবে, বলো। মঞ্জুর হাসে এখনো একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে রাহিজা, যা বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষ গোপন রেখেছিলেন। বৌভাতের সময়ও কেউ জানতে পারেনি। শ্বশুর বাড়িতে আসার পরে ননদেরা ধরেছিল। হাসাহাসি ঠাট্টা মস্করা সোরগোল চলে বেশ কিছুক্ষণ। ঘোমটার ভিতরে কাঁদতে থাকে নতুন বৌ। বর এসে ধমক দিয়ে সব থামিয়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে টের পায় মঞ্জুর, এ বিষয়ে এখনো কিঞ্চিৎ অপরাধ বোধ আছে রাহিজার। তার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, বলছিলাম কি, তোমার চেনা স্বর্ণকার তো—এটা ফেরত দিয়ে রুবির আংটি নিয়ে এসো না। রুবি আমার লাকী পাথর!

কি ভাবল মঞ্জুর তারপর বলল, ঠিক আছে, দেখা যাবে। এখন পরো তো!

স্বামীর অনুভূতির মূল্য দিতে নীলার আংটি রাহিজা খুলে রাখলো না। রাত্রে স্বামীর মুখে মিষ্টি তুলে দেয়, এবং নিজেও খায় স্বামীর হাতের মিষ্টি। ছেলেমেয়েরা পাশের রুমে, দু'জনে জড়াজড়ি করে থাকে গভীরভাবে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ বলতে পারবে না, হঠাৎ একটি শব্দে যখন চোখ খুলে যায় তখন পাশে আরেকটি মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে না। অন্ধকার ছিল, হাতড়ে হাতড়ে দেখতে থাকে ; কিন্তু খুঁজে পায় না। তখন উঠে বসল। অন্ধকারে ছাড়ে কয়েকটি শব্দ, একি! তুমি কোথায় গেলে?

কক্ষসংলগ্ন দক্ষিণের ছোট বারান্দা ; কিন্তু একটি দরোজা খুলে যেতে হয় ঃ ওদিক

থেকে জবাব এল, ও রাহী, উঠে পড়েছ? এই যে আমি।

ততক্ষণে রাহিজা গিয়ে হাজির—দেখে ধূমপান করছে। সে বলল, এত রাত্রে উঠে সিগারেট টানছো, ব্যাপার কি?

রাহী, ঘুম আসছে না কিছুতেই, কি করবো! বলল মঞ্জুর।

হুঁ। রাহিজা একটা বেতের চেয়ারে বসে। ওর মনে পড়ে, সারা সপ্তাহ ধরেই তাকে কিঞ্চিৎ অস্থির ও অন্যমনস্ক দেখছে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার আভাষ দেয় না। ডান হাতে খোলা চুলের গোছা মুখের উপর থেকে সরিয়ে বলল, আজকে সারাদিন বেশ খাটুনি গেছে তোমার, তাই বোধ হয়।

চল যাই শুয়ে পড়ি। পায়ের চপ্পলের নিচে সিগারেটের শেষাংশটা পিষে ফেলে উঠতে উঠতে মঞ্জুর বলল, কাল আবার ভোরবেলা উঠতে হবে তো।

রাহিজা বুঝল, কেন ভোরবেলা—প্রতি শুক্রবারে বাগানে কাজ করে। গুরুতর সুরে বললেও, কোনো শুক্রবারেই আটটার আগে ওঠে না, এটাও ঠিক। কোনো কোনোবার জাগে অবশ্য সূর্যোদয়ের আগেই ; কিন্তু অনেকক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়া বদভ্যাস।

গতপরশু বিকেলে চা খাওয়ার সময় জিগগেস করেছিল, আচ্ছা, সারাক্ষণ কি অমন ভাবছো তুমি বলো তো?

চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, চায়ের কাপে চুমুক দিল, তারপর বলল, তোমাকে জানাতে চাইনি রাহী, আমার মনে একটি দুশ্চিন্তা ঢুকেছে।

কিসের দুশ্চিন্তা?

না, তেমন কিছু না। ভাবছি, ক্লিয়ারিংয়ের কাজটা ছেড়ে দেবো, এতে অনেক ফ্যাকড়া ঢুকে পড়েছে।

ঠিক বুঝলাম না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাহিজা বলল, ক্লিয়ারিংয়ের কাজ ছেড়ে দেওয়া মানে—বিজিনেস গুটিয়ে ফেলা। তাহলে করবে কি?

কি আর করবো। মঞ্জুর বলল, ভাবছি ঢাকায় চলে যাবো। ভাইবোনরা তো সব ঢাকাতেই আছে। ঢাকায় গেলে একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবো। আমার অভিজ্ঞতা তো ভালো।

এতকাল ধরে বলে আসছো চিটাগাঙেই সেটল করবে। সিডিএর প্লট পেয়েছ, বাড়ির প্ল্যান করতেও দিয়েছ, এখন হঠাৎ!

না, হঠাৎ নয়। অনেকদিন থেকেই সব দেখছি। কঠিন মুখে বলল মঞ্জুর, আই এ্যাম সরি টু সে রাহী—চট্টগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের পীঠস্থান ঃ কত কৃতীসন্তান জন্ম নিয়েছেন এইখানে—আজ সেই চট্টগ্রাম নষ্ট হয়ে গেছে! বাইরে চাকচিক্য কিছু বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ঘুণপোকা, হায়েনার রাজত্ব। আমি আর তাল সামলাতে পারছি না, আমার ধৈর্যের সীমা শেষ হয়েছে।

এরপর চুপ। এমন গম্ভীর হয়ে গেল, বিস্তারিত জানবার জন্য রাহিজা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি। তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে শুধু।

এখন প্রায় এগারোটা বাজে। মঞ্জুর তার পরিচিত লোকজনের সঙ্গে বাইরে চলে গেলে সে কিচেনে এসে বটি নিয়ে বসেছিল। চতুর্দিকে রান্নার সরঞ্জাম জিনিশপত্তর। মুর্গির ছাল ছাড়াচ্ছে ফালানি, কাজের মেয়ে, দেশের বাড়ি মানিকগঞ্জ থেকে এনেছিল। কালো, ভোতাভাতা। প্রায় বোবা। মুখ নিচু করে একটানা কাজ করে চলে। বয়স একুশ বাইশ। বিয়ে হয়েছিল। প্রথম মরা বাচ্চা বিয়োলে জামাই ওকে তালাক দিয়ে নিকা করে, তারপর আশ্বিন মাসে চলে যায় উত্তরে ধান কাটতে। মাঝে মাঝে, খেয়াল করলে, দেখা যায়, শীতল

পাটির মত ওর গাল বেয়ে পানি ঝরছে, মোটা কাপড়ের আঁচলে মুছে ফেলে। রাহিজা সব জানে, সেজন্য কিছু জিগগেস করে না। আলাপ করলেই বাড়বে ওর মনের দুঃখ, এই তার বিশ্বাস। নিজের দুঃখও তো সে কারুর কাছে প্রকাশ করে না। এত ভালোবাসে স্বামী, তবু ওর একটা গভীর দুঃখ আছে। সব কথা কেন খুলে বলে না। বাবা হেড মাস্টার ছিলেন, সেও তো ম্যাট্রিক পাশ ঃ এমন অপদার্থ কেন ভাবে যে কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

অনুভূতিটা আবার জাগতে থাকলে গলায় ঠেলে ওঠে অভিমান। পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে ভালোবাসে, চাক চাক কারে কাটছিল গফরগাঁওয়ের ডোপা বেগুন, হঠাৎ ঘ্যাচ্ করে বাঁ হাতের তর্জনীতে লাগল বটির ধারটা আর সে কাতরিয়ে ওঠে, উহ্—!

ফালানি তাকায়। দেখে আঙুল টিপে ধরেছে।

দুত্তর, আঙুলটা কেটে গেল! ঠিক আছে, তুই উঠিস্ না তো। উঠতে উঠতে বলল রাহিজা, আমি ডেটল দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে আসি।

চার ছেলেমেয়ে ড্রয়িংরুমের কার্পেটের উপরে ক্যারম খেলছিল। ওদের দু'একজন মা'কে দেখল ; কিন্তু কিছু বুঝতে পারলো না।

বাথ্রুমে ঢুকেছে। সিঙ্কে টেপের পানিতে কাটা আঙুলটা ধরে মনে মনে আবার শিউরে উঠেছিল, এও তো এক দুর্লক্ষণ!

একটার মধ্যে রান্না শেষ করে টেবিল লাগাতে হবে, সেজন্য জলদি আঙুলটা বেঁধে আবার চলে গিয়েছিল কিচেনে।

চারদিকে যা ঘটবার সে তো ঘটেই যাচ্ছে, মানুষের কি হাত আছে সেসবের উপর? শান্ত থাকাই ভালো।

আমরা বাবার সঙ্গে খাবো। বলেছিল বড় ছেলে সুমন ; আর তাকে সমর্থন করে ছোট বোন মিলিয়া, হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক।

কিন্তু একটা বেজে গিয়েছিল, এবং বাইরে থেকে কোনো কলও আসেনি। অন্যদিন, দেরী হতে পারে, বুঝলে একটু আগেই জানিয়ে দেয়। টেবিলে প্লেট সাজিয়ে রাহিজা বলল, তোদের বাবা জরুরী কাজে গেছেন। কখন ফিরবেন, ঠিক নেই। তোরা খেয়ে ফেল।

তোদের খাইয়ে আমি গোছলে যাবো। রাত্রে একসঙ্গে খাবো খন।

তখন ওরা আর আপত্তি করলো না। বসে গেল।

খাওয়া শেষ হলে ছোটরা ওদের ঘরে চলে যায়। বাসনবাটি সরিয়ে টেবিলটা মুছে দেয় ফালানি, তখন রাহিজা আলনা থেকে বেছে একটা শাড়ি আনছিল।

সময় প্রায় দু'টো বেজে পনেরো মিনিট। বারান্দার কাছে গাড়ির আওয়াজ। শাড়িটা না নিয়েই জলদি বৈঠকখানায় আসে রাহিজা, দেখল দু'জন অচেনা লোক তার স্বামীকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে আসছে। সে আর্তনাদ করে ওঠে, একি! কি হল!

চুপ থাকুন, কোনো আওয়াজ করবেন না। সঙ্গে আসছিল যে তৃতীয় ব্যক্তি সে ধমক দিল। রাহিজা থেমে যায় কাঁপতে কাঁপতে।

যন্ত্রণাকাতর মঞ্জুর আলমের মুখ, নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে মুখের উপর। ওরা তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিল বেডরুমের বিছানায়। পুরুঠোঁট, চোখজোড়া লাল-তৃতীয় ব্যক্তি রাহিজাকে একধারে ডেকে নেয় এবং গম্ভীর স্বরে বলল, কোনো আওয়াজ করবেন না। টু শব্দটিও না। মঞ্জুর ভাই কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন। আপনি নিশ্চয় নিজের মঙ্গল চান, চান ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা?

কোনো শব্দ করতে পারে না রাহিজা, তখন ওর পাজোড়াও কাঁপছে। মনে হল যেন সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যাবে।

সে লোকটা একটু থেমে আবার বলল, ডাক্তার ডাকবেন না। কেউ জিগগেস করলে বলবেন, হার্টফেল করেছেন। তার বড়ভাইও তো হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হৃদরোগ ওদের বংশগত।

বেশ দ্রুত বেরিয়ে গেল ওরা, গাড়িতে স্টার্ট ছিল। হর্ণ বাজলোনা, কিছু শব্দ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

পাজোড়া যেন বাতাসে আটকে ছিল, ওদের চলে যাওয়ার শব্দ মিলিয়ে গেলে, সজোরে টেনে স্বামীর কাছে যায়। আঁচলে মুখের রক্ত মুছিয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ কাতরধ্বনি করে ওঠে, ওগো তোমাকে কি করেছে ওরা? কি করেছে?

চুপ রাহী, চুপ। একটি কথাও বলো না। ওরা আমাকে শেষ করে দিয়েছে। মেরে ফেলেছে। আহ্-আহ্। নির্জন হোটেল, তেতালার কক্ষে নিয়ে যায়। প্রথমে জানতে চায়, কি খাবো। আমি বল্লাম, খানা। আহ্-আহ্! তবু ভালো খাবার নিয়ে এল। আমাকে খাওয়াল। তারপর বলল মরতে হবে। বললাম, আমি তো কোন দোষ করিনি। বলল, আমি নাম জানি। এটাই অপরাধ। কথা দিলাম। কখনো বলবো না। ওরা শুনলো না। জোর করে, জোর করে। একটা খাটে শুইয়ে দিল। আমার হাত পায়ের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে। ভারী কাঠের বার। আমার পাঁজরগুলো ভেঙে দিয়েছে। আহ্-আহ্। আমি মরছি, রাহী। আমি মরছি রাহী। আমি মরছি। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। ওদের কথা অমান্য করো না। তাহলে কেউ বাঁচতে পারবে না। আহ্-আহ্—

ওদের পাঠানো কয়েকজন কাফনের কাপড় গোলাপজল সুর্মাসাবান নিয়ে এসেছিল। গোসল দেয়। সন্ধ্যানাগাদ একটা ট্রাকে করে নিয়ে দাফন করে।

একান্তে তন্ময় হয়েছিল স্মৃতিভারে। রিসিভারটা ধরে আছে কানের কাছে, কিছুক্ষণে আওয়াজ ফিরে এল।

আমরা ঠিকই করেছিলাম, ভাবী। অনেক কাকুতিমিনতি করেছিলেন মঞ্জুর ভাই, আমরা শুনিনি। আট কোটি টাকার মামলা, বোঝেন তো? যে ব্যক্তির নামে চালান এসেছিল সে অস্তিত্বহীন ছিল। কিন্তু যারা আসল? থাক, থাক্। আপনি সব জানেন। আপনার একাউন্টে প্রতি মাসে পাঁচহাজার টাকা করে জমা হচ্ছে। আপনার ভরণ পোষণ। বাচ্চাদের লেখাপড়া। জানি তুলছেন না। কিন্তু কি লাভ। বুঝেছেন তো কেমন মহান ব্যক্তিত্ব ওরা, আপনার ক্ষতিপূরণ করে যাচ্ছেন। মানীলোকের মান রক্ষা হয়েছে, আপনারও শান্তি। এভাবেই চলুক। আপনার পরিবারকে চোখে চোখে রাখবো। অন্য কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। বিপদ হবে। ছেলেমেয়েরা যে যে ইস্কুলে আছে, সেখানেই থাকবে। এগেইন আই সে, ইউ আর এ্যান্ ইনটেলিজেন্ট লেডী, প্লিজ ডোন্ট ওপেন ইউর লিপস্ টু এনীবডি। ও ক্যা?

স্টপ ইট, স্টপ স্টপ। আই ডোন্ট ওয়ান্ট—

আহা, রাগ করছেন কেন। রাগ করবেন না।

কেন করবো না? আপনারা পেয়েছেন কি? রিসিভারে হাত কাঁপছে, রাহিজা বলতে লাগল, আপনারা—আপনারা বিনাদোষে আমার হাজব্যাণ্ডকে কিল্ করেছেন। আমাদেরকেও জিম্মি করে রেখেছেন। আপনারা কি ভেবেছেন সত্য বলে কোন জিনিশ নেই, পাপের শাস্তি নেই? আপনারা অন্ধকারের জীব। মানুষের চোখে ধুলা দিচ্ছেন, দিন্। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিচার বন্ধ করবেন কি করে? তিনি আপনাদের ধ্বংস করবেন। সময় ঘনিয়ে আসছে। তৈরি হোন। ইউ ডোন্ট কল্‌মি এনীমোর। আমি আর আপনাদের কোনো কথা শুনবো না। টেলিফোন কেটে দিচ্ছি।

আহা-হা, করছেন কি ভাবী? রাগের মাথায়—

নো, নো। আই স্যাল নট লিসেন টু ইউ।

প্রথমে রিসিভারটা ঝপ্ করে রেখে দেয়। পরক্ষণে কি মনে হতে সেটা তুলে তেপায়ার একধারে সরিয়ে রাখল। তারপর তার ধরে হেঁচকা টান দেয়। প্লাগ সিস্টেম টেলিফোন। টানে জোর লাগলে প্লাগপয়েন্টের কাছে গেল এবং তার কাছাকাছি, অংশ ধরে সজোরে খুলে ফেলল। প্লাগ সমেত তারটা ছুঁড়ে মারে মাটির উপর। রিসিভারটা বক্স থেকে বিচ্ছিন্ন, প্লাগও বিচ্ছিন্ন। আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবার একধারে, মাঝখানে নয়।

কতক্ষণ কেটে যায়, জানে না, ভোর হয়ে আসে রাত। ঘরময় নিঝ্ঝুম নীরবতা। একসময় মৃদু খুট্খাট্ ধ্বনি। সেকি স্বপ্নের ভিতরে, না এটা বাস্তব? তাও বোঝে না। আস্তে করে চোখের পাতা খুলে গেছে, মনে হল তাকিয়েছে। ঘরময় তেমনি নীলাভ আলো, আবছায়া। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, তবু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। এ পাশের কম্বলটা নিজ গায়ের উপরেও টেনে নিয়েছিল তার প্রান্ত থেকে তাকিয়ে দেখছে। হুঁশিয়ার চাউনি। নিজের পৈথান ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় কিছুদূরে দেয়ালে লাগানো মাল্টিপ্লাগের দিকে—যে দৃশ্য চোখে পড়ে সে ভীষণ শিউরে উঠল ; একটা লোক! হ্যাঁ, একটা লোক, জ্যাকেট পরা, চুল উস্কোখুস্কো ; আবছায়া অন্ধকার, তবু দেখতে পাচ্ছে তার পাশে একটা টুল বক্স। তার পিছনটা দেখা যাচ্ছে, দেয়ালের দিকে মুখ করে, নিঃশব্দে, সে কাজ করছে! মাথাটা মনে হল চেনা-চেনা এবং কাঁধটাও। ধমনীতে শৈত্যপ্রবাহ, আতঙ্কে সে জমে গেল। কিন্তু নিরুপায়। গলার ভিতরটা জমাট বেঁধে আছে, ইচ্ছে করলেও চেঁচাতে পারবে না। তার হাতে যেন দস্তানা পরা, প্লাগপয়েন্টের দিকে নিয়েছে। খটাস্ করে একটু শব্দ হল। তারপর সে উঠে পড়ে।

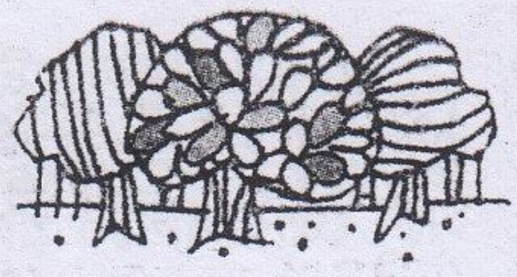
ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, স্থির হয়ে, একটা ডবল আরেকটা সিঙল দুটো খাট পাশাপাশি। খাটের দিকটা দেখছে। টুল বক্সটা তুলে নিয়েছে বাঁ-হাতে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এদিকে আসে, যেখানে তেপায়ার উপরে টেলিফোন। রিসিভারটা পাশে ছিল, সেটা তুলল। কানে লাগিয়ে পরখ করে। পোঁ-আসছে একটানা আওয়াজ। ঠিকভাবে রাখল রিসিভারটা, যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। একদৃষ্টে এখন যেন দেখছে বিশেষ করে ওকেই ঃ মুখের উপরে কম্বলটা টেনে নিয়েছিল, তার ভিতর থেকে অনেকটা নিশ্চলভাবেই ধারের অংশটা ফাঁক করে। হ্যাঁ, আন্দাজ ঠিক। মঞ্জুর আলম, ওর স্বামী! দাড়িগোঁফ ভর্তি চেহারা, তবু চেনা গেল। একি! খাটের কাছে আরও কাছে আসছে ধীর পদক্ষেপ নিয়ে। চার ছেলেমেয়ে, সারি সারি চারটি মুখ। আবছায়ায় জ্বল্জ্বলে চোখ, শ্বাপদের মতো। দেখছে, দেখছে। সেও, কম্বলের অংশটা মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে স্থির হল, যেন ঘুমের ঘোরেই। এখন দেখছে, ওর মুখটাও। দেখছে দেখুক। মুখগুলো দেখে চলে যাক্, চলে যাক্। কেউ জেগে উঠলে, বিপদ হতে পারে। মুখটা আবার ভিতরে নিল। কিছুক্ষণ পর, আবার বার করে। ঘরটা ফরসা-ফরসা লাগছে। শোনা যায় পাখির কলকাকলি, এবং তার কিছুক্ষণ পর আগ্রাবাদ জামে মসজিদের মি'নার থেকে ভেসে আসা ফজরের আজান, আল্লাহ হু আকবার—! আল্লাহ হু আকবার—

আশেপাশে মানুষের কণ্ঠস্বর, তবু ভয়টা কাটে না ঃ সারাগায়ে কম্বল, বালিশে মুখ গুঁজে থাকে।

সকাল হলে, উঠে দেখল মেঝের উপরে পড়ে আছে প্লাগপয়েন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন টেলিভিশন সেটের প্লাগ, টেলিফোনের প্লাগ তেমনি লাগানো আছে এবং খাটের কাছাকাছি, তেপায়ার উপরে রাখা সেটে নীলরং রিসিভারটা বসানো আছে ঠিকমত, ভোরের আলোতে ঝক্ঝক্ করছে।

সেপ্টেম্বর ১৯৯২।

বাতাসের চোখ



এখনো এখানে চেকনাই বাড়ন্ত মহানগরী দোতলা তিনতলা বহুতলা ভবন সাজাতে বুলডজারে সমানীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেনি যদিও নীলনকশায় তার সংকেত উজ্জ্বল এবং পুরাতন বাড়িঘরগুলো ও তাদের ফাঁকে ফাঁকে কিছু গাছপালাও টিকে আছে। অবশ্য বড়রাস্তা উজানঘাট। সেখানে হল্লাবোল। যানজট, শানশওকতও যথেষ্ট। কিন্তু এটা ভাটির এলাকা, যার সরু গলিপথগুলো বিশাল বিলের ধারইস্তক আঁকাবাঁকা। সেসব ঘিঞ্জি বস্তি। তবে তার মাহাত্ম্যটাও কম ঈর্ষনীয় নয়—যে কোনো জায়গায় কষ্ট করে দাঁড়ালেও চোখে পড়ে বর্ষায় পানাভরা ও গ্রীষ্মে এবড়োখেবড়ো জলাভূমির ওপরে গৌরবমণ্ডিত হোটেল সোনার গাঁও এবং নবনব মনোরম বাণিজ্যিক প্রাসাদ বুকে গরবিনী উদ্ভিন্নযৌবনা কাকরাইল সরণী। একটি লেন কিঞ্চিৎ চওড়া, যাতে ছোট গাড়ি ও জীপ চলতে পারে।

তার উপরেই বস্তির কাছাকাছি এই ছোট বাড়িটা, যা সেকেলে হলেও নেহাৎ মন্দ না। একতলা, কিন্তু সুপরিকল্পিত ছিল। এখানে পা দিলেই বুঝা যায়, সৌখিন ছিলো গৃহকর্তা। প্রমাণ, দুটো সুরম্য উইং। উপরন্তু দেয়াল ধরে লাগানো নির্বাচিত বৃক্ষরাজি ও দক্ষিণের বাগান।

আশে পাশে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত গরীবগোবরা পরিবার, কোথাও কোথাও বাঁশের বেড়ার লম্বা একচালাতে মিস্তি-মজুররাও বাস করে, তবু এটাকে বিচ্ছিন্ন কোনো অজপাড়াগাঁয়ের অংশ ভাবা যায় না। এখানেও বহু ঘরেই রেডিও টুইনওয়ান টেলিভিশন, এখানেও জীনসধারী নৌজোয়ান গ্রুপ আছে, এবং কোনো কোনো পঞ্চদশী ষোড়শী বিখ্যাত বিদ্যালয়ের পোশাক পরে ইসকুলে যায়। কোনো কোনো তরুণী সরুগলির ভিতর থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসেন, বুঝা যায় চাকুরী করতে চলেছেন।

প্রথম দেখে নাক সিঁটকিয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে, বাড়িটাকে ভালোবেসে ফেলেছে নীলা, যদিও কারণগুলো কি, সব বুঝে না। হতে পারে, একটা নিরুদ্বেগ অবস্থানের নিশ্চয়তা পেয়েছিল, হতে পারে এখানে থেকেই ছেলেমেয়ে দুটোকে বড় করে তুলেছে ; এমনো হতে পারে এখানে দীর্ঘদিন ধরে কাটাচ্ছে সময় যদিও শূন্য শূন্য, কিন্তু সে শূন্যতাও স্মৃতিময়। অথবা হয়তো, এসব কিছুই নয়। কোনো বাড়িওলা ভাড়া চায় না, এটাই বা কম কি। বিশেষ আজকাল, মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনো কারণে এ বাড়িটা যদি ছেড়ে যেতে হয় ভাবতেই বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে ওঠে! অথচ এতো সত্য যে, মানবজীবন অনিশ্চিত। এক জায়গায়, একজন কতকাল আর থাকতে পারে? আছে রোগ শোক, আছে মৃত্যু। জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনেও সব ছেড়ে চলে যেতে হয়।

তবে এখনো আছে, এবং হয়তো থাকবেও। রাজউক যদি উন্নয়নকল্পে সমগ্র এলাকাটা নিয়ে যান, বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চয়ই দেবেন।

আশানুরূপ কিছু পায়নি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলো এ একটা সাধারণ অভিযোগ ; কিন্তু এই থাকার ব্যবস্থা, এই বাড়িটা যে সরকার বরাদ্দ করেছিলেন, সেজন্য সে খুবই কৃতজ্ঞ। আষাঢ়ে শ্রাবণে অঝোর বর্ষণ নামে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ঝড়তুফানের তাণ্ডব। কিন্তু প্রতি ভোর থেকে সুশীতল মলয়সমীর যে ঝিরিঝিরি বয় নিম-নারকেলের পাতা নাড়িয়ে, সেটাই যেন আশীর্বাদ। গলিঘুপচি ছিদ্রপথ ঘুরে কতদিক বেঁকে বাতাস আসে! বাতাসের চোখ যেন

নজর দিয়ে চলে, দৃষ্টির জাদুতে ফুল ফোটায়, নড়ায় এলোচুল। আঁচল দোলায়।

এককালে কবিতা লিখত, উপমাটা ভালো লাগল। একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে, হালকা গোলাপী লিপস্টিক বোলাতে গিয়ে একটুখানি স্মিতহাসি খেলে যায় ঠোঁটের উপরে।

ও মাই গড্, আম্মী! হঠাৎ মেয়ের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে নীলা, বাঁপাশে তাকালো।

কি হয়েছে? নীলা প্রশ্ন করল, জায়নামাজ থেকে তুই উঠে এলি কেন?

ও আম্মী। কি বলবো! একটু দূর থেকে মায়ের সাজগোজ, আপদমস্তক একবার দেখে নিয়ে সোমা মন্তব্য করল, ইউ লুক সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল! রিয়্যালী, তোমার বয়সটা অন্তত একযুগ, অর্থাৎ বারো বছর কমে গেছে! আর এখন তুমি ছাব্বিশ বছরের তরুণি!

মায়ের বয়সের হিসাবটা দেখি খুব টনটনে আছে। আঁচলটা টেনে ঠিক করতে করতে মেয়েকে ধমক দিল, যা যা নামাজ শেষ করগে। আর শোন্, মুরুব্বিদের নিয়ে কখনো ঠাট্টা তামাশা করবি না!

বারে! আমি ঠাট্টা তামাশা করেছি নাকি আম্মী? অভিমানের সুর সোমার কথায়।

আবার? তোকে না বলেছি আমাকে আম্মী আম্মাজান, নাম্ এসব শব্দে ডাকবি না?

হ্যাঁ, বলেছো। বলেছো শুধু মা ডাকতে। ঠিক আছে, তাই ভালো। বেশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মা, তুমি তো জানো আমি বড় হয়েছি। একাত্তরে আমার জন্ম। আমার বয়স একুশ পেরিয়ে যাচ্ছে।

তাতে হয়েছে কি শুনি? মেয়েকে দেখতে দেখতে বললো নীলা। সোমা বলল, হয়নি কিছু। তবে আমি মাস্টারস ফাইনালের ছাত্রী, ইউনিভারসিটিতে পড়ি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি, অনুভূতি বেড়েছে। আমি কি আমার আপন মা'য়ের প্রশংসাও করতে পারবোনা? আমার কথা শুনছো তো?

হ্যাঁ, শুনছি। আরও কি বলবি বল্। বলে যা সব।

সোমা একটু থেমে বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইনাল ইয়ারে যেসব মেয়ে পড়ে, তাদের প্রত্যেকের লাইন আছে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু হয়। গার্জিয়ানরা যে তাদের অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে সেটা হাস্যকর।

শান্তভাবে বলল নীলা, সোমা এসব কথা এখন তুই কেন আমাকে বলছিস্, আমি তা বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে। আই এ্যাম সরি। তুমি তো এখন সেমিনারে যাচ্ছ।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তুই জানিস, কর্মজীবী মহিলা সংসদের আজ বার্ষিক সম্মেলন। বিশ্বের কুড়িটা দেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি। অনেক রাষ্ট্রদূত কূটনীতিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। একটু কী ভাবল নীলা, তারপর বলল, একটা ভালো শাড়ি পরেছি, আর তুই কিনা—! ঠিক আছে, আমি যাবো না।

ছি ছি মা একি কথা বলছো! আমাকে এত ছোট ভেবো না, তোমার পা'য়ে পড়ি! কাছের চৌকিটাতে বসে পড়েছিল সোমা গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে। কাতরানির মত সে বলল, আমি সত্যই তোমার প্রশংসা করছিলাম, মা। তুমি সুন্দরী ছিলে, এবং এখনো সুন্দরী। বাবা ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক, রাতবিরেতে ফিরতেন। তবু তোমরা ছিলে সুখী দম্পতি। আমি সব জানি এখন। অমন ফেরেশতার মতন চরিত্র, বাবাকে রাজাকার বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গেল। তিনি আর ফিরলেন না। অদ্রি দু'বছরের আর আমি তো তখন তোমার কোলে। আত্মীয়দের সঙ্গে তুমি গ্রামে পালিয়ে গেলে। আমাদের দু'জনকে বাঁচিয়ে রাখতে কত কষ্ট

করেছো তুমি। সেসব ঘটনা গোপন রক্ত দিয়ে লেখা, সেসব আমরা কেমন করে ভুলবো। তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করে দাও মা, ক্ষমা করে দাও। আমি আর অমন কক্খনো করবোনা, কক্খনো না।

অনেকটা যেন সম্মোহিত, নীলার চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে পানি পড়ছিল। হাত বাড়িয়ে মেয়েকে টেনে নিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরল। আবেগজড়িত স্বরে বলল, ভুলে যা মামণি, সব ভুলে যা। এসব ভুলতে না পারলে আমরা মরে যাবো, আমরা বাঁচবো না।

এমন সময় বাইরে আওয়াজ। গেট খুলে রাখা গলিপথ পেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণে ঢুকেছে একটা মাঝারি আকৃতির টিপটপ শাদা গাড়ি। সময় ঠিক আছে। বলা যায়, কাঁটায় কাঁটায়। ওরা জানত, কে আসবে। লিফ্‌ট দিতে এসেছে সানি, পুরোনাম সানোয়ার আলী চৌধুরী। জনপ্রিয় ট্রাভেল এজেন্ট। পরলোকগত জার্নালিস্ট বিখ্যাত মনাভাই, মানে আনোয়ার আলী চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র। চটপটে, বুদ্ধিমান ছেলে। কথায় কথায় হেসে ওঠা ওর বদভ্যাস। বেশ কেতাদুরস্ত। প্রায়ই কালো অথবা নীল রং স্যুট পরে থাকতে দেখা যায়, এর কারণ বড় বড় কোম্পানীর বাঘা ম্যানেজারগণ ওর ক্লায়েনট। তাঁরা প্রায়ই বিদেশ করেন। পুবদিকে সিঙ্গাপুর হংকং ব্যাঙ্কক এমনকি টোকিও, পশ্চিমে কোলকাতা বোম্বাই এমনকি লন্ডন নিউইয়র্ক। এখন তেজারত ক্রমেই বাড়ছে, পরিধি বিশ্বজোড়া। এদের টাকাপয়সার তেজও বেশি। যাত্রার আগের দিন স্কাইবোর্ষ ট্র্যাভেলস এ একটা টেলিফোনই যথেষ্ট, দরকারী সবকিছু ম্যাজিকের মতো হয়ে যায়। ফলে ভিসা করে দেয়ার দায়িত্বও নিয়েছে। ওর বাপজান ছিলেন সোমার বাবা আবুল মোমেন খন্দকার এর পিয়ারা দোস্ত। এক টেবিলে কাজ করতেন। শুধু তাই নয়, নাকি একমুখে কথা বলতেন খাওয়াদাওয়া করতেন এবং বিপরীত কম্মটিও নাকি একই সঙ্গে সম্পন্ন করতেন!

শব্দ শোনা সত্ত্বেও নীলা নির্বিকার। সোমা যেন শঙ্কিত হল। হাত ধরে বলল, একি! তুমি উঠছোনা কেন মা?

হাত ছাড়িয়ে নেয় নীলা, বলল, হয়েছে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না।

আহ্‌হা তুমি কি ভুলে গেছ সানিভাই ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি, পিনপয়েন্টে কাজ করেন? তোমাকে নামিয়ে দিয়ে হয়তো অন্য জায়গায় দৌড়াতে হবে। এরকম না হলে ব্যবসাতে উন্নতি হতো না।

কথা শেষ হওয়ামাত্র হাজির। তেমনি অফিসিয়াল পোশাক। চোখে সানগ্লাস, হাতে একটা কাগজের ব্যাগ। ওরা তাকাতেই বাড়িয়ে দেয়, বলল, সোমা, এই নাও তোমার থ্রিলার। এটাই শেষ চালান। তোমার চাহিদা এই জাতীয় বইয়ের বাজারে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে। এরপর নিউইয়র্ক ভরসা!

ইস্, বলে কি! থলের ভিতর থেকে বার করতে করতে সোমা বলল, বাহ্, অনেকগুলো চমৎকার আছে দেখছি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ সানিভাই। কিন্তু তোমাকে আর কষ্ট দেবো না।

সে কি! তোমার দেওয়া কষ্টই তো আমার সুখ! সহজভাবে উত্তর দিল। আয়নার কাছ থেকে তাকায় নীলা।

না, না। আমি আরও অপূর্ব জিনিশ আবিষ্কার করেছি—তার কাছে থ্রিলার ডিটেকটিভ মিস্ট্রি ক্রাইম কিছু নয়! অনেক পড়েছি, আর পড়বো না। তাই নিয়ে এখন সময় কাটবে আমার!

তোমার কথার রহস্য আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা!

তুমি কি বুঝবে, সব ছাইভস্ম। মজা করাই ওর অভ্যাস। ভিতরে ভিতরে নিজেকে

সামলে নিয়েছিল নীলা, ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে চামড়ার কালো ব্যাগটা হাতে নিতে নিতে বলল, তোমাকে তো চা সাধলাম না।

জ্বীনা, লাগবেনা। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি যাবো মতিঝিল, বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক। এখানে যখন আসি, আধঘণ্টার কনসেসন নিয়ে আসি সর্বদাই। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে সানি বলল, এখন তা শেষ। ওক্যা সোমা, মনে হয় কিছু দারুণ। তোমার নতুন আবিষ্কারের গল্প সময় নিয়ে শুনবো।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমার মনে হয়, তোমার খুব ভালো লাগবে। ওহ্‌হো মা, আমার এখানে আজকে মিটিং, তোমার মনে নেই?

আছে। অনুভূতিগুলো ক্রমেই ঝরঝরে হয়ে উঠছিল, ব্যাগ থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে। মেয়েকে দিয়ে বলল, এই রাখ্। আর শোন্ বলেছিলে বিকালে রিহার্সল আছে। আমি অদ্রিকে ফোন করবো, সে না এলে একলা যাবি না।

মায়ের হুকুম শোনামাত্র সাপের মতো ফোঁস করে উঠতে চাইলো সোমা, কিন্তু সানির চোখে চোখ পড়তে থেমে যায়। শান্তভাবে বলল, আচ্ছা।

ওরা চলে গেলে নিজকক্ষে এসে বালিশে হেলান দিয়ে বসে সোমা, অনেক বইয়ের মধ্যে একটা বই ঃ তার মধ্যে একটা খাম পাওয়া গেল।

অপরাহ্নের দিকে জমজমাট বৈঠকখানা ঘর, বন্ধু বান্ধবী সবাই এসেছে। একসঙ্গে কলকাকলি। ফরমাল সভার আগে এক কাপ করে সহজ চা। খাচ্ছে, আর আলাপ করছে।

আমার কিন্তু অন্যরকম অনুভব। চিবুকটা একটু দুলিয়ে বলল সোমা, হ্যাঁ, একটু অন্যরকম।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তপু মন্তব্য করল, হ্যাঁ, তাতো হবেই। তুমি তো একটা জ্বলন্ত ভিনি ভিডি ভিসি। এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। একটা মাত্র নাটকে অভিনয়, তা'ও পার্শ্বচরিত্রে, একেবারে মাত করে দিলে। পাগল হয়ে গেল রঙিন কাগজগুলো। ভাগ্যিস, তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল! আমরা গৌরাবান্বিত! আমি তো গর্ব করি।

বাপস্, রাজনৈতিক নেতা হবে নাকি? ভাষণ দেয়ার কায়দা শিখেছ তো মন্দ না। সোমা বলল, না, বাবা। ওসব কিছু না।

তাহলে ব্যাপারটা কি ঝট্‌পট বলেই ফেল্ না, এত ভনিতা করছিস্ কেন। রীমা রীতিমত চটে উঠল, অন্যদের চাইতে ওর সখিত্বটা গভীরতর, হয়তো তাই।

আরও সোজা হয়ে বসে সোমা, মুখের উপর থেকে একগোছা চুল সরিয়ে স্পষ্ট করে বলল, বেশ বলছি। আমার সোজা কথা। নিজের পা'য়ে নিজে দাঁড়াবো, এই আমার মূলনীতি। শহীদ পরিবার একাত্তরের প্রজন্ম—এসব আমার কাছে আর ভালো লাগেনা, মনে হয়, খুব মেকী। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগুলো ব্যবহার করে। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সঠিক স্বীকৃতি প্রয়োজন, এটা সত্য, কিন্তু একালে, আমরা এখন যেন এক বাণিজ্যিক পণ্য।

কিন্তু এটা কি অস্বীকার করতে পারো, শহীদ সাংবাদিক আবুল মোমেন খন্দকারের কন্যা বলেই তুমি টিভিতে চান্স পেয়েছিলে? এবং এখন, ধারাবাহিকেও-

আই প্রটেস্ট ইট মঞ্জুর-আমি এর প্রতিবাদ করি। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে মাহবুব আরা সোমা ওরফে সোমা খন্দকার।

মঞ্জুর বলল, তা করতে পারো। কিন্তু সব কাগজেই এরকমই তো ইঙ্গিত দিয়েছে।

ঠোঁটমুখ কাঁপছে সোমার, উত্তর দিল, কিন্তু তুমি কি জানো এই সমস্ত রঙিন কাগজ

একেকটা জঞ্জাল? বাজারে যার কাটতি হবে, ইচ্ছেমতো তাই লেখে। দিনকে রাত বানায়, রাতকে দিন।

আমার মত উল্টো। ধামাচাপা দেওয়া সত্যকে প্রকাশ করে বলেই—

মঞ্জুর থামো। ওকালতি শুনবোনা। আমার ব্যাপারটা সোজা। আমার ক্যামেরা টেস্ট হয়েছে, আমি অডিশন দিয়েছি। বিশেষজ্ঞ বিচারকগণ—

ঠিক আছে, কি বলবে বুঝেছি। ওটা বাদ দিলাম। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও, সকলেই আমরা শোবিজে যাওয়ার জন্য ছুটোছুটি করছি কেন? আমাদের পিতারা কি এজন্যই প্রাণ দিয়ে গেছেন?

সবাই যাচ্ছি কোথায়? যাদের যোগ্যতা আছে কেবল তারাই তো যাচ্ছি।

শান্তশিষ্ট নিউটন। সহজে কথা বলে না। বললেও, অল্পে সারে। সে দাঁড়াল এবং সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গুরুতর ভঙ্গিতে বলল, ভেবে দ্যাখ তোমরা, একাত্তরের প্রজন্ম সংগঠন আমরা করতে পারি কি না পারি, তার চেয়ে বড়, সোমা যা বলেছে—আমাদের যেটুকু যোগ্যতা সেটুকুই আসল। আমাদের—

ঠিক তাই। ওকে বেশি বলতে দিল না সোমা, এলানো লম্বাচুলের মাথাটা আরেকবার নাড়িয়ে সে বলল, আর সেজন্য আমি ঠিক করেছি আমি গোপন করবো আমার আত্মপরিচয়। আমার ইতিহাস স্মরণ করবো না। স্রেফ নিজের পরিচয়ে আমি আমার নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করবো।

এবার একসঙ্গে প্রায় সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। নিউটন কেবল বিষণ্ন নির্বাক। সে বিড়বিড় করল, আমাদের ইতিহাসকে ভুলে যাবো, তা কেমন করে হয়? আমাদের ইতিহাস তো গৌরবজনক।

ওর কথা শুনলো না কেউ। পোর্টেব্‌ল্ ক্যাসেটপ্লেয়ার নিয়ে এসেছিল সুজন, চাবি টিপে দিয়েছে। বাজনা বেজে উঠল, দ্রাম্, দ্রাম্। হাততালি দিতে দিতে নাচতে শুরু করে কয়েকজন।

এখানে অনেকজন। নাটকের গোট দুই পরিবার। প্রযোজক, সহকারী। নতুন সিরিজের একটি ডিসকো নাচের দৃশ্যের মহড়ায় সোমা যখন অংশ নিচ্ছিল তখন দশটা বেজে পনেরো মিনিট। এমন মৌজ, ভুলেই যায় বাসায় ফেরার কথা, বিশেষত যখন রাত।

এত দায়িত্ব তবু সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় ফিরেছিল বাসায় হোটেল সোনার গাঁও থেকে ব্যবহারের জন্য সৌজন্যে পাওয়া একটি গাড়িতে করে। এটাই নিয়ম করেছিল, রাত হয়ে গেলে জরুরী অবস্থায়ও বাইরে থাকবে না নিজের কড়াকড়িভাবে পালন করে। ছেলে এবং মেয়ের উপরেও একই নির্দেশ। কিন্তু ওরা ভাঙছে। ভাঙছে, কেবল ভাঙছে।

সম্মেলনের হরেক রকম শব্দ থেকে এসে দেখেছিল বাড়িময় নিস্তব্ধতা। গ্রাম থেকে এসেছে, রান্নাবান্না করে বঙ্গার মা। কথা প্রায় বলেই না। নীরবে কেবল কাঁদে। কাপড়ে চোখ মোছে। কিচেনের সঙ্গে ছোট্ট কামরা। সেখানে কাঁথাবালিশ। দিনের আলোতে, বাড়ির নিচে সহজে আসতে চায় না। সব কক্ষ শূন্য।

তার কাছে নিজেই গেল, অদ্রি এসেছিল কিনা জিগগেস করলে মাথা নাড়ে। এককাপ চা দিতে বলে। তারপর নিজের কামরা। আয়নার সামনে বসে ক্লিপ কাঁটা খুলতে খুলতে ভাবে, নিশ্চয় রিহার্সেলে গেছে সোমা। অদ্রি আসেনি। কার সঙ্গে গেল? টিভিতে টেলিফোন করা যাক্। কিন্তু রিসিভারটা তুলেও আবার রেখে দিল। প্রথম দিকে নিজেই নিয়ে যেতো মেয়েকে, কিন্তু এখন, নানাকারণে, তা পারে না। এরকম খবরদারি মেয়ের যে পছন্দ নয়, তা

তো পরিষ্কার।

কি বলবে বলো মা, আমি শুনবার জন্য প্রস্তুত। প্রায় পৌনে এগারোটায় বাসায় পৌঁছে সোমা, নিজকক্ষে এসে দাঁড়াতে দেখে জুতো খুলতে খুলতে বলল, অনেকটা নির্বিকার।

নীলার ললাটে ভ্রুকুটি। অনেকদূরে এগিয়ে গেছে মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে কথা জোয়ালো না। কিন্তু একটু পরে চাপা রাগে ফেটে পড়ল, চুরি তো চুরি আবার সিনাজুড়ি, মানা করেছিলাম, তবু একলা কেন গেলে, বল্। আবার ফিরেছিস্ রাত এগারোটায়। এত দুঃসাহস কেন? কেন এত দুঃসাহস, শুনি?

দুঃসাহস! দুঃসাহস আবার কি। এটাই তো স্বাভাবিক। একশো একটা মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিরিজে আসার জন্য। আমি যদি সময় রাখতে না পারি, বিনা নোটিশে বাদ দিয়ে দেবে। শান্তই ছিল, এবারে কণ্ঠস্বরে একটু তীব্রতা এনে বলল, তাছাড়া আমি যে একটা কচি খুকী নই তাকি তুমি স্বীকার করো না মা?

আমি জানি, তুই সাবালিকা হয়েছিস্। কিন্তু এটাই কি শেষকথা? তোর জানা উচিত, মা হিসেবে ছেলেমেয়ের মঙ্গল কামনা করা আমার কর্তব্য। রোজ রোজ, বাইরে কত দুর্ঘটনা ঘটছে। সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকবে না তোরা দুজনেই কথা দিয়েছিলি। এখন দু'জনেই আমাকে অমান্য করছিস্। অগোচরে বিদ্রূপও করিস্। পানি জমে উঠছিল চোখের কোণে, নীলা তা মুছলোনা, বলে চলল, তোরা ধ্বংসের পথে চলেছিস, পতঙ্গের পাখা ওঠে মরবার জন্যে। আমি একা কেমন করে রুখবো, কতদিন রুখবো। আমি একটা ঘূর্ণিঝড় দেখছি। একটা প্রবল সাইক্লোন। তোদের উপর বাতাসের চোখ পড়েছে, বাতাসের ভয়ঙ্কর চোখ! বাতাসের চোখ কেবল জাদু জানে না, মৃত্যুও আনে।

একটু চুপ থেকে মায়ের বক্তব্যটা বুঝবার চেষ্টা করে সোমা, তারপর মুখ তুলে অকাতরে বলল তাহলে,—তাহলে তোমার উপরেও তো পড়েছে বাতাসের চোখ!

কি বললি বেআদব মেয়ে? আমার উপরেও পড়েছে বাতাসের চোখ? ক্রোধে ফেটে পড়ে নীলা।

হ্যা, বললাম তো। নিজের সম্পর্কে তুমি ভেবে দ্যাখ, এর বেশিকিছু আমি বলতে চাই না।

মেয়ের চুল মুঠি করে ধরে চড়চাপড় দিতে পারত, কিন্তু নীলা হতবাক। যেন নিমেষে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

অনেক কষ্টে একটা ঢোক গেলে। তারপর পা টেনে টেনে নিজ কামরায় এল। মাথার ভিতরটা ভীষণ ভোঁ ভোঁ করছে।

খাটের ধারে বসে পড়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলো না। বিছানায় পড়ে বালিশ টানে, মুখ লুকায় তার মধ্যে। কিসের ইঙ্গিত করেছে সোমা, কিসের ইশারা?

একজন সম্মানিতা অধ্যাপিকা, কতটুকু রাখে সে মায়ের খবর? সেকি জানে না তার চরিত্রের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ? ডানাকাটা পরী না হলেও, দেখতে শুনতে মন্দ ছিলো না। আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, তখন তো পূর্ণ যৌবন। বছর দুয়েক পর থেকেই কত ভালো-ভালো ঘর থেকে প্রস্তাব এসেছে, অভিভাবকদের চাপও কম ছিলো না। কিন্তু সব প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের সুখশান্তি, নিজের ভবিষ্যৎ। চিন্তাও করেনি। আল্লাহ্ দয়া করে দিয়েছেন, চাঁদের টুকরো দুটি ছেলেমেয়ে। এই তো যথেষ্ট। বিয়ের সময় মাত্র ম্যাট্রিক পাস ছিল। প্রাইভেটে আইএ-বিএ দিল, তারপর এমএটাও করল বাংলায়। যোগ্যতা নিয়েও শত শত বেকার। চাকরিটা যে পেয়েছিল, তাও সরকারী অনুদান।

একজন তো ছেলেমেয়েরে পুরোদায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। তবু রাজী হয়নি।

স্মৃতি কি সর্বদাই বিশ্বাসঘাতকতা করে? না, না। করে না, করে না। গ্রামের ইস্কুলের হেডক্লার্কের মেয়ে। মাহফুজ আরা নীলা ছিল। তখন বয়স আর কত। চৌদ্দ বছর, প্রায় বাল্যবিবাহ। বিয়ের শাড়ি জেওরে খুবসুরত করে সাজিয়েছিল, হয়েছিল মাহফুজ আরা খন্দকার।

স্বামীর সঙ্গে প্রথম প্রেম, স্বামীর মৃত্যুতে তার সমাপ্তি। এইটুকু শুধু মনে হোত। মীরপুর বধ্যভূমির ছবি দেখেছে। তার মধ্যে শহীদ বুদ্ধিজীবীগণ। কিন্তু মোমেনের লাশ কখনো দেখেনি।

মোমেন মরে গেছে, তাও কখনো মনে হোত না। নাইট ডিউটি থাকত। এমনিতেও রাত বারোটার পর কড়ানাড়া শুনে দরোজা খুলে যে চেহারা দেখত, এখনো তো দেখে, মাঝে মাঝে। এটা ভুল, এটা সত্য।

ছায়ার মধ্যে আসে, আসে অন্ধকারেও। পাশে বসে আদর না করলেও, ফিস্‌ফিস্ করে কোনো দুর্যেগের রাতেও সে যদি বলত, নীলা! তুমি সুখী হও। আমি আর আসবোনা। আর আসবোনা আমি, কিরা কাটছি।

কিরা, অঙ্গীকার। অদ্ভুত, আজগুবী। তুমি কি এসেছিলে যে আসবে না, বলছো? আর সুখ! আগে তো জিগগেস করতাম সুখ চাই কিনা, না চাইতেও সুখ দিতে! এসব থাক্। ভাগ্যটাই আসল। পঁচিশের রাতে নিজের চোখে দেখলে হত্যাকাণ্ড। তিনদিন চেষ্টা করে আমাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলে। প্রথম সন্তান, কোলে আমার। মাত্র দেড়বছর। একবার তুমি অবশ্য গেলে। কিছু টাকা দিলে। আর বললে, আমরা সংবাদপত্র-অফিস ছাড়বোনা। ডিউটি করবো। যতই সেন্সর হোক, খবর ছাপাবো। মিথ্যা সংবাদও প্রকাশ করবো। মিথ্যার ভিতরে থাকবে সত্য। বন্দুকের মধ্যে বারুদের মতো। শত্রুর বুকে থেকে শত্রুকে পদাঘাত। এটাই হবে আমাদের যুদ্ধ, গোপন যুদ্ধ। লোকে ঠিকই বুঝে শেষে, হে হে! চৌদ্দই ডিসেম্বর শেষরাত। ঘাতকেরা। এল। ঘুম থেকে তুলল তোমাকে। বলল, কিছুনা কেবল একটু হাজিরা দিয়ে আসবেন। চোখ বেঁধে বাসে তুলল। তোমার আত্মত্যাগে দেশের গৌরব, তোমার গৌরব। তোমার আত্মত্যাগে আমার দারিদ্র্য, আমার লাঞ্ছনা। তুমি আমার প্রেম হরণ করে নিয়ে গেছ, দিয়ে গেছ শুধু যন্ত্রণা।

এইসব স্রোত, অস্পষ্ট চিকন রেখায় কখনো আচমকা জেগে ওটে, কাজের কিংবা অন্যের সঙ্গে আলাপের সময়েও। চকিতে মিলিয়ে যায়। এখন আসছিল তাও নয়। কিন্তু আসতে পারত। পৌষের মাঝামাঝি, ঠাণ্ডা কম পড়েনি। বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল, কখন লেপটা গায়ে টেনে নিয়েছে জানে না।

হাতমুখ ধোওয়ার পর নাইটি পরে সোমা এসেছিল। বাতি জ্বালল। অনেক মিনতি করল খাওয়ার টেবিলে যেতে। কিন্তু কাজ হলো না। শুয়ে থেকেই বলেছিল, সেমিনার শেষে হেভি নাশতা ছিল, আমার খিদে নেই। তুই খেয়ে নে। বাতিটা নিভিয়ে যাস্।

আর কোনো আবদার করে না সোমা, একটু অভিমান করেই চলে যায়। টুকটাক কিছুক্ষণ আওয়াজ হয় খাওয়ার টেবিলে, তারপর নীরবতা। বাইরের করিডোরে লাইট শুধু টিমটিম জ্বলে।

নিঝঝুম হয়ে আসছে শীতরাত্রি। আরেকবার কিছু সাবধানী শব্দ। কয়েকটি টোকা, জানালার খড়খড়িতে। একটু ঘুম আসেনি দু'চোখের পাতায় লেপের নিচে মুখ নিয়ে ঝুম মেরেছিল। বুঝতে পারে নীলা, অদ্রি ফিরেছে। সোমা উঠল, পা টিপে গিয়ে দরোজা খুলে দেয়।

এলার্মঘড়িটা অদূরে তেপায়ার উপরে বেজে চলছিল। মুখ বার করে দেখে নীলা, রেডিয়াম কাঁটায় একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। এমনটা প্রায়ই করছে আজকাল। বলা যায় বাপকা ব্যাটা। চেহারায় যেমন কর্মেও তেমনি। সোমার রুমে কিছুক্ষণ সংলাপ, বুঝা যায় না বিষয়বস্তু ; কিন্তু তার পরেই অদ্রি আস্তে আস্তে প্রবেশ করে মা'য়ের কামরায়। মশারী টাঙায়নি, খাটের ধারে বসল।

মা! আমি জানি তুমি ঘুমাওনি। আমি বাসায় এসেছি, অনেক দেরী করে এসেছি। আমাকে বকুনি দাও। আমার গালে একটা থাপ্পড় মারো। চুপ করে কাঁদো কেন মা, কথা বলো। কথা বলো জলদি, নইলে আলো জ্বালবো। তোমাকে ধাক্কা দেবো। কিছু বলছো না তো? বেশ, সুইচ অন্ করছি—

আহ্ থাম্ অদ্রি। বাতি জ্বালিস্ না। ফিরে যখন এসেছিস্ কিছু খেয়ে পড় গে। টেবিলে খাবার আছে।

এতরাত্রে আর কথা বলিস্ না। যদি না খাস্ ঘুমিয়ে পড়গে যা। আমাকে আর বিরক্ত করিস্ না।

যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। ঘুমোবার সুযোগ যখন এখনো আছে, আমি ঘুমিয়ে নেবো। থামলো অদ্রি, কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, আমি জানি মা তুমি, কিসের ভয় পাও। তুমি ভয় পাও, যে পথ বেছে নিয়েছি, আমি তরুণ বয়সেই মারা যাবো। ইউনিভারসিটিতে ছাত্ররাজনীতি করতাম, পাস করে বেরিয়ে দলে ঢুকে পড়েছি। এখন একটা প্রধান পার্টির সহকারী সম্পাদক। তোমার ভয়, আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে একদিন গুলী করবে অজানা আততায়ী। তোমার অনুভূতি মিথ্যা নয় মা, মিথ্যা নয়। আগামী পরশু কে আমাদের নতুন কর্মসূচী। হরতাল পরে, সেদিন মিছিল হবে। তার প্রস্তুতিই চলছে দিনরাত। পোস্টার লেখানো। পোস্টার লাগানো। মাইকিং পথসভা। আমাকে তো শোভাযাত্রার সামনেই থাকতে হবে!

তোর সব কথা আমাকে বলিস্ না অদ্রি আমি শুনতে পারবো না।

এখন গভীর রাত। এটাই সময়। এখন তোমাকে কিছু না শুনিয়ে যাচ্ছি না।

আহ্, ভাইয়া। এখন রাখো না। সোমা হাত ধরে ঝাড়া দেয়।

না, আমি বলবোই। সব সময় আসে না, এখন এসেছে। তখন শিশু ছিলাম, জানতাম না। কিন্তু বয়স বাড়লে যখন শুনলাম, আমার পিতার পরিণতি, তখন থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা। কঠিন শপথ। ছদ্মবেশী খুনীদেরকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো। এদেশে তাদের চিহ্নও রাখবো না। এ সমাজ ভেঙে দেবো। আমরা এক নতুন সমাজ গড়বো। যেখানে থাকবে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। ফরাসী বিপ্লবের বাণী কোথাও রূপায়িত হয়নি, আমরা তা করবো। সেহবে পৃথিবীর এক নতুন ভবিষ্যৎ। মিছে ভয় পাচ্ছ তুমি মা, আমি মৃত্যুঞ্জয়। আমাকে কেউ মারতে পারবে না মা, কেউ মারতে পারবে না।

এবার উঠল নীলা, হাত বাড়িয়ে ছেলেকে আদর করে বলল, এখন তুই যা বাবা, তুই যা। আমি খুব ক্লান্ত।

অদ্রি যখন কথা বলছিল তখন আবছায়া অন্ধকারে ওকে ওর বাবার মত লাগছি। মোমেনও কখনো কখনো, অধিক রাতে বাসায় ফিরে এমনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত। বিশেষত ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়। তখন সে নববধূ। বিয়ের পর গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। ও পেয়েছিল শিক্ষানবিস প্রতিবেদকের চাকুরী। শ্বশুর সাহেবের ইচ্ছে ছিলো না। তিনি জাত শিক্ষক। কিন্তু পাশ করে যখন বেরিয়েছে, আপাতত একটা কিছু করুক, এরকম একটা ভাব

ছিল। ছোট একটা বাসা ভাড়া করেছিল। হাতে হলুদ বাঁটা, গায়ে মাটির গন্ধ, কিইবা বুঝতো তখন। ওইটুকু বিদ্যা যথেষ্ট ছিলো না।

এটা আশ্চর্যই বলতে হবে সানির বাপের সঙ্গে ছিল গলায় গলায় মিল। উনি অন্য কাগজে ছিলেন। কিন্তু দু'জনেই ঘটনা খুঁজতে গভীর রাতেও ঢাকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াত! এক রাতে গুন্ডার পাল্লায় পড়েছিলে। ওরা ভেবেছিলে, প্রতিপক্ষ।

সুতরাং এটাও আশ্চর্য ছিলে না যে, আঠারোই ডিসেম্বর পত্রিকায় সংগ্রামের শেষ মুহূর্তে ধরে ধরে নিয়ে হত্যা করা বুদ্ধিজীবীদের একসারি ছবির সঙ্গে ওর ছবি দেখে, কিছুক্ষণের মধ্যেই হার্টফেল করেছিলো। খারাপ আলামত দেখে তেসরা ডিসেম্বর গ্রামে যান।

সানি সেই ব্যক্তির পুত্র, ওর হৃদয়টা কেমন সহজেই আন্দাজ করা যায়। একটি ডেলিগেশনের বোম্বাই যাওয়ার টিকিট করতে গিহয়ে নতুন করে পরিচয়। মাঝখানে দীর্ঘদিন যোগসূত্র ছিন্ন ছিল।

স্কাইবার্ড ট্রাভেলস গড়ে তুলেছে অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টায়। নিজে ম্যানেজার। নিজের এসি কক্ষে চা অফার করে। কথায় কথায় বলল, যোগাযোগ না থাকলেও, সব সময় আমি দেখি। হ্যা দেখি আপনাদেরকে। আমার অস্তিত্ব জুড়ে সমস্ত ইতিহাস। বাবার জন্য মায়া হয়, মায়া হয় আঙ্কলের জন্য। কিন্তু গর্বিতও বোধ করি। তাঁরা অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। নিজেদের সময়কে জয় করে তারা চলে গেছেন। এই ধারা তো কখনো শেষ হয়না। এখন আমাদের পালা। আপনি জানেন? আমি আপনার জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি?

এমন অকৃত্রিম আবেগ ছিল ওর কথায়, নীলা মূক হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে নিচুস্বরে বলেছিল, হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি। তুমি পারবে সানি। কারণ তোমার রক্তে আছে বীরত্বের গৌরব, আর স্বাধীনতার স্বাদ।

এরপর, দিনে দিনে, যত কাছে এসেছে এতই ভালো লেগেছে ওকে। শুকিয়ে যাওয়া একটা মৃত বাগানের নতুন বসন্তে জাগরণ। সময় পেলেই বাসায় আসে, সহজে না খেয়ে ছাড়ে না। সেও ধানমণ্ডির সবচেয়ে দামী রেঁস্তোরায় নিয়ে চাইনিজ খাইয়েছে বেশ কয়েকদিন। অদ্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব, সোমার সঙ্গে চমৎকার ভাব।

হঠাৎ কি মনে হল, উঠে পড়ে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে নীলা। টেবিলঘড়িটা হাতে তুলে দেখে, রাত সোয়া তিনটা। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি স্তব্ধতা। ঘোর নিশি। এ সময় পৃথিবীতে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। নিঃশব্দে বন্ধ করে মাঝখানের দরোজাটা। কাছেই দুই কামরায় ছেলে এবং মেয়ে। ওরা শান্তিতে ঘুমুক। এক বিস্ময়কর গতিধারা জীবনের, শূন্যস্থান অপূর্ণ রাখে না। মরাডালের নতুন মৌসুমে পাতা গজিয়ে তোলে। নতুন কালের পথিক ওরা, ওরা ওদের পাথেয় খুঁজে পেয়েছে। এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাক।

বাতি জ্বালে না। কিন্তু টর্চটা টিপ দিয়ে জ্বালিয়ে ফোনের কাছে কাত করে রাখিল। কাছে বসে ডায়াল করে।

হ্যালো, হ্যালে! ঘুমিয়ে আছো বুঝি? কিন্তু আমি তো ঘুমাতে পারি না।

কে? নীলা খালা? এতরাতে আপনি! কি ব্যাপার? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?

না। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে পড়েছি, তুমি কেমন আছ তা জানতে চাইছি।

আমি ভালো। হ্যাঁ ঠিকই। আপনার কণ্ঠস্বর কেমন কাঁপছে, মনে হয়।

শোনো সানি। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমি পৃথিবীর হংকং সিঙ্গাপুর টোকিও দিল্লী আগ্রা লণ্ডন ওয়াশিংটন—আমি যেখানে যাই, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমার এখন

সে মুহূর্ত। এদেশে আর থাকবোনা। আমি তোমাকে নিয়ে চলে যেতে চাই। প্রথমে ব্যাঙ্কক। আমি সব গুছাচ্ছি, কাল থেকে বুকিংয়ের কাজে লেগে যাও। লোকজন আমাদের ভুলে যাবে। তারপর আবার ফিরে আসবো। তাছাড়া ছেলেমেয়ে দুটোর গার্জিয়ান দরকার তো।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন, আপনার আদেশ অমান্য করবো না। তাছাড়া, আপনার কাছেই তো আমি যেতে চাই।

পরদিন ভোর, তারপর বেলা-সাড়ে নয়টা। যথারীতি গাড়ি চালিয়ে আসে সানি, হোটেল সোনার গাঁওয়ে নীলাকে নামিয়ে দিতে। তার আগেই, নাকেমুখে কিছু দিয়ে বেরিয়ে পড়ে অদ্রি, সাধারণ সম্পাদক তো আছেন কিন্তু সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব ওর কাঁধের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে সোমা, এগারোটায়।

একদম চুপচাপ নীলা, কোনো কথাই বলছে না। কাউকে না। তৈরি হয়ে আস্তে গিয়ে গাড়িতে উঠল। সানি চালাচ্ছে, বসেছে ওর পাশে।

সারাপথ একটিও কথা হলো না দু'জনের মধ্যে, যদিও একবার তাকিয়ে দেখেছিল নীলা। পেরিয়ে যায় সারাপথ। গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থামল। নামবার সময় একটু গলাখাকারি দিয়ে সানি বলল, কিছ্ছু ভাববেন না। আমি সব করছি।

একটু ম্লান হাসি খেলে যায় নীলার ঠোঁটের কোণে, জুতোর মৃদু শব্দ করে উঠে গেল।

কয়েকটা দিন কেটে যায় যেন এক মায়ালোকের স্বপ্নের ভিতরে যেখানে দৃশ্য আছে শব্দ আছে কিন্তু সব রহস্যময়। চেনামুখগুলোতে অপরিচয়ের আলোছায়ায় ওঠানামা করে।

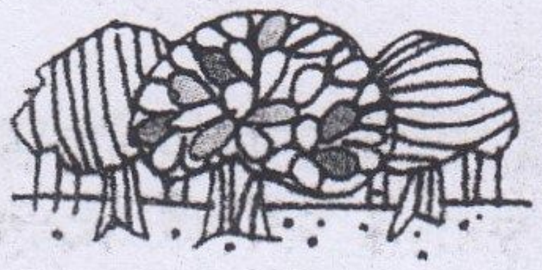
ঠিক বারোদিনের পর একদিন। সেদিন রোববার। একটা ক্লাস ছিল, কলেজ থেকে ফিরল ঠিক একটায়। সোমাকে নিয়ে যেতে হবে সাড়ে তিনটায়, ফাইনাল মহড়াতে। নিজের ঘরে ঢুকল। ব্যাগটা রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। চুল খুলতে গিয়ে নিচে চোখ পড়ল। একধার ছিড়ে কাগজটা বার করতেই দেখে সোমার হস্তলিপি। সে লিখেছে, মা আজ এগারোটার প্লেনে আমরা ব্যাঙ্কক চলে যাচ্ছি। আমি আর সানি আমাদের কোর্ট ম্যারেজ হয়ে গেছে। জানি তুমি দুঃখ পাবে। কিন্তু কি করবো, আমার উপায় ছিলো না। বহুদিন ধরে আমাদের প্রেম। তোমার হৃদয়টা আমি জানি, কিন্তু আমি তো তুমিই। আমাকে অভিশাপ দিয়ো না। দোয়া করো, আমরা যাতে সুখী হই। হানিমুন থেকে ফিরে এসে তোমাকে যেন সুস্থ দেখতে পাই।

চিঠির কাগজটা শেষদিকে কাঁপছিল নীলার হাতে, পরে নিচে পড়ে গেল। খাটের কোণে বসে পড়লো। কতক্ষণ যায়, বুঝতে পারে না। একসময় হঠাৎ চঞ্চল। নিচের থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে দ্রুত পা'য়ে কিচেনের দিকে গেল।

বঙ্গার মা, ও বঙ্গার মা, শুনছো? সুখবর, ভীষণ সুখবর। খরচুন হাতে বঙ্গার মা বোবাদৃষ্টিতে তাকালে বলতে লাগল, আমার সোমার শাদী, শুভবিবাহ! পাত্র কে জানো? আমাদের সানি! আমি তো ওকেই পছন্দ করেছিলাম।

কথা শেষ হতেই একটা হাসির ঝংকার। আর কিছু বললো না। আস্তে করে হেঁটে নিজের ঘরে এল। খিল এঁটে দেয় দরোজার। তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়ে বালিশে মুখ লুকায়। শরীরটা একেকবার ফুলে ফুলে উঠছে, শব্দ না করে অঝোরে কাঁদতে থাকে। বাইরে রোদ আছে, কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাস।

মার্চ ১৯৯৩।



অপরিষ্কার জুতো পরা প্রথমে একটি পরে আরও একটা, একজোড়া পা পথে নামলো। থপ্‌থপ্‌ কিছু নয়। যেন ক্লান্ত। টেনে টেনে চলেছে।

এমনি দৃশ্য সিনেমায় দেখা যায়। দু' একবার তারও নজরে পড়েছিলো। বুঝেছিলো এটা চলচ্চিত্র টেকনিক। দর্শকের চেতনাকে নিয়ে খেলা। একটু সংকেত, তা থেকে বহু কল্পনা। তারপরেই হয়তো মাঝারি দূরত্ব, দেখা যাচ্ছে চরিত্রের পেছনটা। উস্‌কো খুস্‌কো একরাশ চুল, জোবড়া পোশাক। হেঁটে যাচ্ছে, সামনের দিকে একটা রাস্তার কুকুর ও অন্ধকার।

একটা কাহিনীর নায়ক হওয়ার মতো যোগ্যতা তার ছিলো, কিন্তু কেউ তার দিকে তাকিয়ে দেখে না।

হয়তো একটা জমজমাট অফিস। আগ্রহ নিয়ে যার কাছে গিয়ে আত্মপরিচয় দিলো, তিনি মহাব্যস্ত। টেবিলের কাগজপত্রের উপরে চোখ রেখেই দু'চার কথা বললেন, তারপর বিদায় করে দিলেন।

কিন্তু আজকের সাক্ষাৎকারটা এরূপ ছিলো না। নিকট আত্মীয় এবং বাবার গ্রামের বন্ধু। ছোটবেলায় ইয়ার। জানের জান ছিলেন বলা যায়। সেদিন বিকেলে ভিড়ের মধ্যে গুলিস্তান চত্বরে মুখোমুখি, তিনিই কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এবং বাসায় আসতে বলেছিলেন। অনেক সময় তিনি দোস্তকে অনেক কথা দিয়েছেন, সেই সূত্রে।

ও তুমি এসে গেছো? কি মুশকিল। আমার যে এখন ভীষণ তাড়া। এখনি বেরুতে হবে। জানো তো দল নতুন কর্মসূচী হচ্ছে—সেখানে আমার বিরাট ভূমিকা! আমার উপর মঞ্চ তৈরির দায়িত্ব। একটু বসো, চা খাও। তোমার কেসটা আমি ভুলিনি। এডিটরের সঙ্গে আলাপও করেছি। কিন্তু কি আর বলবো—তুমি একদিন গেলেই বুঝবে যে কোনো নিউজপেপার মৎস্য বাজার। এইটুকু বলে খল্‌খল্‌ করে হাসলেন মিঞা মকসুদ আলী। মিঞাটা শেষেই ছিলো ; কিন্তু শেষের মিঞা সাধারণ, বংশ বুঝায় না, সেজন্য সামনে এনেছেন। আরেকটু সময় খরচ করলেন। এবং বললেন, খবরের কাগজে চাকরি কেন, বাকরিও মেলে না। কেউ কেউ অবশ্য মিষ্টি কথা বলবেন এবং খাটাবেনও। কিন্তু আনকোরা এম এ, শিক্ষানবিস প্রতিবেদকের কাজ নেবে কেন। তোমার লক্ষ্য হবে অনেক উচ্চ। তুমি আমাদের গ্রামের প্রথম মাস্টারস, এটা বিরাট গৌরব। একথা ভুলো না। তোমার বাপ হারামজাদাটা তো আমাকে কিরাই কাটিয়েছে। একটা বড় কিছু আমি তোমার জন্য করবোই। দেখে নিও। অবশ্য পাসটাসটা কম হলে ভালো ছিলো। মধ্যপ্রাচ্য পাঠিয়ে দিতে পারতাম। ওরা কেবল অদক্ষ শ্রমিক চায়। ঠিক আছে, দেখা যাবে। ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট গায়েব করে দিলেই হবে। এক্ষুণি চলে যেয়ো না কিন্তু। আমি তিতলিকে ডেকে দিচ্ছি। তিতলি, ও তিতলি! আমার মেয়েটি খুবই স্মার্ট, যেমন কথাবার্তা তেমনি চালচলন। বয়স হয়েছে তো? কেবল জামদানী পরে থাকে। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত কারুশিল্প! তিতলি!

কী? অমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ কেন? কী হয়েছে? তিতলি নয়, বলতে বলতে সাড়ে তিনমণী ওজনের দেহটা দুলিয়ে আবির্ভূত হলেন বিবিসাব। আমান জলদি সালাম দিলো। এবং বললেলা, কেমন আছেন খালা আম্মা? আমাকে চিনতে পারছেন তো?

কেন চিনবো না? এলাকার কেবল রুইকাতল নয়, সব চুনোপুঁটিকেই তো চিনি? কথাটার অর্থ কি দাঁড়ালো ভাবলেন না, খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন। পায়জামা পাঞ্জাবী পরা গমনোন্মুখ স্বামীকে বললেন, জলদি ফিরো কিন্তু নইলে ঘাড় মটকাবো। আমার বোন আসবে, ছয়সের মিষ্টি এনো। দুই সের রসমালাই!

সের নয়, কেজি বলো, কেজি। সের উঠে গেছে।

উঠে যাবে কোথায়? আমি আছি না? আমি বাপের বেটি। সের ছাড়া আর কিছু বলবো না। আমি বাঙালি, বাংলার হিসেব বুঝি!

ঠিক আছে, ঠিক আছে। সংসদের মহিলা আসন একটা পাবে তুমি!

দ্যাখ, বেশি মশকরা করো না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বেরুবার আগে মকসুদ আলি বললেন, ওক্যা আমান। হ্যাভ ও গুড টাইম। সিইউ এগেইন।

বিবিসাব চোখ পাকিয়ে বললেন, বেশি ইংরেজি মারিয়ো না। গলা টিপে দেবো।

আর কোনো কথা বললেন না, একটা ঢোক গিলে জলদি বার হয়ে গেলেন নেতাজী। আমান দেখছিলো, ঝুলন্ত কলার ফানা। না, একটা প্রকাণ্ড মাংসল হাত, সেটা উপরে উঠে যখন ওর কাঁধের দিকে আসছিলো, সে ভয় পেয়ে গেলো। সোফায় বসে পড়লো কিঞ্চিৎ থতমত খেয়ে বললো, এখন আমি আসি খালা আম্মা, একটা জরুরী...

কাছেই ভিতরে। ঘুঙুরের আওয়াজ। ওর অসহায় কণ্ঠস্বর যেন কানে গেলো না, বললেন, ঐ যে তিতলি। গানের ক্লাস ছিলো ফিরে এসে বিশ্রাম করছে। এখন নাচের চর্চা উহু যা গায় না আমার মেয়ে! মাত করে দেয়, কোথায় লতাপাতা মাইক ফেটে যাওয়ার জোগাড় হয়। ওর একটা গান শুনবে তুমি আমান? একটা গজল?

জ্বি? হ্যাঁ। শুনবো, শুনবো। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, বললো, তবে আজ নয় আজ আমার—

বুঝেছি, বুঝেছি। ঠিক আছে ওকে ডাকছি। কিছু মুখে না দিয়ে তো তুমি যেতে পারবে না, তিতলি। ও তিতলি! একটু ফিরে ডাকলেন, তিতলি! এদিকে একটু আয় তো মা। দ্যাখ কে এসেছেন!

উঠে পড়বার জোগাড় করছিলো আমান, কিন্তু উঠতে পারলো না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকায় শুধু।

ঝম্‌র ঝম্‌র শব্দ তুলে তিতলি এসে হাজির। কপাটের কাছ থেকেই জিজ্ঞেস করলো, আমায় কেন ডেকেছো আম্মি?

শুনেছো আমান—কী মধুর ডাক? তুলনা হয় না, চমৎকার সাধা গলা! মেয়েকে ধমকের সুরে বললেন, কে বসে আছেন, দেখতে পাচ্ছিস না?

তাকালো মেয়েটি। বলে উঠলো, ও হ্যাঁ, আমানভাই। কে—কেমন আছেন আমান ভাই। আ-আপনি?

বেশ ভালো। আমান অছিলা পেয়ে উঠে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, তুমি ভালো আছো তো?

উত্তর দেবার আগে, মায়ের চোখের দিকে চোখ পড়তে থেমে যায় তিতলি, বিশেষ চাহনি। বুঝে সে এর ভাষা। বেশি কথা না বলতে ইশারা করছেন। ছোটবেলা থেকেই তোতলামি ছিলো। বাড়িতে ওর ডাকনাম হয়ে যায় তুতলি কিন্তু এটা অন্যের কাছে খারাপ। সেজন্য চেষ্ঞ করেছে তিতলি। জননীরই বুদ্ধি। শুনতে ভালো, বিশেষত আধুনিক।

কন্যা কথা যদি বলেই ফেলে, চাপা দেয়ার জন্য উঁচু গলায়, বলতে লাগলেন, তিতলি,

নূপুর তো পরাই আছে। তোর আমান ভাইকে একটু নাচ দেখিয়ে দে না। শিল্পকলার ফাংশনে কিনা একটা করবি তোরা?

কোন্‌টার কথা ব-বলছো? বু-বুঝতে পারছি না!

উহ্ আবার মুশকিল উনি তাড়াতাড়ি বললেন,—ঐ যে-হ্যাঁ মনে পড়ছে—ব্যাঙনাচ! সেই যে ব্যাঙের মতো লাফাবি?

চালাক তিতলি কোনো কথা না বলে একটুখানি ব্যাং নাচ দেখিয়ে দিলে আমান হাততালি দেয়, হাসতে হাসতে বললো, বাহ্ চমৎকার তো। কবে তোমাদের অনুষ্ঠান? আমি সবটা দেখবো।

বাবইরা! ও বাবইরা! বাড়ির চাকরকে তখন বিবিসাব চেঁচিয়ে ডাকছেন।

বাবইরা রান্নাঘরে ছিলো দৌড়ে এলো, গরুর মতো চাউনি, ময়লা কাপড় চোপড়। মলিন চেহারা। জিজ্ঞেস করলো, কি বুবুজান?

নোংরা থাকে বলে বাইরের লোক না থাকলে ডাকে গাবইরা'। দুবাই পাঠাবার আশা দিয়ে রেখেছেন। বাবর বলে, পেটে ভাতে আছে পয়সাকড়ি না দিলে কি দিয়ে কিনবে ভালো কাপড়।

দেখছিস না? কতো বড় মেহমান। নাশতার বড় ট্রলিটা জলদি নিয়ে আয়। কাছের ফাঁকা জায়গাটাতেই ছিলো চাদরে ঢাকা, টান দিয়ে বার করে তারপর ঠেলে নিয়ে এলো। আবরণটা বাঁ হাতে টেনে খুললেন এবং বললেন, তুমি কি পছন্দ কর? অনেক রকম আছে। মুক্তাগাছার মণ্ডা, কুমিল্লার পেড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রসমালাই, বগুড়ার দই, পোড়াবাড়ির চমচম! আমার লোক আছে, সরাসরি পাই। এখন ফ্রিজ খালি দু'তিনদিনের মধ্যেই আসতে থাকবে।

অমনি একটু হেসে বললো, দেখলে লোভ হয়, কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না যে।

কি বলো, জোয়ান আদমী! একটা বাটি ও চামচ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে একটা পোড়াবাড়ি খাও, আরেকটু ব্রাহ্মণবাড়িয়া!

এবার আমান জোরে হাসতে লাগলো এবং পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন দেখছি! খালা আম্মা, দু'টোতেই বাড়ি আছে। খেতে গিয়ে বাড়ি খাবো না তো?

না, না। একটু খেয়েই দ্যাখ না। হাঁড়ি খালি করতে ইচ্ছা হবে। এমনিতেই কি আমি কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ঢালছি? সব আইটেম মিলিয়ে রোজ সের খানেক আমি সাবাড় করি নইলে বাঁচতে পারতাম না। প্রয়োজন ছিলো না, তবু গুরুত্ব আরোপের জন্য কানের কাছে মুখ নিলেন, ফিসফিস্ করে বললেন, গুলশানে দশ কাঠা জমি কিনেছিলাম না? ওখানে, বাড়ি উঠছে। তিতলি আমার বড় মেয়ে। তোদেরকে ও বাড়িটা লিখে দেবো!

আচমকা বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মতো আঁৎকে উঠেছিলো কিন্তু বুদ্ধিমান। বাইরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলো না। একটু মুচকি হেসে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো। হাঁটছে, হেঁটে যাচ্ছে আমান ফুটপাত দিয়ে, আচ্ছন্নের মতো। তাজ্জব, এটা তাজ্জবই। অমূল্য না হলেও, সে একেবারে মূল্যহীন নয় হঠাৎ একটা কালো পর্দা যেন খুলে গেলো এই বুঝি যৌবনের দাম আর কিছু না হোক বিয়ের বাজারে একজন যুবক পেতে পারে শেষ পারানির কড়ি। কিন্তু ওকে কেন বাছাই? তোতলা বটে, এবং খুমাটাও টেসরা, তবু ভালো কাটতি যাবে না এমন নয়। বরং ভারিই হবে বিক্রির পাল্লা। মুরুব্বিদের সহজে রাজি করাতে পারবেন না, এই হিশেব করেই হয়তো ওকে আগে হাত করবার চেষ্টা করছেন। বেশ ভালো কথা। কিন্তু কি হবে এর অতিরিক্ত ফায়দা? এখন উঁচু মহলে আনাগোনা, বড় জামাই এম, এ, পাস হয়তো এটুকু বলার জন্যেই এই পরিকল্পনা। বিড়াল আর ইঁদুর। তুলনাটা

জাগলো। ইঁদুরকে মারবার আগে বিড়াল ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে, মাননীয় মুরুব্বি কি তাই করছেন? নইলে এমন দুরবস্থা তাঁর অজানাও নয়। ছোটখাটো যাই হোক একটা কিছু তো করতে পারতেন। দেখা হলে, যা বলছেন, সব বানানো গল্প। সব মিথ্যা শেষ পর্যায়ে নিয়ে হয়তো টোপটা ফেললেন। আলোপের ধুনে পড়ে বেশি গলাধঃকরণ করে ফেলেছে নাকি? খেয়াল নেই। পেটের ভেতরে উলমুলি জাগছে। অল্প অল্প বমি-বমি ভাব। মনে হলো, শুধু খাদ্যের জন্যে নয়।

আর্মানিটোলা থেকে নাজিরাবাজার। দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। তবু রিকশা নেয়নি। মাঝখানে ছিলো বংশাল। এদিকে ছোট পুল ছাড়ালে রাস্তার ধারে উঁচু মিনার বড় মসজিদ। শত শত ফকির মিছকিন জমায়েত হয়েছে দেখা গেলো। ধুলোবালির মধ্যে বসেছে লাইন করে। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। যেন আবর্জনা। ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। চৌরাস্তার তিনদিকের হোটেল—রেস্তরাঁগুলোতে লোকজন কম নয়, দেখা যায় গিস্‌গিস্‌ করছে। এখন কাছাকাছি নেই ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন। তবু এই হাল। কাচ্ছি বিরিয়ানি, চাপাতি, নানরুটি, পরোটা, শিক কাবাব। এতো আয়োজন কিসের জন্য? তেজারতি, ব্যবসা। ক্যাশবাক্স ভরে যাচ্ছে ময়লা নোটে, পয়সায়। ধুলি উড়ছে, পথের ধারে উনান। যন্ত্রের মতো কাজ করছে বাবুর্চি, বিরাট তাওয়াটার মধ্যে তেল ফুটছে। ধোঁয়া ধোঁয়া। কাছ দিয়ে যেতে নাকে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছটা উদলা-উদলা।

এখন মঞ্চ শব্দটা ঘুরছে মাথার ভেতরে পিংপিং বলের মতো। আজ যার কাছে গিয়েছিলো তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন। মঞ্চ মানে নাট্যমঞ্চ নয়, রাজনীতি মঞ্চ, যেখান থেকে হয় ভাষণ-বক্তৃতা-শ্লোগান। স্বৈরাচার পতন দিবস আর কেউ সংবিধান সংরক্ষণ। সব ব্যাঙই লাফায়, ব্যাঙ এক পাল্লায় মাপা যায় না। হাঁকছে সবাই একই কথা, কিন্তু বহু রকম কণ্ঠস্বর। কেসটা কি? দেশ নয়, জনগণ নয়। দলীয় স্বার্থ, নিজ নিজ।

এই মহানগরীর মা বাপ নেই, নেই কোনো হেফাজতকারী। আইন কানুন, বিধিমালা। তৈরি হচ্ছে শত শত মঞ্চ। চারটি প্রধান। চারটি বড় সড়ক তারা দখল করে নিয়েছে। পথচারী? থোক্‌ থোক্‌ যানজট? থোক্‌ থোক্‌ তাদের অনিয়মই নিয়ম। তাদের কেউ রাজা কেউ ভবিষ্যৎ রাজা। সন্ধ্যা হয়-হয়। জিরো পয়েন্টের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো সে দেখছে একটা ভয়ংকর ট্রাফিক জাম, চারদিকে চার হাত-পা, হাঁসফাঁস করছে, একটা বিশাল কদাকার প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো। বড় কষ্ট, মৃত্যুর আগে শ্বাসকষ্ট। এ দৃশ্য অসহ্য, ওর গলার ভেতর থেকে কি যেন উঠছে একটা। বুঝি একটা বিষাক্ত উদ্বেগ। দু'হাতে চেপে রাখে কিছুক্ষণ মগজের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে।

আরো অসহ্য, আরো অসহ্য। চারদিক থেকে অগণিত মাইক বিকট কটর কটর, খটর খটর মুখরতা। তারপর কারুর তর্জন, কারুর গর্জন। কারুর ঘোষণা বর্জন। কারুর বিসর্জন। ত্রিবেণী নয়, চতুর্বেণী স্রোতের মতো মহাসঙ্গমে এসে যেন ঝাপট খাচ্ছে পরস্পর।

শুধু ক্লান্তি নয়, যেন ভ্রান্তি। কপালের দু'পাশের রগ টন্‌টন্‌ করছিলো। হাঁপাচ্ছেও একটু-একটু। সচিবালয় প্রাচীরে পিঠ ঠেকিয়ে দম নিতে দাঁড়ালো আমান, ঝাপসা-ঝাপসা ঠেকছে চোখজোড়া।

শব্দের আবর্ত, ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর।

আমরা গদি চাই না, আমরা চাই প্রতিষ্ঠা করতে জনগণের অধিকার। রাস্তায় নেমেছি ঃ সে অধিকার আদায় না করে রাস্তা ছাড়বো না। জয় গণতন্ত্র। শুনতে শুনতে বমি-বমি ভাবটা গলা ঠেলে আরেকটু উপরে ওঠে, এবার একটু জোর দিয়েই ঢোক গিললো।

গণতন্ত্র বলে আজকে যারা চেঁচাচ্ছে তাদের ইতিহাস আপনারা জানেন, নিজের চোখে সব কীর্তি দেখেছেন। একদলীয় শাসন প্রবর্তন ক'রে কারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলো? ভূতের মুখে রামনাম। যে সংবিধান তারা তৈরি করেছিলো তারাই এখন তার বিরোধিতা করছে। সেখানে কেয়ারটেকার সরকার বলে কিছু নেই—আছে নির্বাচন কমিশন। তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি—অথচ মাসের পর মাস সংসদ বর্জন করে চলেছে, এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। জনগণ তাদের নির্বাচিত করেছিলেন সংসদে কাজ করবার জন্য, রাজপথে আন্দোলন করবার জন্য নয়। তারা ঘন ঘন হরতাল অবরোধ করছে। উদ্দেশ্য? দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়া যাতে দেশটা সম্পূর্ণ বিদেশের বাজারে পরিণত হয়ে যায়।

আমরা, আমরা—আবার সোজা হয় আমান, ভাবছে জলদি ফিরে যেতে হবে, নইলে হয়তো টলতে ঠলতে পড়ে যাবে ফুটপাতের উপরে।

দেয়ালে হাত রেখে পদক্ষেপ দেয়ার চেষ্টা করলো, তখন আরেকটি মাইক থেকে কে যেন ভাঙা ভাঙা স্বরে চেঁচিয়ে বলছে, মুক্তিযুদ্ধ আমরা করেছি ; একজন বসে বসে কলা খাবে আর আমরা ভেরেন্ডা ভাজবো, তা হতে দেবো না। এখন আমাদের দফা একদফা, এই স্বৈরাচারী সরকারের পতন। তার কম কিছু নয়। পতন, পতন।

এ সময় হঠাৎ ক্যাক্‌কর করে ব্রেক কষে একটা দৈত্যট্রাক শোনা যায়।

এইসব কি আদৌ ঘটছিলো? হয়তো ঘটছিলো, না হতে পারে দিবাস্বপ্ন, কিংবা হিজিবিজি উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা। তবে ভেসে বেড়াচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে কেবল বাতাসে নয়, প্রতিদিন খবরের কাগজে কাগজে জমছে ছোট ছোট কালো হরফে পিপীলিকা স্তূপের মতন। পিপীলিকা, পিপীলিকা। চিনি গন্ধ পেয়েছে নাকি? নইলে, শার্টের কলার বেয়ে উঠছে কেন। যেন তন্দ্রার ঘোরে হাঁটছে, ডানহাতটা আলতোভাবে তুলে ছুঁয়ে দেখে কিছু নেই তেমন। সে মাথাটা একটু নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে, এখন উদ্‌গীরণ অবস্থাটা আলজিভের কাছাকাছি এসে বৃষ্টিপূর্ব থমথমে মেঘের মতো স্থির হয়ে আছে।

আবছায়া থাকে না ঃ রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি বাতিগাছ। বাতিগাছে বাতি জ্বলে ওঠে, আলোকিত করে রাস্তা, এটাই নিয়ম। কিন্তু অনেক সময়েই নিয়মটা থাকে না, কারেনট চলে যায়। কে টেনে নেয়, কে জানে। সহপাঠী প্রিয় বন্ধু জিলানদের আপনবাড়ি সেগুনবাগিচায়, ফাইনাল পরীক্ষার প্রায় দু'মাস আগে জোর করেই এনে তুলেছিলো। মাথার প্রায় সবটাতেই ফাঁকা ময়দান, প্রস্তুতিতে সাহায্য করবে। নকলেও ওস্তাদ ছিলো না। পেছন দরোজায় তদবির। তাই দিয়ে এতোটা উঠেছে। কিন্তু কিনারায় এসে সে কৌশল প্রয়োগের সাহস হচ্ছিলো না।

পুরোনো ঢাকার গলির ভেতরে লজিং ছিলো আমান, কেরানির সংসার। পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়েকে পড়ায় রোজ, বদলা সিঙল চৌকি, বারান্দায় একটু থাকার জায়গা এবং ডালভাত। ছাড়তে চায় না। যুক্তি দিলো সাময়িক। এবং প্রয়োজনটা ভালো করে বুঝালো। বড়টি ছাত্রী, নবম শ্রেণীর। নাম জামিনা। চলে আসার দিন জামিনা ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলো। এও এক ঝামেলা।

একটা কিছু অঘটন থাকেই, কপালটা এমনই ফাটা। এসে পড়লা। বাইরে থাকতেই চোখে পড়ে, বাড়িটা নিষ্প্রদীপ। ভেতরে দু'একটা ঘরে মোমবাতি। দক্ষিণের উইং-এ জিলান এর রুম। দু'পাশে দু'টি কাট। সেখানেই টেবিল সাজানো। লোকজন কোথায় গেছে সব? নড়াচড়া, আওযাজ কম। বারান্দার কাছাকাছি একটি মোটর সাইকেল পার্ক করা, এতোদিনে ভালোই জানে কার। জিলান-এর ছোট বোন ঝুমুর। ওর ছেলেবন্ধু তৈফুর। তুখোড় যুবক।

কয়েকজনের একজন। ওর সঙ্গেই ভাব বেশি। সে এসেছে; বোঝা গেলো।

একটা অদ্ভুত শিরশির করা অনুভূতি জাগে সারা শরীরে, কেন জানি না। নিচে গাছের শুকনো ঝরাপতা। সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যায়, জানালার কাছে। ফিস্‌ফিস্ আলাপন।

ওরা দু'জন।

এ তুমি কি করলে। কাঁদো-কাঁদো স্বর ঝুমুরের, বলছে, ঠিক আছে, জলদি প্রস্তাব দাও।

তক্ষুণি জবাব দেয় তৈফুর প্রস্তাব। এ তুমি কি বলছো! তোমাকে বিয়ে করবো বলে তোমার কাছে আসি নাকি? তুমি তো আমার বান্ধবী। তুমি সেকেলে মেয়ে নও, সব ব্যবস্থা তোমার জানা আছে। তবু বলছি, সাবধান থাকা ভালো। যদি বুদ্ধিমতী হও, যে হাবা ছেলেটা তোমাদের বাসায় আছে, তোমার ভাইয়ের বন্ধু, তার গলায় ঝুলে পড়ো ওক্যা, আসি, বাই।

বাইরে এসে মোটর সাইকেলে চড়লো, স্টার্ট দিলো এবং ভট্‌ভট্ শব্দ তুলে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

আর কিছুক্ষণ পর বিদ্যুৎ এলে সদ্য রংফেরানো দোতলা বাড়িটা ঝল্‌মল্ করে উঠলো। তখন ঝুমুর এ কামরায় ছিলো না। আমার জলদি-জলদি সুটকেসটা গুছিয়ে নেয়। তারপর বেরুল। চোখ তুলে তাকাতে দেখে বারান্দার প্রান্তে সে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত নিজেকে সামলে নিচ্ছে।

এই নগর, এই মহানগর এখানে যা দেখেছে যা শুনেছে এবং যা দেখতো যা শুনতো সব মিথ্যা, মিথ্যা, একটা শুধু ঝকমকে আচ্ছাদন। গ্রামে গরীব অভিভাবক অনেক আশা নিয়ে ওর পথ চেয়ে আছেন, এটা সত্য। এই সত্যের উপরে প্রথম মিথ্যা সে উচ্চারণ করলো, এই যে ঝুমুর! শোনো গ্রাম থেকে জরুরী খবর পেয়েছি এক্ষুণি আমাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিতে হবে। মা খুব অসুস্থ। তোমার কাছে আমার একটা বই ছিলো না? জলদি নিয়ে এসো, প্লিজ!

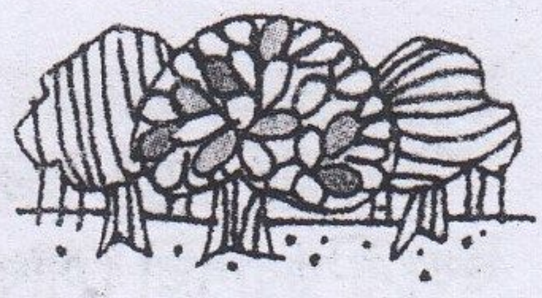
ও হ্যাঁ। একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুণি আসছি। দ্রুত যাওয়ার সময় দেখলো, কিছুক্ষণের সব দাগ মুছে ফেলেছে, পরিচ্ছন্ন চেহারা। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে দেখা হলো না। তুমি বুঝিয়ে বলো, কেমন? তোমার আব্বা-আম্মাও তো বাসায় নেই। আচ্ছা আসি।

স্টেশনে এসে টিকিট কেটে গাড়িতে ওঠবার পর জানালার ধারে বসে। এটাই অভ্যাস। বাইরের দৃশ্য কেমন ঘুরে ঘুরে চলে, দেখতে দেখতে যায়। বাতি জ্বলেছে। তাড়াহুড়ো করে এসেছে, চাকরির দরখাস্তের কাগজপত্র ছিলো, এনেছে কিনা দেখতে ক্যাম্বিসের ঝোলাটা খুললো। বইটা চোখে পড়ে, রহস্য উপন্যাস। ওর সবটা পড়া হওয়ার আগেই চেয়ে নিয়েছিলো। যেখানে থামতে হয়েছিলো সে পৃষ্ঠাটি দেখতে পাতা উল্টাচ্ছিলো, এমন সময় একটা চিরকুট বেরিয়ে এলো। কৌতূহল, হাতে নেয় সেটা। এক প্রস্থ ছেঁড়া খাতার কাগজ। তাতে বলপেনে তাড়াতাড়ি লেখা, আমি আপনাকে ভালোবাসি, আবার আসবেন।

অবাক মুহূর্ত, হো হো উচ্চহাস্য করে উঠতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। আশে পাশে অনেক যাত্রী। জানালায় মুখটা একটু বাইরে নিয়ে বাতাসের ঝাপটা খায়। না হেসেও হাল্কা হয়ে যাচ্ছে, ফুরফুর হাল্কা যেন ছেঁড়া পাতার মতো উড়বে আকাশে। গাড়িটা দ্রুতযান, ঝকরঝকর আওয়াজ ছড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে, আর যেন সকৌতুক ছন্দে ছন্দে একটানা বলছে কোথা যাস্, কোথা যাস্।

ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

প্রস্তরযুগ অনাবিষ্কার



অপরাহ্নের আরামদায়ক ঝলমলে রোদ ও ফুরফুরে হাওয়া কিন্তু আমাদের ছোট্ট কেরায়া ডিঙিটা শীর্ণকায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদরে ঘন কচুরীপানার দাম কেটে কেটে বেশ কষ্টেসৃষ্টেই অগ্রসর হচ্ছিল। উল্টোযাত্রা, দক্ষিণ থেকে উত্তর।

ভালো ছায়া আছে তরজার ছইয়ের ভিতরে। আছে পরিষ্কার ওয়ার লাগানো দুটো বালিশ, পেতে-দেওয়া কাঁথাটাও মন্দ না। কিন্তু আমরা বসেছি বাইরে, পিছনের পাটাতনের উপরে। আমরা দুইবন্ধু, শহুরে যুবক। মাঝি আবদুল মালেক কাজী। গাট্টাগোট্টা শরীর, মাথায় বাবরীচুল। হাত-পা যেন পাথর কুদান। তামাটে রং সূর্যের উত্তাপ খেতে খেতে কালো হয়ে আছে। হাসলে ফকফকে শাদা দাঁত আঁধার মেঘে যেন বিজলিচমক! মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে ওঠে, আর একতরফা গালগল্প করতে করতে লগি ঠেলছে। সহজেই বোঝা যায়, রসে টইটুম্বুর। সকলের প্রিয়জন। সম্পর্কে ভাতিজারাও নাকি তাকে ডাকে মালুভাই—মজার কাণ্ড বৈকি।

আমরা দুজনেই দেশের সন্তান, বিশেষত সুটকেসওলা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ঃ আমাদেরকে নিজগ্রামে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেয়ে যেন হাতে আসমান পেয়েছে।

এখন ফাল্গুন, ভালোবাসার মাস। অন্যকথায়, বসন্তকাল। বসন্তকালে নাকি অসম্ভব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে থাকে, আর ধারণাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রথম প্রমাণ ছিল সাঙাত হবু প্রত্নতত্ত্ববিদ আবু নওশাদ মির্জা সালেহীন-এর সঙ্গে মফস্বল আগমনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান, যদিও জানা ছিল এটা ওর খামখেয়ালী। দ্বিতীয় অসম্ভব, এই অচেনা তরীচালক। তৃতীয় অসম্ভবটা যে কি হবে, তা তো এখনো পুরাদস্তুর আকাশকুসুম।

আবু নওশাদএর সামনে এক বিরাট ইংরেজি গ্রন্থ খোলা, সংস্কৃত শ্লোকের মর্ম মানলে যা দুর্ভিক্ষে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী, শান্তিকালে উপাধান এবং যুদ্ধের সময় শত্রু ধ্বংসে নিক্ষেপণ হাতিয়ার; কিন্তু এখন সে অর্ধশায়িত অবস্থায় পাতার উপরে হুমড়ি খেয়ে ভারী চশমার কাচের ভিতর দিয়ে বিদ্যানুশীলন করছে। একটি সচিত্র প্রবন্ধ পড়েছিল। তারপর থেকে তার শয়নে-স্বপনে লক্ষ বছরের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সভ্যতা।

মাসখানেক আগে ঘটল একটি ঘটনা। সংবাদপত্রে তার বিবরণ পাঠ করে তার মনে হয়েছে একবার সে জায়গায় যেতে পারলে জরিপ কিংবা খননকার্য ছাড়াই সুপ্রাচীনকালের বহুনিদর্শন খুঁজে পাবে। এ আবিষ্কার যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করবে না, তা কে বলতে পারে?

অথচ আমি একটা আসল গাধা, যা বুঝি সব সাদাসিধা। সাধনা-ফাধনা আরাধনা আমার কাছে নিখাদ গঞ্জনা। ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সুতরাং মুদ্রানীতিই শ্রেয় ঃ নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক্। হঠাৎ যেদিন আধচেনা টনটনা একটা মেয়ের হন্টনে নারীর লক্ষণ দেখতে পেলাম সেদিনই তার পিছনে লাগলাম। কিন্তু আনাড়ির বিপদ কাড়ি-কাড়ি। গুরুদেব প্রয়োজন। নাকাল হওয়ার দাগা আছে তবু উপদেষ্টার আকাল ছিলো না। অনেকে যার নাম দিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিম অবসর প্রাপ্ত কড়া কূপনীতিজ্ঞের চাইতেও চড়া। গোড়ায় ছিল রাহাত খান মজুমদার। অনিবার্য কারণবশত খানকে আগে আনতে হোলো এবং মজুমদারকে অনেকে মজুতদার বলতে শুরু করায় এফিডেভিটে ওটা তরফদার করেছেন।

এখন খান রাহাত তরফদার। যে লোকের কেস তিনি গ্রহণ করেন, সর্বদা তার তরফে থাকেন। তবু মজুতদার তলে তলে বহাল আছে কারণ তার পোর্টফোলিওতে বহু প্রকার টেকনিক মজুত আছে এবং দেশীবিদেশী পর্ণও নাকি আছে পূর্ণঝোলা।

গুণীব্যক্তি ; তবে অতিরিক্ত ঝামেলা বিধয় পাসটাসের পাশ কাটিয়ে গেছেন। তবু ক্যামপাসই তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস। এখানকার মক্কেলরা কেবল সম্মানিত নন, উঁচুমান সম্পন্ন। ব্যর্থ মনোরথ হলেও সঙ্গে সঙ্গেই মারতে আসেন না। হালে হাতীপথের সমবায় দালানে একটি বুকস্টল স্থাপন করেছেন। নাম উজ্জয়িনী। ওখানেই দেখা করেছিলাম এক প্রশান্ত সন্ধ্যায়।

প্রথম একশত এক টাক নমুনা ফি। কড়কড়ে আংকোরা একটি নোট দিয়েছিলেম। খুব খুশি হলেন। মনে হল, বলছেন ঃ

জনাব, কপাল লাগে কপাল। অনেকে একসাগর কালি খরচ করেও কবিত্বকে পায় না ; কিন্তু কারও কারও আঙুলের ফাঁকে একটি খাগের কলমই যথেষ্ট। কালিদাস তো দেভী মহাকালীর দাস ছিলেন না, অথচ লিখে ফেললেন মেঘদূত ঃ বিশ্বসাহিত্যের একনম্বর শ্রেষ্ঠকাব্য। সেই সময়ের সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাই সেটা রচনা করেছে, তিনি ছিলেন নিমিত্তমাত্র।

আমিও ভাগ্যবান বটে, কিন্তু সে ভাগ্য ছাপ্পড় ফুঁড়ে সমনে এসে পড়েনি, চিন্তা করেছি, চেষ্টা করেছি। ফল পেয়েছি। অবশ্য গুরুদেবের পরামর্শ ছিল সোনার চাবিকাঠি। বাইশ বছর বয়েসে চার-চারটে বান্ধবী পাওয়া কম কথা না, হোক না টেমরাটুমরা কিংবা না-হোক ততটা খুবসুরত। সনাতন বিধানমতেও অনিয়ম ছিলোনা। এসেছে, হেসেছে। আবার ভেসে চলে গেছে। তাতে কি। হরে রাম, হরে কৃষ্ণ। আবার যাবো কারও কাছে, আবার পাবো। পাকা আম হাতে এলে, ছিলবো, মুখে দিয়ে মজা করে চুষে চুষে খাবো।

বিভোর ভাবনার জোয়ার ভেসে চলেছিলাম, যদিও ইঞ্চি ইঞ্চি করে যাচ্ছি। কখন হা হা করে হেসে উঠলাম বুঝতে পারিনি। সেই শব্দে ক্ষয়ে-যাওয়া প্রত্ন প্রস্তরমূর্তির মতো গুরুগম্ভীর মুকখানা তুলে নওশাদ দশক দিয়ে উঠল, হয়েছে কি তোর, হ্যাহ্? কি হয়েছে? এত নিটকাচ্ছিস? তলসা! বেশি বিটলামি করিস্ না।

আমার নাম তসলিম, রাগলে তসলা বলে তাতে আমি কিছু মনে করিনা। তসলা কেবল বড়বাটি নয় চিলমচীও হয় ঃ আমি তো তেমন কাজেও লাগছি না। হালকা সুরেই বললাম ডিস্টার্ব করেছি, মাফ করে দে। মেঘলা আকাশ ভালো লাগে না, তাই উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা উড়িয়ে দিলাম—।

অবিরাম রিন্‌ঝিন্। টুক্‌টুক্, চুক্‌চুক। কত কিসিমের আওয়াজ কানের পর্দায় ছোঁয়া দিয়ে যায়। আবহমান কাল ধরে চলছে প্রকৃতির নীরব খেলা। প্রাণীর জীবনধারণের সংগ্রামকে ছেয়ে আছে একটি বিশাল সেতারঃ বাজনা চলছে কখনো সানন্দ, কখনো বেদনাবিদুর, শুনবার সময় পাই না আমরা। একটি মেয়ের সুরেলা কণ্ঠস্বর ও তো তার বাইরে নয়। আমি দেখছিলাম একটি ছোট্ট পাখি, মাছরাঙা। মাঝে মাঝে মাছের খেউ, কিছু দূরে দূরে বাঁশের খুঁটি। কয়েকটিতে কালো কালো পানকৌড়ি। একটিতে, নিচের দিকে সে বসেছিল। পরিষ্কার টলটলে পানিতে তার চলন্ত খাবার দেখলেই ঝুপ করে করবে আক্রমণ।

এমন মূহুর্ত, আর শুকনা কাঠ না হলেও আমি কাঠখোট্টা— তবু যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটি সুর কানে বাজছিল ঃ

আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।

কিসের ভাবনা? কার ভাবনা? যে-কথা বলা হয়নি তার গভীর গাঢ় নিবিড় রাতের আকাশে নক্ষত্রের মতো সেগুলো যদি জাগে তাহলে কে বুঝবে তার ইশারা, এমনকি কারুর চেতনায় ছায়া ফেলে যাবে কিনা সন্দেহ। আমরা যা বুঝি না তা বলি এর মধ্যে বোধ হয়, একটা মাধুর্য আছে। আমার সহপাঠিনী, কিংবা বান্ধবীরা, যে যখন যেটুকু আমাকে বলেছে, হয় চুটকি নয় মিঠেকড়া, টকঝাল যাই হোক সেটুকু আমার ভালো লেগেছে।

তবে মৌরি? সে আলাদা। গানের চরিত্র। যেখানে ঘাসের উপরে বসে ওই গানটি গাইছিল মুখটা নামিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আমি তাদের এক পাশে ছিলাম। দেখতে চলনসই, কিন্তু তার অন্তর জুড়ে অফুরন্ত সুর। আমি ক্রমে মৌরিময় হয়ে উঠছি, রাহাতের বিধিমালা থেকে নিশ্চিতই পদস্ফলন। তিনি যেসব কায়দা বাৎলে দিয়েছিলেন, যেমন ধাক্কা খাওয়া, বাক্কা চাওয়া তারপর ছক্কা মারা সবই এখানে অকেজো হয়ে গেল।

আমার জন্য ভাবি না, যা হবার হোক; কিন্তু আবু নওশাদে যা ঘনীভূত হয়েছে তা এক নিগূঢ় মনোবিকার। অভিজাত কন্যা মিনি মন্দাকিনী; এগিয়ে এসেছিল, সহজেই ধরা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে ফিরে তাকালো না; বরং প্রায় তাড়িয়ে দিল। ওর খসড়া খাতায় দেখেছি, অনেকটা বিমূর্ত, ওর মুখচ্ছবি। অনেক পাতায়। তবে এ পর্যন্তই। আমাদের দেশে, মেয়েদের বয়সেই একটা সীমারেখা থাকে, যাকে ভিঙিয়ে কেউ যেতে চায় না। কবিতার গঠনের এটা প্রায় একটা অকাট্ট বিধান। চৌদ্দ থেকে আঠারো, বিয়ের বয়স। উনিশটা মনে হয় আঠারোর ফাও। কিন্তু কুড়িতে পড়লেই বুড়ি। আবহমান সামাজিক ধারণায় সন্তান উৎপাদন পরিণয়ের প্রথম শর্ত। বয়সের এই পরিধির মধ্যেই তা হওয়া উত্তম। কারণ ছেলেমেয়েদের মানুষ করা পিতামাতার কর্তব্য— শৈশব থেকে তারুণ্য পর্যন্ত চলমান জীবনধারায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে শুরুটা ঠিক সময়ে হওয়া চাই।

বড় ঘর, স্বাধীনতা বেশি; কিন্তু মন্দাকিনীও তো নারী? অনিচ্ছা প্রকাশ, এমনকি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকগণ একদিন চারচোখের মিলন ঘটিয়ে দিলেন।

শেষ দিকে মিনি কাঁদেনি। বোবা হয়েছিল। এত আয়োজন, জাঁকজমক। হৈ-হুল্লোড় উৎসবের মাঝে কেউ ভাবতেই পারে নি মিনি মনে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাসর রাতেই নিজেকে পয়জনে আপ্লুতে করে। অনন্তের চির অন্ধকারে চলে গেল মন্দাকিনী খন্দকার।

স্কান্ধমাস! হাহাহাহা, নামটা আজব বটে কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতার প্রতীক। মোটা বইটা বন্ধ করতে করতে অস্পষ্ট স্বগতোক্তি করে আবু নওশাদ। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওটার ওপরে বালিশের মতো মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, এবং আমাদের দু'জনকে লক্ষ্য করেই বলল, হাসবেন না মালুভাই, বেশ বেশ চালিয়ে যান। বর্তমান অবস্থা থেকে আমাকে কয়েকটি মূলসূত্র তৈরি করে নিতে হবে। আর তুই? ওরে তলসা! অনেক কিছু যা বলেছিলাম ইতোমধ্যেই ভুলে যাস্‌নি তো?

আমার মগজটা কি পাথর যে সেগুলো ধরে রাখবে।

হোয়াট? হোয়াট ডু ইউ সে? তড়াক করে উঠে বসল নওশাদ, বলল, ইউ আর নট মাই গাইড, বাট চীফ এইড। আমাকে নিরাশ করছিস?

না, না। বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুই বললাম না। শুধু মিটিমিটি হাসছি। হাফম্যাডরা কমরেড হলে স্যাডনেস থাকে না।

খুব দীর্ঘ না হলেও অনেকটা আঙষ্ট পথযাত্রা, ঢাকা-সিলেট হাইওয়েতে নবনির্মিত সেতুর এপারের ঘাটে নৌকায় চড়েই আমাদের মনে হয়েছিল। এই সুযোগে নেমে এল লক্ষ্যস্থল, ইতিহাস। আমি শুধু রসিকতা করেছি, কিন্তু সে আবেগভরে যা বর্ণনা করেছিল

তার অনেককিছুই মন ভরে আছে।

এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা। এপার গঙ্গাই ছিল আর্যাবর্ত, যারা আনুমানিক প্রায় দুহাজার বছর আগে হিন্দুকুশ পর্বতমালার পথে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন উন্নততর অস্ত্র, যুদ্ধশাস্ত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার অধিকারী। সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য সে জনগোষ্ঠী চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল। তাঁরা, প্রত্ন সংস্কৃতিতে সম্পন্ন তখন বর্তমান সমাজকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করেন; এবং যেসব উপাদান ছিল সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়, সেগুলো আত্মসাৎ করেন। অনার্য দেবতা জিও ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে মহেশ্বররূপে ত্রিমূর্তির একজন হয়ে যান।

দশপ্রহরণী দুর্গার হয় উৎপত্তি। এগুলো বিজেতা-বিজিতের কৃষ্টি সমন্বয় ব্যতীত কিছু নয়। আর্যদের উজ্জ্বল অগ্রাভিযান কিন্তু গঙ্গা তথা পদ্মা পর্যন্ত এসেই স্তিমিত হয়ে যায়। হয়ে যায়, যদিও বনবাসের সময়ে অর্জুনের মণিপুর রাজ্যে গমন এবং মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হবার কিংবদন্তী আছে। বিদেশী বা ভারতীয় রাজারা সমকালীন গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্র, কলিঙ্গক জঙ্গলকে পদানত করেছিলেন ঠিক, কিন্তু বঙ্গ ও সমতটকে কব্জা করতে পারেনি। অব্যাহতভাবে বঙ্গ ও সমতট ছিল মুক্ত, স্বাধীন। এই ভূখণ্ডের সমৃদ্ধি ও সার্বভৌমত্ব এমনই দুর্জয় ছিল পঞ্চ পাণ্ডব একদিকে হাত বাড়াতে ভীত হয়েছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব উনপঞ্চাশ চৌদ্দ সময়ের গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস। তিনি লিখে গেছেন, রাজা স্কান্দামাসের দুহাজার অশ্ব, দুলক্ষ পদাতিক, দুহাজার যুদ্ধরথ, আর চার হাজার সুসজ্জিত রণহস্তী আছে। সোৎসাহে সোজা হয়ে বসেছিল আবু নওশাদ, বলেছিল, জানিস? কুমিল্লা জেলা স্কান্দ্রা নামের একটি গ্রাম আছে। এই নামের সঙ্গে স্কান্দ্রামাসের কোনো সম্পর্ক নেই,। আমরা বলতে পারবো না। আলেকজান্ডার বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন নিশ্চয়ই। উত্তর ভারত জয় করার পর পূর্বদিকে গুপ্তচর পাঠালেন। তারা ফিরে গেল। গিয়ে বলল, গঙ্গার ওপারে যে রাজ্যে তা অত্যন্ত শক্তিশালী। সেদেশের রাজার চার হাজার হস্তীর এক দুর্ধর্ষ বাহিনী আছে। তখন মহাবীর গুটিয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই। এতগুলো সুশিক্ষিত হাতীর কথা শুনেই হিরো সাহেবের প্যান্ট ঢিলা। এরপর খিক্‌খিক্ করে হাসছিল।

এই রাজ্যের নাম ছিল গঙ্গোরিডাই। এর অন্তর্গত গাঙ্গে বন্দর থেকে সূক্ষ্ম মসলিন পশ্চিমে রপ্তানী হোত। অনেকে লিখেছেন। কারতিয়াস, কান্তিবাস। মিশরীয় জ্যোতির্বিদ টলেমি। নবম শতকের আরব পরিব্রাজকেরা, একাদশ শতকের আল ইন্দ্রিসী। চৌষট্টি খ্রিষ্টাব্দে রোমান ঐতিহাসিক একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ক্যাপসিয়ান।

এখানে ব্রহ্মপুত্র নদ আরও সংকীর্ণ হয়ে গেছে, আর যে ক্ষীণরেখার কিছু পানি তরতর করে চলে, তাও দুদিক থেকে সবুজ ধানক্ষেতে চাপা। সামনেই চরলক্ষীপুর, স্মৃতিধন্য আমাদের গ্রাম। তার কাছাকাছি যেতেই রাত নেমে এসেছিল।

একটানা বকর বকর করছিল লগি ঠেলতে ঠেলতে, শেষদিকে ঠাট্টা-তামাশার ঢং রংচং ছিলো না। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে বলে উঠল, সোনা মৌলার লোকরা বেশ গইনতা গর্ত খুঁড়ছিল, নিচে কিছু মাডি চাইল্যা মেহেরজানরে কোমর ইস্তক ঢোহায়ঃ উপরে কাডের খুডি গাইড়া তাইরে মোডা দড়িদা বানছিল। কত কান্নাকাডি করলো, গলা ফাডাইয়া চেঁচাইলো। কেউ হুনলো না। মৌলার হুকুমে একদল জোয়ান আদমি মারতে লাগল। মারলো মারলো মারলো। একশো একটা শক্ত শক্ত পাথ্‌থর।

পাথর? পাথর? হঠাঠ একটা মোচড় দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল নওশাদ, ডিঙিটা দুলতে

লাগল। সে চেঁচিয়ে বলল, পাথর। পাথর কোথায় পাবে ওরা, পাথর? এটা লাল মাটির পাহাড় এলাকা ঠিক, কিন্তু এখানে তো পাহাড় পর্বত নেই। পেয়েছি পেয়েছি। তসলিম, ইউরেকা! আমি নিশ্চিত এইসব পাথর প্রস্তর যুগের চিহ্ন। সঠিক জরিপ তারপর খনন। তখন আসল পেয়ে যাবো নব্যপ্রস্তর যুগের নানা নিদর্শন, প্রত্ন প্রস্তর যুগের হস্তকুঠার। কিরে কথা বলছিস না যে, আমি ঠিক বলছি না?

হ্যাঁ ঠিকই বলছিস। আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আস্তে করে বললাম, প্রাচীন ব্রাহ্মপুত্র সভ্যতা না হয় আবিষ্কার করলে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলতে হবে। আমার প্রশ্ন, এইসব লোকজন আসলে কি যারা প্রস্তর নিক্ষেপ করে একটা যুবতীকে মারল?

এরা? এরা? একটু যেন থতমত খেয়ে যায় নওশাদ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, এরা এককালের মানবাকৃতি একপ্রকার জন্তু, যাদের ধমনীতে এখনো প্রত্ন প্রস্তরযুগের রক্তধারা বয়ে চলেছে। কিরে ঠিক বলছি না? কিন্তু আমারও একটা প্রশ্ন আছে, মালুভাই, তুমি শোনো— আমার প্রশ্ন; যখন একশো একটা পাথর মারছিল তখন গ্রামবাসীরা কোথায় ছিল? তারা কেন এগিয়ে এলো না, বাধা দিলো না।

আমরা আছলাম। লগি ঠেলা থামিয়ে বলল মালু ভাই কিন্তুক কিছছু করতে পারি নাই। ওদের দল চতুর্দিগে খাঁড়াইয়া আছিল। হাতে অস্ত্র। লাঠিসোটা বল্লম ট্যাটা রাম দাও!

হাড্ডিপাড্ডি ভাঙা গতর লেডিয়ে ভিজা, কোনরহম গর্ত থন উইঠ্যা বাড়িৎ গেল, ফাঁস চিল। এর লাইগ্যা দায়ী ক্যাডা? কাঁরা? তাগো কিছছু অইবোনা? ন্যায়বিচার ছাড়া আর কতকাল চলতো, দ্যাশটা?

অকস্মাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল আবু নওশাদ, সে চিৎকপার করে উঠল, তোমরাও কেন অস্ত্র হাতে নিলে না? সত্যের জন্য কেন লড়াই করলে না শয়তানের সঙ্গে? তোমরা তো একালের মানুষ? এই যুদ্ধে তোমরা যে কজন মরতে, তারা বিনাবিচারে বেহেশতে যেতে। মেহেরজান তো ছিল মৌলার তিন নম্বর বিবি, অনেক জুলুম করেছে, তারপর তালাক দিয়েছে। ওর জন্য জায়গায় আবার বিয়ে হল, ওরা তো ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করেনি। তবে এই শাস্তির নাম কি?

মধু মাস, তবু বিকেলের দিকে ঘন কালোমেঘে আকাশ ছাওয়া ছিলো এবং সন্ধ্যার পরে এক পশলা বর্ষণ হয়ে গেল।

এলাম গেরামে। অনেকদিন পর, কিন্তু আত্মীয়বাড়ীতে পৌঁছে চোখে পড়ল যে এলাহী কারবার, তার কারণ অন্য; সাধারনত দেখা যায়, বাইরে তারা বদমেজাজী তারা ভিতরে রসিক। কিন্তু আবুল বাশার, মানে বাশার মামার ভিতর-বাহির এক। তাঁর মধুর হৃদয়, মধুর ব্যবহার। অনেক জমিজিরাত, ভালো গিরস্ত; এবং পাঠের ব্যবসায়ী হিসাবেও নাম আছে। সকলের প্রিয়পাত্র, তবু দেহরক্ষী ছাড়া চলাফেরা করেন না। গায়ের ঘাট ইস্তক গিয়ে আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। রাতে উঠোনে হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলো, বৈঠকখানাতেও আরেকটা। খাসি জবাই করেছিলেন, পোলাও-কোর্মা রেজালা, রীতিমত উৎসব। শেষদিকে ঘরে পাতা দই, সঙ্গে রসগোল্লা। সারাদিনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, রাত সাড়ে দশটার দিকে শুয়ে পড়লাম। উপরে টিন, কিন্তু পাকা দেয়াল। আমাদের কামরাটি উত্তর দিকে। দুদিকে দুটো খাট। হারিকেনের সলতে কমিয়ে এককোণে রাখা হয়েছে। বাইরে বারান্দায় লাঠিয়াল প্রহরী।

অমাবস্যা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু এত অন্ধকার কেন? রাত নেমে আসার কিছু পরেই ঘন তমসার তলে গ্রামটা যেন হারিয়ে গেল। উত্তর দেয়ালের দুটো বড় জানালাই খোলা

রাখলাম, আহ্ বসন্তের হাওয়া!

অল্পক্ষণেই গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিলাম, একসময় খুটখাট আওয়াজ। চোখজোড়া খুলে যায়। তখন পায়ের দিকে ছোট টেবিলটার উপরে জ্বলজ্বলে হারিকেন। ওর চৌকির কোণে যেন কি করছে আবু নওশাদ। একি অদ্ভূত! ঝট্ করে উঠে বসলাম। বিছানা থেমে নামি। গলা থেকে স্বর বেরুতে চাইছিলো না, চেষ্টা করে বলে উঠলাম, কি? কি করছিস তুই নওশাদ? এতরাত্রে? সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল তসলিম। তোকে ডাক দেয়ার শক্তিও আমার ছিলো না। কি সর্বনাশ? কাছে যাই, জিগগেস করলাম, কি হয়েছিল? এই দুই জানালায়, যেন মাটির ভিতর থেকে উঠে দাড়ালো— ছয়টি গোবদাগাবদা, ভৌতিক মূর্তি। প্রত্যেকের হাতে ঝকমকে ধারালো বর্শা। তাকালো আমার দিকে। আমি তক্ষুণি খাট থেকে গড়িয়ে পড়লাম, নিচে চলে গেলাম। একটু পর নাইট গার্ড নিশতারকে ডাকলে সে এল। এখনো আছে বাইরে, দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, চিন্তার বিষয়। ডাকাত ভাবা যেত, কিন্তু এ বাড়িতে ডাকাতি? অসম্ভব। অন্য কিছু হবে, অন্য কিছু! কিন্তু এগুলি কি, টেবিলে। শাদ শাদ বিড়ি। বুঝতেই পারছিস। নওশাদের ঠোঁটে ম্লান হাসি খেলে যায়, সে বলল, টানবি একটা? ভালো টানলে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাবি। আমি দু'তিনটা জ্বালাই, যখন মন্দাকে দেখতে চাই। তুই একটা নে, মৌরিকে দেখবি, কাছে আসছে। মাথাটা তোর বিগড়ে গেছে নওশাদ, আবোল তাবোল বকছিস। আমি হাজির থাকতে কখখনো তুই মাদক নেশা করতে পারবি না। ওগুলো আমি হাতে তুলে নিলাম। আমাকে সে দুহাতে জাবড়ে ধরলো, কিন্তু ওর জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার শান্ত চাহনির কাছে হেরে গেল।

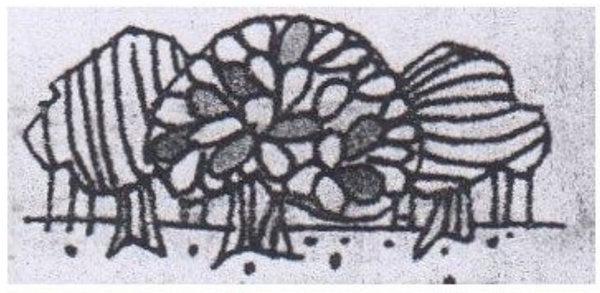
পরদিন সকালে ভারী নাশতা, পরোটা-গোশত। তারপর দল বেঁধে যাত্রা। চরলক্ষ্মীপুর থেকে হেঁটে আড়িয়াল খাঁ, বেশি পানি ছিলো না। তবু ছোট ডিঙিতে পার হয়ে উয়ারী বটেশ্বর। সেখানে গ্রামের প্রান্তে বটগাছ। তার কাছাকাছি সেই গর্ত। তার মধ্যে এখন একটা গাছের গুঁড়ি। বাঁশের খাপ দিয়ে বেড়ার মতো ঘেরাও করা। কাছাকাছি, কালোকালো, অনেকগুলো পাথর তখনো ছড়িয়ে ছিল। রীতিমতো উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত আবু নওশাদ। সে তুড়ি দৌড়ে কাছে গেল এবং ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে একটা পাথর ধরতে চেষ্টা করছে— এমন সময় ছুটে এল পাহরাদাররা বটগাছের তলা থেকে। একজন চিৎকার করে ওঠে, ধরবেন না, ধরবেন না। এসব পাথর, শরীয়তের জিম্মাদার। আপনে দোজগে যাইবেন হেইড্যা আমরা চাই না। আমাগো হুজুরের মানা আছে। আপনে বাশার সাবের আত্মীয়, তাই কিছু করলাম না।

আমাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত করতে হল। সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ ভৈরববাজার ফিরে এসে যখন ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম, মগ্নস্বরে প্রবন্ধের ভাষায় নওশাদ বলল, পৃথিবীতে বিশেষতঃ আমাদের দেশে দূর-দূরান্তে পাহাড়ে-জঙ্গলে, নির্জন এলাকায় অনেক গণসমাজ টিকে আছে, যেখানে ইতিহাস থেমে আছে। সেসব জায়গায় পুরাতন প্রস্তরযুগ পাওয়া যায়। কিন্তু তার বেশিরভাগই স্থবির। একপ্রকার হিংস্রতা তাদের আত্মরক্ষা। চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাদের আবিষ্কার করা যাবে না।

এ মন্তব্যের সবটা মগজে ঢুকলো না, আমি বোকা মতো ওর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ি ছুটে চলেছে খচরখচর।

এপ্রিল, ১৯৯৬

অপচ্ছায়া



এমনি হচ্ছে রোজ রোজ। এই মেঘ, এই বৃষ্টি। তারপর মাঝে মাঝেই ঘোর বর্ষণ। একটানা, ঝরঝর, ঝম্‌ঝম্‌। কারুর খেয়াল নয়, খামখেয়ালিও না। তবু সবকিছু যেমন ঘটছে, আজকাল যেন একটু ব্যতিক্রম। পহেলা আষাঢ়ে তেমন কালো মেঘও দেখা যায়নি, কেবল ছিল ধোঁয়াটে হালকা আস্তরণ অথচ এখন আকাশ ভাঙা বর্ষা, সামনে আরও বড় জোয়ারের পূর্বাভাষ আসছে কি? নদ-নদীতে আবর্ত, সাগর উত্তাল, শ্রাবণে কি আসবে কেউ জানে না।

এখন এই সন্ধ্যার আগটাতেও ছায়া পড়েছিল, এবং রাতে আগেই, কিছু অন্ধকার নিচে বাগানে হাঁটছিল চাঁদনি। গুড়্‌গুড়্‌ ধ্বনি, মাটিও কাঁপল। হঠাৎ দুচার ফোঁটা গায়ে পড়তেই তাকায় উপরে। ভিজতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভাবে এ সময়টায় নয়। বারান্দায় উঠে আসে এবং তেমনি মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে আনমনা। জারুল গাছের পাতাগুলো কাঁপছে।

অদূরে কর্ণার রুম। একধারে পুরাতন সোফাসেট, অন্যধারে একটা কাঠের চৌকি। তোষকের উপরে চাদর, একটা বালিশও আছে। একদিকে চার পাঁচটি হাতল ছাড়া চেয়ার। একধারে সাধারণ বৈঠকখানা। গ্রাম থেকে কোন আত্মীয়স্বজন কিংবা মেহমান এলে ওখানে তার খাবার ব্যবস্থা হয়। তেপায়ার উপরে কিছু পত্রপত্রিকা ও রঙিন ম্যাগাজিন।

এই দোতালা বাড়ির মালিক শেখ ফরমান আলি। একই শহরের বাসিন্দা। আলি সাহেবের বয়স মধ্যে তিরিশ, তবে বেশ স্বাস্থ্যবান, মনে হয় ভালোই যৌবন আছে। নরসিংদীর ব্যবসা এখনো আছে, তবে ঢাকায় অফিস করেছেন। হালে গাড়ি বদল করেছেন এবং ড্রাইভারও আছে। চেহারায় যেমন একটা অস্থিরতা, আরও কিছু বদল করবেন কিনা, বোঝা যায় না। বারো বছর আগে শাদী মোবারক হয়েছিল। এখন এক ছেলে দুই মেয়ে এবং আরেকটি কন্যা বছর দেড়েক আগে ভুমিষ্ঠ হয়েছে। অফিস থেকে মাঝে মাঝেই অনেক রাত হয়, কখনো কখনো এমনকি বারোটা একটা। আজ বিকেলেই ফিরেছেন। চাঁদনি দেখেছে। ওর সঙ্গে ঠাট্টামশকরাও করেছেন চা খেতে খেতে।

চাঁদনি ঢাকা মেডিকেলের স্টাফ নার্স, সাতদিনের পাওনা ছুটি নিয়ে এসেছে বড়বোনের সেবা শুশ্রুষা করবার জন্য। উপর থেকে কখন নিচে নেমে এসেছিলেন এবং সিঙেল কুশনটায় বসে দামী বিদেশী সিগারেট ফুঁকছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেনি। এবং চাঁদনিও জানতোনা। এসট্রেতে জ্বলন্ত শেষাংশটা পিষে ফেলে উনি উঠলেন। পরনে লুঙি ও ডবল পকেট বুশশার্ট।

আগেও একটু একটু নড়াচড়ার আওয়াজ, শুনছিলেন, এখন কপাটের কাছে এসে ডানদিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন, রেলিংয়ে ধরে মনোরম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদনি। পিঠের উপরে ছেড়ে দেওয়া লম্বা কালোচুল কোমর অবধি।

ফরমানের বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠল, তারপর ঢিবঢিব্‌ হৃৎপিণ্ড, চোখমুখ যেন বেঁকেচুরে যায়।

প্রথমে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত কিন্তু পরক্ষণেই পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। আরেকটু, আরেকটু— এখনো টের পায়নি।

আচমকা, পিছন থেকে দুহাতে জাবড়ে ধরলেন। চাঁদনি ভীষণ ভয় পায়, কাঁপতে কাঁপতে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠতে চাইলো, কিন্তু তখন তার ঠোঁটে মুখে খসখসে শক্ত হাতের চাপ। গোঙাতেও পারলো না।

সজোরে টানতে টানতে হেঁচড়ে নিয়ে আসতে থাকেন কোনোমতে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে চাঁদনি নিজেকে ছাড়াতে। বারে বারে ঝাঁকুনি। মোচড় দিচ্ছে।

চাঁদনি! চাঁদনি!

আহ্ ছাড়েন!

না, না। কাতরানির মতো, অথচ প্রতিজ্ঞার কণ্ঠস্বর।

কেউ দেখে ফেললে ভীষণ কেলেঙ্কারী হবে। চাঁদনি, তার বাহুবন্ধনে থেকেই, হঠাৎ করে ঘুরে চাইতেই প্রমাদ গণে, এক বিদঘুটে, বিশ্রী, হিংস্র চেনা যায় না। চোখ মুখ যেন অন্য কারুর। অন্য কোন অপশক্তির। প্রেতাত্মার কি?

উন্মাদ যেন ফরমান, ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, কিচ্ছু হবে না। চাঁদনি, লক্ষ্মী, আমায় দয়া কর। একটু দয়া।

দয়া! একটি বিস্মিত উচ্চারণ।

হ্যাঁ, দয়া। নইলে আমি মরে যাবো, মরে যাবো।

মরুন গে একশোবার। ডানহাতটা ছাড়া পেলে নখওলা আঙুলে খামচা দিয়ে ধরে তার মাংসল বাহুতে এবং বলতে থাকে, ছিঃ ছিঃ! ছাড়েন আমাকে। নিজেকে সংযত করুন।

প্রেতাত্মার চোখমুখে জাগে আলোড়ন। ফরমান বললেন, আমাকে উপদেশ দিচ্ছ? আমি শুনবোনা। আমি তোমাকে চাই।

ছিঃ! বৌ আছে, ছেলে মেয়ে আছে। এসব বলতে আপনার লজ্জা করা উচিত।

লজ্জা! সে আবার কি? বৌ বাচ্চাদের সুখে রেখেছি, আমিও কিছু চাই। তোমাকে আমি রানী বানাবো চাঁদনি। আমাকে দাও, কিছু দাও।

দূরে, বৃষ্টির সরসর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। চাঁদনি যেন আর কিছু ভাবতে পারছিলো না। হঠাৎ একটা দৌড় দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল।

আচানক কারবার। কিন্তু এ কি একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাত? কি যেন ছিল, কি যেন একটা মনে পড়ে কখনো কখনো। একটা কিছু ছিল, চলে গেছে। একটু একটু যখন জাগত বুদ্‌বুদ্, ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। ভেবেছে ক্ষণিকের রসিকতা।

ভিতরে থরথর কাঁপনি তখনো চলেছে, আর বাইরে প্রথমে কিছু হওয়ার দাপাদাপি তারপর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দোতলার বারান্দার একটি খাম আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাতে থাকে চাঁদনি এবং মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবলেও বাড়িতে আলো জ্বললোনা। কারণ লোডশেডিং। বর্ষণ বাড়ছেই ঝর্‌ঝর্ ঝম্‌ঝম্, আওয়াজ। তার আঁধারে যোগ হতে থাকে।

উপরটা এল আকৃতি। প্রথমে ড্রয়িং, মাঝেরটা ছোট ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় মেহমানদের জন্য এবং শেষেরটা মাস্টার বেড।

ক্লিনিকে প্রসবের পর এখানেই এসে ঢুকেছিল, আপন কামরা, এটাইতো স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই কিনা বলা যায় না, বাচ্চাটা খুব উঁয়া উঁয়া করছিল। বড় বুবুর নাম নাজমুন নাহার কাঁদনি। কাঁদনিটা অবশ্য ভদ্র প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না। চিঠিপত্রে লেখে শুধু বেগম নাজমুন নাহার।

শিশু অবস্থায় খুব বেশি কাঁদত, সেজন্য দাদিমা ডাকা শুরু করলেন, কাঁদনি। এটা এখন বিস্মৃত প্রায়। তবে তার এই ডাকনামের সঙ্গে মিল করেই ওর নাম চাঁদনি রেখেছিলেন মুরুব্বিরা, এটা ঠিক। অন্য একটা যৌক্তিকাও ছিল, তার ছিল চাঁদপনা মুখ। রূপবতী ছিল, বয়স বাড়তে থাকলে আরও বোঝা যায়।

চাঁদনি বুবুর ঘরের দরোজার কাছে যায়, দেখল চার্জার জ্বালানো হয়েছে। বাড়ির একমাত্র চাকর কালাগাজি, দেখতে ও জবানে যাই হোক, কাজকামে ভালা, এক প্যাকেট বড় মোমবাতি এনে তেপায়ার উপরে রেখেছে। কি হয়েছে বুবু? খুকি কাঁদছে কেন এত? বৃষ্টি-বাতাসের আওয়াজের মধ্যেই কিঞ্চিৎ কাঁপা স্বরেই জিজ্ঞেস করে চাঁদনি এবং আস্তে হেঁটে কাছেও গেল। ওদিকে বড় ডবল খাটটি সাজানো গুছানো পাশে একটা সিঙেল চৌকি।

মনে হয় অভ্যাস। আমারই মতো—

চাঁদনি গিয়ে বসে বোনের পাশে, উসকো চুল, আরও কি যেন বলবে বলবে কিন্তু ঠোঁট খুলতে পারছে না।

নাজমুন তা লক্ষ্য করল, প্রশ্ন করে, কিরে চাঁদনি কি হয়েছে তোর?

কই কিছু নাতো! হঠাৎ হকচকিয়ে উঠেছিল, নিজেকে সংযত করে।

হোস্টেলে তো ভালো থাকতিস—

এই বাসাটা তো আরো ভালো। তুমি আছ।

না কোথায়, আমি তো চলাফেরাই করতে পারছি না। অঞ্জুর মা'ও এমন, ভালো মন্দ রান্না করবে তাও বোঝেনা।

না, না বুবু। এসব কি বলছো। এত মজামজা গরম গরম খাবার আমরা খেতে পাই নাকি? সেবিকা সদন মানে পাইকারি রাধন! চাঁদনি হাসলো। সঙ্গে নাজমুনও কিছুটা।

খুকিকে কোলে নিই আমি?

না, না লাগবে না। এই তো তোর গন্ধ পেয়েই থেমে গেছে! বড় হবে তো, খালাকে বোঝা ওর কর্তব্য!

হুঁ, বুঝেছি। তোমার কিছু লাগবে বুবু?

না। কেন?

এমনি, তাহলে আমি একটু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই? বৃষ্টি দেখতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে।

অবশ্যই, এর জন্য আবার অনুমতি চাইতে হবে নাকি?

চাঁদনি আস্তে আস্তে হেঁটে আসে বারান্দায়। বাতাস কমে গেছে এখন স্থির বারিধারা। তবু বৃষ্টির ছাট আসছিল, একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

দাদু সাইদুজ্জামান স্বদেশীর চক্করে পড়েছিলেন। ছিলেন স্থানীয় গান্ধীর এক নম্বর দোস্ত ও ধামাধরা; কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য ছোট গান্ধী দূরে থাকত, বল্লভভাই উপাধিও নিতে পারেননি, যদিও বেশ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি খদ্দর পরতেন, সুযোগ বুঝে কংগ্রেসী টুপি এবং একটা চরকাও জোগাড় করেছিলেন। দাদি হাফিজা খাতুন স্বামীর আদর্শ মেনে নিয়েছিলেন। ঘরে দামী পালঙ্ক থাকা সত্ত্বেও, তক্তায় শয়ন করতেন, নাকি মেরুদন্ড সোজা রাখতে তা দরকার। সেজন্য তাঁর নাম হয়ে যায়, 'তক্তাবিবি।' দাদু ইন্তেকাল করেছেন উনানব্বই সালে পঁচাত্তর বছর বয়সে দাদি এখনো টিকে আছেন। ওদেরই উপযুক্ত ছেলে তাদের বাবা। তার বয়স এখন চৌষট্টি বছর। স্থানীয় হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন, অবসর

নিয়েছেন। কিন্তু টুইশানি এখনো ছাড়েননি। পয়সাকড়ির খবর ততটা নেই, কিন্তু বংশের ঠাঁই আছে। দাদুর রাখা দোতালা বাড়িটার নাম মহামহল 'মহাত্মা থেকে মহা ঃ এটা ও তার বাসিন্দারা এখনো শহরের অনেকের সম্মানের পাত্র।

নিচতলায় থাকে ওদের একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাত্র গোল্লা। তার পুরানাম কাজি কামরুজ্জামান পাটোয়ারী। ডাকনাম যাঁরা রেখেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে ছিল বোধ হয় রসগোল্লা। কিন্তু এখন শুধু গোল্লা আছে। গ্রীন রোডের ভিতরে একটা বাসা নিয়েছে। ওর বৌ তুসি। মডেল হতে পারেনি, হয়েছে মডেলরানী। তার পরিচালিত বিউটি পার্লার ধানমন্ডিতে বিখ্যাত। সঙ্গে কোণের রুমে থাকে শ্যালক গোবরা। ছোবড়ার মতো দেখতে, কিন্তু গুন্ডা হিসাবে নাম আছে।

চাঁদনির চার বছরের আর কাঁদনির মাত্র দুবছরের বড়, নরসিংদি যাওয়া আসার ধকল এড়াতে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ভাইয়ের বাসায়ই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আসল বাড়ির ছোট বড় সবাই এখানে চলে এসেছে।

নিচতালার দক্ষিণ অংশের অনেকটা জুড়ে বড় কিচেন। সেখান থেকে মা জননী জাহেদা বেগমের বাজখাই গলার আওয়াজ আসছিল।

চাঁদনি, ও চাঁদনি। মেয়েটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে। চাঁদনি—

এই তো আমি মা! বাগানে আসবো? কাজ আছে?

কিন্তু কেউ শুনলো বলে মনে হলো না।

তার সঙ্গে এগারো বছরের ভেংরি ছিল, হাবামেয়ে। ওর ঝুপড়িটা প্রায় ভরতি। ওকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় ওঠে চাঁদনি, কিচেনের কপাটের কাছে যেতেই মা চোখ পাকিয়ে তাকালেন, বললেন, এতক্ষণে তোর সময় হলো?

বারে! আমি ফুল তুলছিলাম তো। এই দ্যাখো, কত্তো।

উনি খুশি হলেন না, বললেন, এই ফুলে কোন কাজ হবে না।

কেন? চাঁদনি কিছু বুঝতে পারলোনা। প্রশ্ন করে। আরও বলল, কাগজের বা সিল্কের ফুল লাগবে নাকি?

অতশত জানিনা বাপু। আমরা তো সোনার অলঙ্কার পরতাম। একটু থামলেন। আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বললেন, আমাদের গোল্লার বৌটা আছে, না? আচ্ছা, কাঁদনি কোথায় বলতো?

চাঁদনি ঝট্‌পট্‌ জবাব দেয়, কোথায় দেখছি না তো? উপরে আছে বোধ হয়। এদিকে না তাকিয়ে উনি মন্তব্য করলেন, কোথাও দেখবিনা। ওকে নিয়ে গেছে! নিয়ে গেছে!

তার মানে? কে কোথায়? আমি তো দেখিনি?

ছিঃ! ছিঃ! একি বলছো তুমি, তওবা, তওবা।

কেন? তোরা কি আমাকে পছন্দ করিস? আমি সব বুঝি। একটা নতুন মা হলেই তোদের আশা মিটত।

আই প্রটেস্ট। চাঁদনি রীতিমতো উত্তেজিত, সে মায়ের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

একটু পরেই বুঝতে পারে ওই মন্তব্যের মর্ম, যখন কিছু সোরগোল শুনে নিচে গেল।

তুমি নিয়ে গিয়েছিলে ননদকে, তার পার্লার থেকে সাজিয়ে এনেছ।

মাও নেমেছিলেন, থপ্‌থপ্‌ ভারি চটিজুতো পায়ে। চাকর আসগর সিঁড়ির দিকে গিয়ে একটা কাগজ তাঁর হাতে দিয়েছিল।

করিডোর, কিছুক্ষণেই ওদের বেডরুমের কাছাকাছি। সুসজ্জিতা, লজ্জাবনতা। মেয়েকে ভালোমতো উনি দেখলেন। ডাক দিলেন, বৌমা! বৌমা!

তুসি আসে। কাগজটা উঁচিয়ে ধরে উনি প্রশ্ন করেন, এটা কি?

এমনিতে সৌজন্যের দেবী প্রতিমা।

আম্মাজান, ঘরে আসুন।

না, এখন যাবো না। তুমি যাও, এখন যাবো না। তুমিই বল, এটা কিছুনা। আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।

আবার হয়তো টুকিটাকি কাজ করছিল, শাশুড়ির গলা শোনামাত্র জলদি পর্দার কাছ থেকে বলে, কাঁদনিকে সাজিয়েছে এটা তার বিল। আমাদের রেট দশহাজার, এখানে তার অর্ধেক ধরা হয়েছে।

হুঁ। উনি গম্ভীর, বললেন, কাঁদনি তোমার ননদ। ওর শুভবিবাহ। ওকে সাজিয়েছ। ভালো কথা। কিন্তু তার জন্য পয়সা নেবে! মিঠেল আওয়াজে হেসে উঠল।

উত্তর দিল, এটা আবার পয়সা কি। তিনটা বিউটিশিয়ান তিন ঘন্টা ধরে কাজ করেছে ওটা ওদের মজুরিমাত্র। জিনিশপত্রের দাম আমি দিচ্ছি। বোঝেন তো, আমরা প্রফেশনাল। দোকান ভাড়া শিল্পী কারিগরদের বেতন যানবাহন, সব খরচ আমাদের বহন করতে হয়। কাঁদনিকে বিয়ে দিচ্ছি আমরা এর তো একটা বাজেট আছে।

হঠাৎ যেন টের পেয়েছে, কামরা থেকে গোল্লা বেরিয়ে এল।

আকস্মিক এমন একটা ঘটনায় পরিস্থিতি যখন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল, চাঁদনির ভালো লাগছিল না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে এল। একা, একা। নানা রকম কথাবার্তার শব্দ শুনছিল। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে। পাত্র পক্ষের অভিভাবকগণ আসবেন রাত আটটায়। যথেষ্ট সময় আছে। এর মধ্যে সব মিটমাট হয়ে যাবে, হয়তো। ভাবীর ব্যবহারটা সত্যই আপত্তিকর, খরচ নিলে পরেও এটা হতে পারত। মা জাহেদা বেগম রাগী মেয়ে। মাথা গরম হলে যাচ্ছে তাই করতে পারেন।

আনমনা চাঁদনি, দুদিকে দেয়াল। মাঝখানে বাইরে যাওয়ার গেট। ওখানে একটা পাতায় ছাওয়া চাঁপা গাছ আছে। একটা গাড়ি যেন এসে থামল। আস্তে হেঁটে দরোজার কাছে যায়, উঁকি মেরে দেখে। তাজ্জব, তাজ্জব। ওর হবু ভগ্নিপতি! অনুষ্ঠানে উনি তো আসতে পারবেন না, থাকতে পারবেন না। তবে, এখন কেন? গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ফিক্‌ফিক্‌ হাসছিল। ইশারায় কাছে ডাকে। এমন অবস্থায়, না গিয়ে করবে কি। থতমত খেয়ে যায়। তবু হাত নেড়ে আহবান করতে থাকলে, একপা দুপা করে যায় কাছাকাছি। আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে নিলেন ফরমান, লোকজন ছিলোনা, দুহাতে জড়িয়ে ধরে প্রবল একটা চুম্বন করলেন। কোনরকমে নিজেকে ছাড়ায় চাঁদনি এবং এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে আসে। সেদিন তো বৃষ্টি বাদল কিছুই ছিলনা।

আস্তে আস্তে বর্ষণ থেমে গেলে, চাঁদনি যখন বড়বোনের দিকে বোবাচোখে তাকায় তখন নাজমুন বুঝল, কিছু একটা হয়েছে। প্রশ্ন করতে থাকে, উত্তর যা পায় সেগুলো যাচাই করে

মনে মনে। এ বাড়িতে একটা গাণ্ডা আছে, গুণ্ডা প্রকৃতির একটা জানোয়ার আছে, তার চোখমুখ চেহারা প্রেতাত্মার মতো। চাঁদনি সব বলতে পারে না, তবু অল্প কথায় অনেক কিছু বোঝালো। নাজমুন যেন দিশেহারা, কে এই লোকটা? কালুগাজি তো কখনো হতে পারে না। সন্ধ্যার আবছায়ায় জড়িয়ে ধরবে, ঘরে যেতে পারে এমন দুঃসাহস করবে না।

বড় বোনের দু'হাত ধরে চাঁদনি অনুরোধ করে, ব্যাপারটা যেন চেপে যায়। নাড়াচাড়া না করে। আবার যদি কিছু ঘটে, তখন দেখা যাবে। কিন্তু নাজমুন মানলোনা। ছোটবোনকে, ফিস্‌ফিস্ করে, কিছু বুঝিয়ে দিল। রাত দশটা, এগারোটা, বারোটা, একটা।

ঘরের ভিতরের দরোজা খোলা রেখে বুবুর অল্প দূরত্বে শুয়েছে চাঁদনি। কিছুক্ষণ যায়। ডবল খাটে শুয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ফরমান আলি, তার নামডাকানো শোনা যাচ্ছে।

কাঁদনি সাবধানে উঠে এল চাঁদনি জেগেই ছিল। সিদ্ধান্ত মতো সে বোনকে নিজের শয্যা ছেড়ে দিয়ে বোনের খাটের বিছানায় গিয়ে শুল। কোলের কাছে শিশু খুকি।

টক্‌টক্ টক্‌টক্। দেয়ালঘড়ির দোলক দুলছে একটানা। সময় বয়ে যাচ্ছে। রাতি ঘোর ক্রমশ, নিস্তব্ধ। তমসা, তমসা। যেন তরঙ্গে তরঙ্গে এসে ঘিরে ফেলেছে সব। সব ঘরেই কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

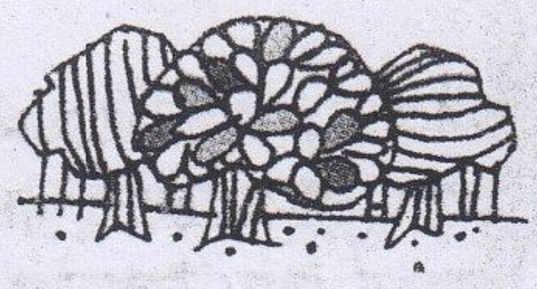
একসময় পা'য়ের মৃদু আওয়াজে যেন শুনতে পায় নাজমুন, সে হুঁশিয়ার। ডান হাতের নিচের অংশ ভাঙা, কোচের মতো বড় বোতলটা তুলে নেয়। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করলেও, সে স্থির। লোকটা কিছু কিছু হাঁপাচ্ছে। তারপর কাপড় উল্টাতে থাকে এবং আস্তে আস্তে তার দেহের উপরে বসে পড়ে। তার দিকে নিচু হতেই ভাঙাবোতলের তলার চোখা চোখা অংশটা সজোরে শরীরধারী প্রেতাত্মার মুখজুড়ে বিধিঁয়ে দিল। চেপে ধরে প্রাণপণে. আরো একটা ভরাট চিৎকার, কাছেই ছিটকে পড়ে আগন্তুক।

পরদিন হসপিটালে নিয়ে গেলে, হোঁচট খেয়ে পড়ে এই দশা হয়েছে বললেন, অনেকে দুঃখ পেল। একটা চোখ বাঁচলোনা।

যখন আরোগ্য লাভ করলেন, নাজমুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। আর ফিরে আসবেনা, এ লোকের কাছাকাছি থাকবেনা। সুযোগ পেলেই ও মেরে ফেলবে তাকে, যাবার সময় বলল, অনেক কাল ধরে ঢাকা শহরে আছি, বাপের বাড়ি নাইওর যাচ্ছি।

নভেম্বর ২০০০

শুধু ভালোবাসা



এখন ফাল্গুন। একুশের মাস, রক্ত ঝরার মাস। রক্তের রং লাল, মিল তো কোথাও একটা থাকাই উচিত। কিন্তু এখন বাইরে কৃষ্ণচূড়া পলাশ শিমুল ফুলের বাহার কোথায়? শীতের প্রথমে সেই যে পাতা-ঝরানোর পালা শুরু হয়েছিল তারই যেন শেষবেলা এখন, ডালপালা বিবর্ণ শ্রীহীন শুকনো, মরতে মরতে কুঁকড়ে আছে। কোথাও কোথাও ওপরে ঝাঁটার মতো, কোথাও কোথাও অলীক হাতের অনেক আঙুল। যে বৃক্ষরাজি নিষ্পত্র নয়, বেজায় ধূসর। তার ওপরে আছে আরও কিছু— এই যেমন আজকেও আকাশটা বিকাল থেকেই মেঘে-ছাওয়া, আর সন্ধ্যার কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকা হাওয়া, হঠাৎ এক পশলা বড় বড় ফোটা জানালার কাচে ঝাপটা মেরে গেল।

ওদিকে রাস্তার ধারের বনানীতে একটা শিসধ্বনি, তারপর বেপরোয়া দাপাদাপি।

আনন্দ, আনন্দ। শোনা যায়, বসন্ত আনন্দের মন্ত্রনা; কিন্তু ঘটনা কি, মাঝে মাঝে বড় মাপের যন্ত্রনাও।

কিছুক্ষণে হয়তো নামবে দুর্যোগঘন রাতের মত্ততা, আরও আওয়াজ হবে জানালায়, দরোজায়, আর দক্ষিণের এই কক্ষটিও, বিজলি ও বৃষ্টিতে, দ্রিমিদ্রিমি মন্দ্রিত হতে থাকবে, হিজিবিজি সঞ্চরমান ছায়া ও অন্ধকারের আবরণে, থেকে থেকে অথৈ সাগরে যেন একটি জাহাজ, আন্দোলিত তরঙ্গে হেলছে দুলছে।

ওদিকে একটি খড়খড়ির একসাইড আলগা হয়ে গেছে বুঝি, তার ধপর্ ধপর্ শব্দে ঘোর কেটে যায়— যদিও সবটা নয়। এখনো আচ্ছন্নতা। ঘুম-ঘুম, তন্দ্রাভাব। বারো বছরের প্রবীণ স্কচের গেলাসটা কখন হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মেঝের কার্পেটে গড়াগড়ি দিয়েছে, সে খেয়াল ছিল না। খাটের ধারে পিঠ ঠেকিয়ে দুপা লম্বা করে নিচেই বসেছিল, ডানদিকে ছাইদানি। সিগারেটের পেষা গোড়ায় ভরে আছে। কালো সারমেয় বোতলটা বাঁ-ধারে, হাতের কাছাকাছি। যত ব্যথা তার চেয়ে অনেক বেশি কথা ও কাহিনী, একলা-একলা দেদার লালপানি গিলতে গিলতে অত্যধিক আমেজে, মাথাটা এলিয়ে পড়েছিল। সারামুখে ঘাম-ঘাম, ক্রমে নিমজ্জিত। একটার দিকে কারেন্ট চলে গেলে সিলিং পাখাটা থেমে যায়, নিভে যায় নীলাভ আলো। আরও কিছু ঘটনা ঘটে, পর-পর। একান্তে, নিঃশব্দে। বাতি গেল, বাতি এল। খাটের শিয়রের কাঠে ধরে উঠে দাঁড়ায়, এখনো টলছে, একটু-একটু। বাঁহাতে টাল রেখে ডান হাতে টেনে টেনে ফেলে ওপরে গুটানো মশারির ধারগুলো তারপর ঢুঁশ মারার মতো ভিতরে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে একটা বালিশে, তার পাশে আরেকটা বালিশ।

কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকার পর তাকায় মিট্‌মিট্ করে অর্ধেক বিছানা শূন্য। অথচ যথাসময়ে আজকেও এসেছিল, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ, কুণ্ঠিতভাবে আর ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সত্য, অত্যন্ত কঠোর হলেও, সত্য সামনাসামনি, খোলাখুলি কঠোর সত্যকেও মেনে নেয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি আছে, তাইতো মনে হয় কিন্তু প্রতারণা? একান্ত অসহ্য। এমন ছোট ঘরে সে যে ইচ্ছা করে গিয়েছে সেটা তার দেশপ্রেম ও মানবিকতা। এমনিও হয, গোধুলি লগ্নে দেখেছিল-ডাগর ডাগর চোখজোড়া,

কেমন মায়াভরা চাউনি-যেন চিরন্তন বাংলার রূপ। হ্যাঁ, কান্তা সুন্দরী; কিন্তু মনে হয়েছিল, তারও চেয়ে বেশি, মোহময়ী। অলঙ্কার কাপড়-চোপড় আর অনুষ্ঠানের সমস্ত খরচের টাকা অগ্রিম দিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে বিয়েও করে ঘরে এনেছে। কিন্তু, কিন্তু যেন পোকপড়া সিঁদুরে আম একটা, এমন বিশ্বাসের ঘরেও আগুন?

এত অল্প সময়েই কত আশা, স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত। বিয়ের দিন, মাঝরাতের পর সমস্ত বাড়িটা নিঝ্‌ঝুম হয়ে গেলে প্রথম মুখোমুখি হয়েছিল ঃ বেনারসী শাড়ি সোনার জেওর মেহেদী সুগন্ধি সৌরভে অতিশয় মনোরমা; কিন্তু ঘোমটা উঠিয়ে চিবুকে ধরে সোজা করলে দেখে, গাল ভাসছে অঝোর কান্নায়! মনে হয়েছিল, এটা স্বাভাবিক। এক জীবন থেকে সম্পূর্ণ অন্যজীবনে পদার্পন, অশ্রু সাগরের সেতু পেরিয়ে যাওয়াই তো নিয়ম— কিন্তু তার একটা সীমাও আছে। আদরে জড়াতে গেলে বারবার ঠেলে দিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, প্লিজ এমন করবেন না। আমি ওসব পারবোনা। আমাকে মাফ করবেন।

বাসর ঘরে এমন ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়েছিল বটে কিন্তু তবু ধৈর্য হারায়নি, যদিও অসম্মতির কঠোরতায় মনের মধ্যে একটা প্রশ্নের রেশও জেগে উঠেছে। কোমল স্বরে বলেছিল, তোমার হয়েছে কি কান্তা? আমাকে পছন্দ হয়নি?

না, তা কেন। মৃদুস্বরে জবাব দিয়েছিল কান্তা, আপনি অনেক মহৎ। আমার দুঃখী বাবাকে যে সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই।

তাতে হয়েছে কি। আমার সামর্থ আছে, দিয়াছি। কিন্তু আমার মহত্ত্ব আমার দয়া হয়ে দাঁড়াবে তাও তো ঠিক নয়।

এরপর দুজনেই চুপ, অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিল। তাজ্জব, এমনি ভাবেই দুদিন দুরাত কেটে গেছে। রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখেছে একে অপরকে, কিন্তু তাতে নীরব ভাব বিনিময়ের ভাষা ছিল না। একবার, তার নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে মনে হয়েছিল বুঝিবা অচেনা দুর্বোধ্য এবং রহস্যময়ী।

এই দিন, আর একদিন।

আজ ভোর থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করতে করতে মনোযোগের সঙ্গে নিজেকে দেখেছে, সে সত্যিই সুপুরুষ চাওড়া কাঁধ খাড়া নাক। কালো ঘন ভুঁরুর নিচে জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল চোখ। কোঁকড়া চুল ঘাড়া ইস্তক, অনেকটা পাঠ্য বইয়ের আলেকজান্ডারের ছবির মতো। রীতিমতো স্বাস্থ্যবান। লোমশ হাত, পেশল উরু। আলমটা কেন যে তাকে মাঝে মাঝে কাছিম ডাকে বুঝতে পারে না— কিন্তু কি নামের জন্যই? না, চেহারায়ও সেরকম কিছু আছে? প্রজাপতি ছাট গোঁফের নিচে একটু হাসি খেলে যায়, তার পর সশব্দে হাহ্ হাহ্ই করে ওঠে।

যাক্ রসকস্ রসকস্ই। আসলে একটি অবাধ্য মেয়ে বশ করবার মতো যথেষ্ট শক্তি এবং সামর্থ্য তার আছে। তবে দ্বিধা কেন। তার একটিই গূঢ় কারণ, থাকতে পারে, প্রেম। নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে প্রেমকেই মনে করে সবচেয়ে মূল্যবান। ইচ্ছা করলে জোর করে সে তার ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু সেরকম ভাবতেও পারেনা। এদেশের মেয়েরা অবশ্য লজ্জাবতী, নিজের ধরা দিতে চায়না। লুকোচুরি করে। কিন্তু বিদেশে দেখেছে তারাই অগ্রসর, বরং যুবকেরাই পালিয়ে বেড়ায়! উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য দুবছর বোস্টনে কাটাবার সময় ওখানকার বাসিন্দা বন্ধু জামানের সঙ্গে গাড়িতে করে ছুটির সময়ে বহু দূরাঞ্চল পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে। তৃষ্ণার্ত নয়নে লক্ষ্য করেছে বিচিত্র জীবন-

স্রোত, আধুনিক সভ্যতার বর্ণাঢ্য চেহারা। বিস্মিতও হয়েছে কখনো কখনো। নিজের দেশের তুলনায় আকাশ পাতাল। মেয়েদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা-চেতনাকে পছন্দ করেছে; কিন্তু একটু আপত্তিও ছিল— টের পেয়েছে রক্ষণশীল হলেও অতিমাত্রায় উদ্দামতার বিরোধী। হয়তো বিদেশের প্রভাব। আবাল্য লালিত অভ্যাস কিংবা প্রচ্ছন্ন কুসংস্কার। তার মন সায় দেয়নি। কেবল সম্ভোগ, কেবল যৌনাচার যেন গ্রহণযোগ্য নয়। লিজা এবং কেটির সঙ্গে সেও অনেক সময় কাটিয়েছে; কিন্তু নিখাদ বন্ধুত্বের সম্পর্ক, যদিও হাত বাড়ালেই পেত, যে-কোন ইচ্ছায়। বারে বারে কুচিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। যাক্ সে সব ডুবে যাক্, মুছে যাক্।

ড্রয়িং রুমের একধারে ডাইনিং টেবিল, খাওয়ার সময় কিচেনে চলে যায় সরবতীর মা এবং হাফ-চাকর আমির হোসেন যে তার সংস্থায় চাকরি পাবার আশায় বাসায় কাজ করে।

তারপর দরোজা বন্ধ করে দেয়ালের হালকা নীলাভ আলোর বালভ জ্বালিয়ে দিয়েছে। একদিন ঘুমিয়েছে পাশের কামরায়, আজ সে দুজনের বেডরুমে এসেছে এটা নিশ্চয়ই সম্মতির লক্ষণ।

একটা বাঘের পরাক্রম যেন সঞ্চারিত হচ্ছে তার শরীরে, এবং আর দেরি না করে মশারির ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুহাতে পাঞ্জা দিয়ে ধরে। বাধা দিতে থাকলে শাড়ি ব্লাউজ খুলে ফেলে ক্ষিপ্তের মতো, বাজু ধরে সজোরে টেনে নেয় বুকের ওপরে এবং পরাস্ত করে চুম্বনে চুম্বনে পিষ্ট করে দিতে থাকে ঠোঁটজোড়া। পাছড়াপাছড়ি করতে করতে চিতিয়ে ফেলে বালিশের উপরে।

আক্রমণের আকস্মিকতায় কান্তা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, অনেকটা দিশেহারা। ঝট্ করে উপুড় হয়েও ঠিক থাকতে পারছেন। একটা প্রবল তরঙ্গ উচ্ছ্বাসকে ঠেকাতে ঠেকাতে বলতে থাকে কাতরানির মতো, দোহাই আপনার। দোহাই, দোহাই। আগে একটা কথা শুনুন। একটা, একটা—

কোনো কথা শুনেত পারবো না। ভীষণ হাঁপাচ্ছে আবুল কাশিম, মুখ বাঁকা করে বলল, তোমার সবকথা শোনা হয়ে গেছে!

আপনি জানেন না আমি নষ্টা! কান্তা এক নিঃশ্বাসে বলল, আমি দেড় মাসের প্রেগন্যান্ট্।

কি বলছো? তীব্র, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ঃ হঠাৎ ফণাতোলা গোখরো সাপ দেখার মতো আঁৎকে উঠল মীর আবুল কাশিম। সহসা হাত থেমে যায়, একেবারে ভিতর থেকে উঠছে যেন একটা প্রবল কাঁপুনি।

সত্যি বলছি আমি, সত্যি বলছি।

না, না না। অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।

আমি সত্যি বলছি। সত্যি, সত্যি, সত্যি।

এই সত্যি মিথ্যা। তুমি অভিনয় করছো।

না, অভিনয় নয়। আমি কলগার্ল ছিলাম, একসিডেন্ট হয়ে গেছে।

হায়, একি হল। তারস্বরে চিৎকার করে উঠতে চাইলো, কিন্তু গলার ভিতর থেকে স্বর বেরুলোনা। থ মেরে আছে। ছাইবর্ণ, রক্তধারা ঠান্ডা হয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হঠাৎ নিস্তেজ। গোলগাল মুখটা ক্রমে যেন বসে যাচ্ছে গর্ত হয়ে, অনেক কষ্টে উচ্চারণ করে, মানে-মানে তোমরা আমাকে—। আমাকে ব্ল্যাকমেইল করেছ—ব্ল্যাকমেইল—!

এদিক ওদিক কিছু কাপড় ছড়িয়ে ছিল। ছেঁড়া পেটিকোট। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা টেনে আনে, সেগুলো কাঁধের উপর দিয়ে বুক পেট তলপেট, হাঁটুভেঙে বসে তার উপর দিতে দিতে ভেজাস্বরে, বলতে থাকে কান্তা, আমি আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। আমার বাবা সচিবালয়ে ছোট কেরানি। তবুও আগামসি লেনে বাসা নিলেন। বাসাটাও ছোট, কিন্তু আশা বড় ছিল। বাবা মা তারা দুজন। আমরা তিনবোন, আর এক ছোটভাই। কয়েক মাস গেল, আর চালাতে পারলেন না। বাবা মাকে ছোট ভাই বোনসহ দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে ছিলেন। আমি আইএ প্রথম বর্ষ আর শান্তা নাইনের ছাত্রী। সামনে পরীক্ষা। ছোট চাচা কেরামত উল্লাহ শহরেই থাকেন। শোনা যেত ব্যবসা করেন। কি ব্যবসা আমরা জানতাম না। প্রায়ই আসতেন। বিপদের সময়ে বাবাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন। আমাদের দুজনকেও খুব আদর করে। চাচিও এসেছিলেন। কিন্তু—কিন্তু— নিজের রক্ত— এমন সর্বনাশা খেল শুরু করবেন—

বুঝেছি বুঝেছি। সব বুঝেছি। আর বয়ান করতে হবে না।

দোহাই আপনার। হঠাৎ স্বামীর ডান হাতটা ধরে কান্তা বলতে লাগল, আমাকে এক্ষুণি-এক্ষুণি তাড়িয়ে দেবেন না। এক্ষুণি গেলে বাবা সব বুঝতে পারবেন। আর তাতে উনি হার্টফেল করে মারা যাবেন। আমরা সাত ভাইবোনের সংসার বড় তিনজন জুদা হয়ে গেছে, তাতে কি। বাবা মার প্রাণতো ওদের জন্যও কাঁদে। রুগ্ন মা। আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো, প্লিজ—!

হয়ে গেলেই ভালো হতো। অস্পষ্ট আপনমনেই যেন বিড়বিড় করে কাশিম, আর কত। দুনিয়াটা জঞ্জাল মুক্ত হওয়া দরকার।

কান্তার কানেও যায় না এসব মন্তব্য, সে অনর্গল বলে যায়, আমি নিজেই চলে যাবো। আপনাকে কষ্ট দেবোনা। এবর্সন করানোর পয়সা ছিলনা আমার। আপনি হয়তো পারবেন। কিন্তু কেন আপনি আমাকে গ্রহণ করবেন। আপনি দেশবিদেশ ঘুরে এসেছেন, উদারচেতা—

হয়েছে, আবোল তাবোল রাখো। এনাফ ইজ এনাফ। বিদেশীরা বলে বাংলাদেশ দরিদ্র, আমি বলি বাংলাদেশ অভিশপ্ত। ইজ নট ইট? কিন্তু আমি কি দোষ করেছিলাম— আমার উপরে এই শাস্তি! না, না। অসহ্য—

আপনার কষ্ট আমি বুঝি।

কিছুই বোঝ না।

আপনার কষ্টের জন্য আমিই দায়ী।

না, তুমি না। আমার ভাগ্য। ভাগ্যের হাত খুব লম্বা, কেউ তার কাছে ধরা খাওয়া থেকে বাঁচতে পারে না।

কি ভেবে কান্তা হঠাৎ বালিশে শুয়ে পড়ে, প্রথমে কাত পরক্ষণেই চিত হয়ে আস্তে আস্তে বলল, লেডিজ ক্লাবের অনুষ্ঠানে গিয়ে একদিন শিখে এসেছিলাম শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার, কিন্তু না এটা ভুল। আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল মৃতুটাই হতে পারে। কিন্তু এখনই মরবো কেন। আমি বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকব। নীরবে আমি চলে যাব, কেউ জানবেও না। বাড়িতেও যাবো না। যাবো অন্য কোথাও, যে স্থানে কেউ চিনবেনা। তার আগে, তার আগে। আপনি আমার বাবার অনেক উপকার করেছেন, তাই তার আগে আপনার ইচ্ছা পূরণ করে যাবো। আসুন, আসুন। আমি তৈরি।

এই সময় বাইরের আকাশে মেঘের গুড়ুগুড়ু ধ্বনি, বিজলি চমকানি। সর্‌সর্‌ আওয়াজে বৃষ্টি আসবে বুঝি। কেমন অদ্ভুত লাগছে মুহূর্তগুলো, আমন্ত্রণে সাড়া দেয়না। বিছানার নিজের অংশটায় বসে আছে, চোখে ফ্যালফ্যাল চাহনি। ভাবলেশহীন, অনেকটা যেন বেভুল। নারী বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি, এক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম— কত নগর এমনকি সভ্যতাও ধ্বংস হয়েছে তার জন্য, রাজা রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে তবু তৃষ্ণা, তবু ক্ষুধা। অথচ কি এমন জিনিশ! এই তো, দেখতে পাচ্ছে সহজেই, আযৌবন লালিত কৌতূহল, হাজার অসম্ভব স্বপ্নচারণা- অনবরত উঠেছে পড়েছে জেগেছে কি এরই জন্য? চেহারাটা খুব পাংশু হয়ে গেছে। ঢিব্‌ঢিব করছে হৃৎপিণ্ড।

নিমীলিত নয়না কান্তা একেবারে স্থির হয়ে আছে।

একি প্রতীক্ষা, না প্রত্যাখ্যান? কিছু বুঝতে না পেরে মশারির ধার একটু তুলে বাইরে বেরুল এবং নিচে নামল।

বৃষ্টির ছাট আসছে, আর কিছু দমকা হাওয়া। ওদিকে যায়, জানালার পাটটা বন্ধ করে এল।

এক হাতে ডিকানটার অন্য হাতে কৃস্টাল গেলাস খালি পায়ে হেঁটে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলে ওপরের ঝাড়বাতিটা দুলছিল।

বড় আলোর বদলে ছোট তেপায়ায় বসানো সুভেনির ল্যাম্পটা জ্বালে, বাইরের আলোড়ন কমছে, মনে হয়।

এক পেক পরিমাণ ঢালবার পর একটু সিপ নিয়ে গাউনের পকেট থেকে কেস ও লাইটার বার করে। একটা সিগারেট ধরায়। এই একটা অভ্যাস অনেকদিন ধাতে এসে গেছে এবং এর পরিধিতে এলে নিজের খুব স্বাভাবিক লাগে। তিরতির করে গলায় নামে নিখাদ মদিরা আর মেজাজ ক্রমে খোশ।

বলা যায় সহসাই। কি একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এসব না হলেও কারুর কোনো ক্ষতি ছিল না। তার নিজের তো নয়ই। আমেরিকা থেকে ফেরার পর সিনেমার গল্পের মতোই যেন দৃশ্যমালা একে একে এসেছে, একটু-একটু ঢেউ তুলে চলেও গেছে।

এইতো একটি, দেখতে পাচ্ছে। কালোছায়া নিয়ে আকাশটা বেশ ঝুঁকে পড়েছিল, সেদিন সোমবার। অর্ধেক ভেজানো দরোজা। তার বাইরে গোলাগাল দাড়ি গোঁফেভরা মুখটা দু'এখবার দেখা গেল। প্রায় তরুণ মহাব্যবস্থাপক, বিশেষত স্টেটস্‌ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসার পর তার কদর ও আদর দুই বেড়ে গেছে; এবং কর্মকর্তা কর্মচারিদের, ডর। এটা তারই নমুনা। খেয়াল না করেছে এমন নয়, কিন্তু খামোকা সময় নষ্ট করা যায় না। তৃতীয়বার এসে দাঁড়ালে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছিল, কি গোলাম সাহেব, কিছু বলবেন?

না, না। মানে স্যার। যদি বেয়াদপি মাফ করেন। সেকশন অফিসার গোলাম মোহাম্মদ নিমেষে যেন বিনয়ের অবতার।

আসুন, ভিতরে আসুন। সোনালী ফ্রেম ভিতরে প্রখর চাউনি, সৌজন্য নয়, যেন আদেশ। বিদেশ ফেরত, যেমন পোশাক-আশাক তেমন কায়দা-কানুন এবং প্রতাপ, দীর্ঘ প্রায় দেড় বছরেও দেশের ধূলিমাটি আলো হাওয়ার মধ্যে সেই চকচকে ভাবটা অটুট।

প্রবেশ করার পর কাছে এসে থমকে দাঁড়ান : হয়তো ভুল নয়। শিখে এসেছে অধস্তনদের দাপটে রাখলেই ঠিক থাকে প্রশাসন। কখনো নরমে গরমে, কিন্তু ভদ্রতাটা সর্বদা থাকা চাই। তখনো তার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন—

গোড়ালি ইস্তক ঢোলা আধময়লা পায়জামা, ওপরে ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি, দুই কাঁধের উপর দিয়ে একটা বড় পবিত্র রুমাল ঝুলে আছে, গোলাম মোহাম্মদ ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু মনে পড়ল, কাঁটায় কাঁটায়, হুকুম তামিল না করলেও বিপদ হতে পারে। একটা চেয়ার টেনে আসন গ্রহণ করলেন। গলা খাকারি দিয়ে শুরু করলেন, দিস্ ইজ আওয়ার গ্রেট অনার স্যার—

মুখ গম্ভীর, এসবে বাধা না দিয়ে পারা যায় না। চোখের দিকে তাকিয়ে তার উত্তর, ইংরাজি কেন। বাংলায় বলুন। বিদেশে ছিলাম তবু বাংলা আমি ভালোই বুঝতে পারি।

সরি স্যার, মাফ করবেন। খল্‌খল করে হাসলেন, গোলাম মোহাম্মদ, বললেন, ইংরেজিতো আবার ফাইলে ফিরে এসেছে, ইংরেজিতে কাজ করতে করতে বদভ্যাস হয়ে গেছে স্যার। সামনে প্রতি বছরই তো একুশে আসবে। পোলাপানেরা সুযোগ পেলে মাথায় ঢিল ছুঁড়বে, কিংবা দিগম্বর করবে। একুশে থেকেই তো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম—

এইবার নিদারুণ হাসি পেয়েছিল, কাঁধ ঝাঁকায় মীর আবুল কাশিম। পাইপটা তুলে নিতে ডানদিকে হাত বাড়িয়ে মন্তব্য করেছিল, আপনি দেখছি ভাষণ শুরু করে দিয়েছেন—

সরি স্যার। মাথায় গোলটুপিটা ঘুরিয়ে নিয়ে গোলাম সাহেব জিভ কাটেন, একটু থেকে বললেন, আপনি গুণী ব্যক্তি। দুনিয়া ঘুরে এসেছেন। আপনার সামনে বড় বড় কথা কি সাজে আমার? কিন্তু এটাও আরেক মুশকিল বায়তুল মোকাররামে লেকচার শুনতে শুনতে—

তখন তাকে থামিয়ে দিয়েছিল, কাশিম বলেছিল, গোলাম সাহেব আমি এখন কাজে ব্যস্ত। আরেকদিন আপনার গল্প শুনবো। আসলে— কিছু মনে করবেন না— আমি জানি আপনি কি বলতে এসেছিলেন—

হঠাৎ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়লেন গোলাম মোহাম্মদ, কাতর স্বরে বলতে লাগলেন, মাফ করবেন স্যার মাফ করবেন। আমি কি করবো। হাফিজ সাহেব আমাকে জোঁকের মতন ধরেছেন। এখন সিলিপ, তখন টেলিফোন। জান একেবারে কাবার হয়ে গেল। মেহেরবানি করে আমার অপরাধ নেবেন না স্যার। আমি সত্যি বলছি—

আহা আপনি দোষের কিছু করছেন তা-তো আমি বলিনি। আবার পাইপে আগুন দিয়ে বলল, এ বয়সে যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন তা বরং অভিনন্দনযোগ্য।

আই নো স্যার ইউ আর এ লায়ন হার্টেড ম্যান, তাই তারিফ করতে পারলেন। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে দশ জনের সংসার। বেতনের টাকায় কেমন করে চলবো স্যার। কিন্তু বাড়তি যা করছি, একদম হালাল রুজি। হাতের তালুতে একটা ঘষা দিয়ে বললেন গোলাম, সঙ্গে কিছু সওয়াবও আছে। আওরত মরদের মিলন ঘটিয়ে দিই, যদিও উপলক্ষ মাত্র। সব আল্লাহ্‌র রহমত।

এইভাবে শুরু ঃ গোটা জিনিশটায় যখন মজা পেতে লাগল, নিজেও থামালোনা। বিয়েশাদির ব্যাপারে সমাজটা সঠিকরূপে যেন ধরা পড়ে আয়নায়, এই একদিক; কিন্তু তার চেয়ে বড় কৌতুক, গোলাম যে মেয়ের জন্য প্রস্তাব আনলেন, তার সঙ্গে ইতোমধ্যেই সম্পর্ক

অনেক দূর গড়িয়েছে। এইতো সেদিন সন্ধ্যায় একটি পান্নার আংটি উপহার দিল। শুধু উপহারও নয়— হাতে ধরে আঙুলে পরিয়ে দিয়েছে। এই ধরা ছোঁয়া উপহারের চাইতে একটু বেশি বৈকি। হয়তো পূর্বরাগ; কিন্তু তা ক্রমান্বয়ে গভীর প্রেমে তারপর মিলনে গড়ালে বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা, যদিও পরিচয়ের মধ্যে তেমন কিছুই ছিলনা। তার জন্য করপোরেশনই ভাড়া করেছে ধানমন্ডির এই মাঝারি আকারের বাড়িটার একটি তলা। সাধারণত মালিকরা দোতলায় থাকেন, এখানে হয়েছে তার উল্টো। বাড়িওয়ালা নিজেই পছন্দ করেছেন গ্রাউণ্ড ফ্লোর, সপরিবারে থাকেন। খ্যতনামা বস্ত্র ব্যবসায়ী হাফিজ আহমদ। তার বাবা মফিজ আহমদ করাচীতে সেটল করেছিলেন; কিন্তু সত্তর সালে ইলেকশনের আগেই সবকিছু গুটিয়ে চলে এসেছিলেন। তখন তার ভিতরে কি খেলা করছিল, কেউ জানেনা। ভালো তেমন লাগেনি, কিন্তু প্রয়োজনে চোখ বুঁজেই যেন বাড়িটা কিনে ফেলেছিলেন এক পাঞ্জাবী অফিসারের কাছ থেকে, উনিও তখন নিজ দেশে পাড়ি জমাচ্ছিলেন।

একমাত্র সন্তান হাফিজ, নির্বাচন রাজনৈতিক অস্থিরতা শেষে মুক্তিযুদ্ধ ওকে আটাত্তর সালের আগে বিয়ে শাদি করাতে পারেন নি। তারপর তিনি আট বছর বেঁচেছিলেন এবং বিবি দশবছর।

হাফিজ আহমদের দুই কন্যা রেহানা— সোহেলি, বয়স বাইশ ও বিশ; এবং একপুত্র রমিজ, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষা দিয়েছে। বিষয়, সমাজবিজ্ঞান।

মিসেস রোমানা আহমদ কুমিল্লার এক প্রাচীন জমিদার বাড়ির মেয়ে। যেমন রুচিশীলা তেমনি স্নেহপরায়ণা। কাজ খুব ভালবাসেন, লোকশিল্পের একটি দোকান চালান শাহাবাগে, নাম সারিকা। লোকজনের সঙ্গে সহজ মেলামেশায় খুব আনন্দ পান। নতুন ভাড়াটে মীর কাশিম সাহেব জিনিশপত্র নিয়ে গিয়ে দোতালায় উঠলে প্রথম দিনেই বিকালে খবর নিতে গিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন। দুজনেই ইডেনের ছাত্রী ঃ সম্মান তৃতীয় ও দ্বিতীয় বর্ষ। ছোট সোহেলি পরনে সালোয়ার কামিজ কিছুটা চঞ্চল; কিন্তু বড়টি, রেহানা ধীরস্থির। লালডোরা কাকডিমে রং শাড়ি পরেছিল। গভীর চাহনি। চা খেতে খেতে কাশিম অনেক গল্প বলেছিল, হাসিঠাট্টা করেছিল। ভালো লেগেছিল তার এ বাড়ির সাজানো গোছানো ছিমছাম মনোরম পরিবেশ। লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা নয়; কেমন একটা আন্তরিকতা আছে ওদের ব্যবহারে কথাবার্তায়। কিছুকাল সুখেই কাটবে, মনে হল।

সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পরে চলাচল অব্যাহত থেকেছে ঃ সোহেলি প্রায়ই আসে পপমিউজিকের সিডি নিতে আর রেহানা থ্রিলার উপন্যাসের জন্য। বিকেলে লনে ব্যাডমিন্টন খেলতেও ডাকত। সোহেলির ব্যবহারটা ছিল, শালিকার মতো তেমনি টীকাটিপ্পনী, রসিকতা এমনকি বাঁকা ইংগিত।

একদিন হাতে চিমটি কাটে, আরেক দিন চুল ধরে টানে। ওদিকে নীরব মধুর হাসিতে রেহানার মুখ উদ্ভাসিত।

কিছুকাল পরে আরেকটু গড়াল। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখত পরিপাটি বিছানা, বাবুর্চির ধরাবাঁধা রান্নার সঙ্গে বাড়তি দুএকটি আইটেম। মিস্টি তো প্রায়ই। বিশেষত কাঁচাগোল্লা এবং সন্দেশ।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন কেউ ছিল না বাসায়, আশেপাশে রেহানা চুল ছেড়ে বিছানার ধারে বসেছে, সাহস করে নিচে নেমেছিল, কাছাকাছি গিয়েছিল কি যেন করতে মন চায়; কিন্তু বেশি এগুতে দিলোনা রেহানা, শাসন করে থামিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে শুয়ে শুয়ে সেই মধুর স্মৃতির রোমন্থন চলে, আর তখনই মনে জেগেছিল, উপহার। উপহার প্রেমের স্মারক, ভালোবাসার চিহ্ন। বিদেশ থেকে একটা বাড়তি আঙটি এনেছিল, তাও মনে পড়ে যায়। কাজেই শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটার মধ্যে আকস্মিকতা নয়, একটা যৌক্তিক শৃংখলাই ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু লোক যে বলে কপাল তার বোধ হয় একটি অর্থ আছে। বুদ্ধিমান বলে পরিচিত, তাতে কি হবে, ঘাটে ঘাটে বোকামি করে এসেছে। শুধু বোকামি, মাঝে মাঝে আফসোস হয় নিজের জন্য, করুণা হয় নিজের প্রতি।

সেদিন অফিসের আলাপের পরে, তার দাওয়াতে পরদিনই বাসায় এসেছিলেন গোলাম মোহাম্মদ। নথিপত্র খুলে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। অনেকটা খোলামেলা। চা দিচ্ছে বাবুর্চি জহুর; দেশলাই জ্বেলে পাইপ ধরাবার সময় সাঁ করে সব মনে পড়ল, মুখ তুলে তাকিয়ে তার প্রথম উক্তি. আমি রাজি গোলাম মোহাম্মদ সাহেব। রেহানাকে আমি দেখেছি। বেশ ভালো মেয়ে। কিন্তু একটি কথা—

কি কথা স্যার। খুলে বলুন। ঘড়ি বাড়ি গাড়ি? আসমানের চান চান তো তাও পেড়ে দেবো। আপনি জানেন না এই বান্দা কত অঘটনকে সংঘটন করেছে, হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

জ্বিনা আমার কোন ডিমান্ড নেই। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কিন্তু একটি কথা—

থামলেন কেন, বলুন স্যার।

ভাবছি বলবো কিনা। কথাটা একটু অন্যরকম।

যে রকমই হোক, বলুন স্যার, বলুন। সমস্যা থাকলে আমি সবকিছুর সমাধন করবো।

হুঁ বুঝেছি। না, তেমন কিছু না। আপনি জিগগেস করে দেখবেন শুধু ভালোবাসায় চলবে কিনা!

প্রথমে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যান গোলাম, তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। তার মনে হল, এটা স্যারের জোক্। দাঁড়ি মুঠো করে একটা ছটকা মেরে বললেন, স্যার আপনারা হলেন মর্ডান টাইমের মানুষ। আপনাদের ধ্যান-ধারণা আলাদা। কিন্তু আমাদের জমানায় মোটামুটি ছিল। আমরা প্রেম ট্রেম বুঝতাম না। দুনিয়ার বুকে তাঁর অনেক খলিফা তৈরি করতে চাইলেন আল্লাহতায়ালা, হজরত আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করে পাঠালেন। নারী-পুরুষের মিলনে এই ধারা এগিয়ে চলে। যুগে যুগে, কালে কালে। বংশধর রেখে যাওয়ার জন্যই বিবাহ। এরই নাম মহব্বত। জেনানা এর বেশিকিছু বোঝেনা।

আপনি সত্যি বলছেন গোলাম সাহেব। হেলা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে বসল মীর আবুল কাশিম। গুরুতর কণ্ঠস্বর বালকের মতো মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, শুধু ভালবাসা, শুধু ভালোবাসা দিয়ে কোন মেয়েকে বেঁধে রাখা যায় না? অলস জাতি মেয়েরা, বিশেষ করে আধুনিককালের মেয়েরা তো প্রেমেরই পূজারী? প্রেমহীন পরিণয়কে তারা মানে না।

তা ঠিক বলেছেন স্যার। গোলাম হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলেছিলেন, আপনার বিবিকে কেবল মহব্বত দেবেন এতো খুব ভালো কথা স্যার। বিবিসাব খুশি থাকবেন। ফুলে ফলে ভরে উঠবে আপনার সংসার। এই তো চাই।

এমনি ভাবে গোলাম মোহাম্মদের চিন্তাধারায় একটা সাধারণ সত্যের চেহারা দেখা গিয়েছিল সেদিন; কিন্তু খটকা থেকেই গেল। কারণ তার কাছে এর বেশি কিছু খুলে বলা সম্ভব ছিল না। মনের ভিতরটা খুব উসখুস করতে থাকে।

পরদিন অফিসে গিয়েই ফোনে ডাকে ঢাকা কলেজের সহপাঠী বন্ধু এবং ওদের খালাতো ভাই শামসুল আলমকে— সে একটা ট্রাভেল এজেন্সি খুলেছে। মাঝে মাঝে এমনিতেও আসতো গুলতানি মারতে। একে একে সব কথা যখন শুনল ওর চক্ষু চড়কগাছ, সে আঁতকে উঠল। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায়, আবার বসে। বলতে থাকে, কাশিম কাশিম, তুই আসলেই কাছিম! জ্ঞান বুদ্ধি কিছুই নেই। আরে শালা, করেছিস কি তুই! জিন্দেগিটা বরবাদ করে দিলি, নিজের হাতে!

তার মানে! প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে মীর কাশিম, বলল, কি বলছিস তুই! বরবাদ হবে কেন?

হবে না? আলম আঙুল উঁচিয়ে বলল, আমি বেট রেখে বলতে পারি এই তথ্য যখন জানতে পারবে পৃথিবীর কোন মেয়েই তোকে বিয়ে করতে রাজি হবে না।

কেন হবে না? আমি স্যাকরিফাইস করেছি দেশের জন্য, জাতির জন্য। আত্মত্যাগ তো একতরফা হতে পারেনা নারী সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে।

তারা আসবেও। কিন্তু ঠিক এই রূপে নয়। আলম চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, নারীর মাতৃত্ব তার অস্তিত্ব। এই মাতৃত্বের স্বাদ থেকে তাদেরকে পুরোপুরি বঞ্চিত কখনোই করা যাবে না।

এসব তুই কি বলছিস আলম, আমার মাথায় কিছু ঢুকছেনা।

বোঝা কঠিন মোটেই নয়। মিলন নারী চায় কিন্তু তাই একান্ত নয়। আপতত সন্তান না চাইতে পারে, কিন্তু যে পুরুষের কাছে সে গর্ভবতী হবে না, তাকে সে কামনা করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি না। সোজা হয়ে কাশিম উত্তর দিয়েছিল, আমি তোকে দেখাবো কেবল একসঙ্গে বন্ধুর মতো থাকার অঙ্গীকার নিয়েও বিবাহ সম্ভব। আমি রেহানাকে সব খুলে বলবো, আমি জানি তবু সে গ্রহণ করবে আমাকে—

মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, ইউ আর আউট ফরদি ইমসিপবল। আই উইশ ইউ গুডলাক্—!

আর কথা না বলে মুচকি হেসে বিদায় নিয়েছিল শামসুল আলম। সে বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক, তবুও ওর বিশ্বাসগুলোকে তার মনে হয়েছিল সেকেলে ও সংস্কারাচ্ছন্ন।

অথচ আশ্চর্য, ওর কথাই সত্য হল। হয়তো ওপরে এসেছিল, দরোজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে রেহানা আড়াল থেকে শুনেছিল ওদের কথাবার্তা। পরদিন অফিস থেকে ফেরার পর বিছানার কাছে তেপায়ার ওপরে দেখতে পেল আঙটিটা, সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা ঃ আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করবেন।

হঠাৎ এমন ঝুপ্ করে আকাশ থেকে পাতালে পড়ে যাবে তা ভাবতেও পারেনি। অথচ তাই ঘটল। তাহলে ঝোঁকের মাথায় সে বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে, যা শোধরানোর অতীত?

স্মৃতির আয়নায় মিছিল করে এসে ভিড় জমায় নিকট অতীতের সেই ঘটনাবলি। আমেরিকা থেকে ফিরে কয়েকদিনের মধ্যে সরকারী অফিসার নিবাসের একটি ফ্লাটে

উঠেছিল, সেখানে বাক্সপেটারা গোছানো হলে মনটা উতলা হয়ে পড়ে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। বাবা মীর আবুল কাশিম ছিলেন এক পাট ব্যবসায়ীর গদীর সরকার। তিনি ও প্রবাসে থাকার সময়েই ইন্তেকাল করেন। চিঠি পেয়েছিল, তাঁদের শরীর খারাপ যাচ্ছে, কিন্তু অতদূর থেকে দেখতে আসা সম্ভব ছিলনা। দুজনের একমাসের অল্প ব্যবধানে চলে যান। সেই দুঃখ এত হৈহুল্লোড়ের মধ্যেও হৃদয়ে গাঁথা ছিল। তাঁদের কবর দেখলেও কিছু শান্তি পাবে। তাছাড়া আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী। সারা গ্রামের লোকজন তাকে কতনা ভালোবাসত, আদর করত। তারিফ করত খুবই, বিশেষত কষ্ট করে লেখাপড়া করছে বলে। দূরে থাকতে শুনতে পেয়েছে, শেষদিকে ওয়েব সাইট ইন্টারনেটেও দেখেছে এই তিন চার বছরে ভীষণভাবে বদলে গেছে দেশটা ঃ বদলে গেছে মানুষের ধ্যান-ধারণা চিন্তাধারা জীবন যাত্রা। বদলে গেছে গোটা সমাজ। এতদিন পরে নিজের চোখে সব দেখবে, এও একটা ইচ্ছা ছিল। আসলে নিজেদের ধূলিমাটি, সোনার চেয়েও খাঁটি।

দেখলো বটে ভালোই দেখলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একটা ইস্টিশনে ক্রসিং ছিল বলে দেখে বিপরীত-গামী গাড়িতে হাজার হাজার দেহাতি আদম সন্তান, দৌড়াদৌড়ি ঠেলাঠেলি করে উঠছে, নিচের থেকে জানালা দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে গাটরি বোঁচকা, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, চিৎকার। মানব না মাছি? নিমেষে প্রতি বগি সূচিভেদ্য, তর্ তর্ করে বেয়ে উঠে যাচ্ছে এবং গাড়ির ওপরে লোকজন অল্পক্ষণে সংখ্যায় শত শত, আরও অনেক, কয়েক হাজার, ভেঁপু বাজিয়ে চলতে শুরু করলে দরোজার প্রতি ডান্ডার বাদুজঝোলা হয়ে থাকে আরো অগুনতি। না হয় বোঝা গেল, আজকে নরসিংদির হাট বার। তবু কি এর ব্যখ্যা মেলে? গাছপালা এখনো আছে, আছে কিছু খামার নদী বন উপবন কিন্তু আর কতদিন? ক্রমেই কমছে জায়গা বাড়ছে জীবন। গ্রামে গিয়ে দেখে আরও সংগিন পরিস্থিতি, রাস্তায় উঠানে ঘরে ধুলো মাটিতে শত শত ন্যাংটা ছেলেমেয়ে কিলবিল করছে ঃ পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই—হতচ্ছাড়া নরনারী অথচ তারাই প্রজননের মূলাধার।

ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল। জ্যেঠাত বড় ভাই ভাবীর নয়টা ছেলেমেয়ে, ওরা চারপাশে ভিড় করে, সন্ধ্যার দিকে চাঁদের আলোতে আসে আরও অনেক, সমস্ত পাড়া থেকে। উঠোন ভরে যায়। অনেক ঔৎসুক্য, নানান জিজ্ঞাসা। হোগলা বিছিয়ে খেতে দিলে সহজভাবে কথাবার্তা বলে গেল, হাসিঠাট্টাও করল কিন্তু ঘুম হলোনা সারারাত— এ পাশ ওপাশ করেছে কাঁথার উপরে। উপায় কি, এবং সমাধান কি?

ভারাক্রান্ত মনে গ্রামের বাড়িতে কাটিয়েছিল তিনদিনের জায়গায় এক সপ্তাহ, এবং থানাকেন্দ্র থেকে ব্যবস্থা করে এনে মসজিদ প্রাঙ্গণে খাটিয়ে ছিল প্রথম স্বেচ্ছাবন্ধ্যাকরণ শিবির। আলাপ করেছে। বুঝিয়েছ, বক্তৃতা দিয়েছে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সব চোর দল বেঁধে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, আর মেয়েদের চোখের বাউলিতে গোপন তাচ্ছিল্য এবং অবিশ্বাস।

অপেক্ষমান সবার হয়েই যেন একজন প্রবীণ বলেছিলেন জীবনে ফুর্তিফার্তা গানবাজনা আনন্দ উল্লাস কিছুই নেই, কেবল রাতের এই সুখটুকু— তাও কেন কেড়ে নেয়ার চক্রান্ত?

আরও অনেক মন্তব্য। কিন্তু ইমাম সাহেবের উপস্থাপনা অন্যরকম ছিল, তিনি নজির স্থাপন করতে পরামর্শ দিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতে বেশ কয়েকজন সমর্থন দিল। উপদেশ না ঝেড়ে হাতে-কলমে দেখান না? সেই মুহূর্তে চন্ করে মাথায় রক্ত উঠল, সকলের সামনে

সদর্পে এগিয়ে কাশিম প্রবেশ করেছিল তাঁবুর ভিতরে। ঢোলে বাড়ি পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবদিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেল। হাসাহাসি, তোলপাড়। বিয়েশাদি না করেই খাসি!

গ্রামের যুবতী, যারা মীর বাড়িতে এসে আড়াল থেকে দেখত, কি একটা ছায়া নেমে এল তাদের হাবভাবে, চেহারায় তখন বুঝতে পারেনি এর রহস্য।

অদ্ভুত তিলিসমাৎ ঃ দুনিয়া আজব কারখানা। যত বড় কারণই থাক্ রেহানার প্রত্যাখ্যানটা প্রাণে খুব বেজেছিল। বড় অপমান। সেজন্য কান্তার প্রস্তাবটা আসামাত্র রাজি হতে দেরি করেনি। পাত্র হিসাবে তার ভীষণ কদর এটা আগে প্রমাণিত হোক।

অঝোর কখনো কখনো, আবার মাঝে মাঝে হালকা, সেদিন সারারাত মদিরার ঘোরে ড্রয়িং রুমেই কাটিয়ে দিয়েছিল। কখন গভীর ঘুমে ডুবে যায়, তাও টের পায়নি। সকালে কাজের লোকেরা দেখেছে, ক্রমে নয়টা দশটা বেজে গেল, সাহস করেনা ডাকতে। কান্তাও না। নিজে উঠেছিল যথাসময়ে, চুপচাপ কাজকর্ম দেখিয়েছে। গোসল করেছে। তবে রীতি অনুযায়ী একলা নাশতা খায়নি। শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির প্রথম দিন ছিল। তাই বিশেষ তাড়া ছিল না। একটা দামী ব্যবহারি চেকশাড়ি পরেছে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে হালকা প্রসাধন ও সেরেছে। চলে যে গিয়েছিলেন আর ফিরে আসেন নি ওকে এসে ধরেননি এটা ভালোই বুঝতে পারলো।

কাল ফাল্গুনের প্রথম বর্ষণের রাত গেল, আজকেও আকাশটা ভারি-ভারি। কিন্তু কাশিমের মনটা ফুরফুর শরতের সকালের মতো। ভিতরে কি একটা ঘটেছে, সবটা বুঝতে পারছেনা; তবু তা উদ্বেগ নয়, হতাশা নয়, তার কণ্ঠস্বরে একটা সহজ আমেজ, যা এত দিন ছিল না।

আজও সাদা পোশাক নববধূর মতোই কান্তার, সুচারু সুন্দর চেহারায় কোমলতা অনেকটা চুপচাপ, ডাইনিং টেবিলে একসঙ্গে খাওয়ার পর নিককক্ষে চলে গেল। ক্রমে গুড়গুড় শব্দ। বিজলিও চমকাচ্ছে। আজকেও বৃষ্টি বাতাস? এমন আবহাওয়াই লাগে ভালো। কাজের লোকেরা শুতে না যাওয়া পর্যন্ত কামরায় কপাট খোলাই রাখে, আলাদা থাকা অবস্থাটা বুঝতে দেয়নি।

বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হবার পরেও বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসে থাকে মীর আবুল কাশিম। পরনে গাউন। সিগারেট টানে। তারপর দরোজা জানালা ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে কিনা পরখ করে। বাতি অফ্ করে যখন কপাট টেনে এদিকে চলে এল তখন প্রায় বারোটা বাজে।

মাস্টার বেডে যাওয়ার ধারেই রুমটা, ভেজানো ছিল। আস্তে করে ঠেলা দেয়। আস্তে হেঁটে কাছে গেল। কান্তা উপুড় হয়ে শুয়েছে, পিঠের উপরে একরাশ চুল। বালিশের ধারে কাত হয়ে থাকা মুখটা দেখা যায়, যেন সদ্যস্নাত গোলাপ। এখন ম্লান হয়ে আছে। মশারির প্রান্তটা উলটিয়ে বসে খাটের ধারে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে হালকা ছুঁয়ে দেখে ওর গাল, হাতের তালু নিয়ে যেতে চায় চিবুকের তলে। ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চমকে উঠল। তাকে একনজর দেখতে পাওয়ামাত্র ধড়মড় করে উঠে একবারে সোজা হয়ে বসে। বুকের উপর কাপড় টেনে নেয় জলদি-জলদি। থতমত খেয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করে, আপনি!

হ্যাঁ আমি। মিটিমিটি হাসে। ওর মাথার খোলা চুলের দিকে ডানহাতটা নিতে ওপরে, এক ঝটকা মেরে ফেলে দেয়। মৃদুও হাসতে পারলোনা, ভরা গলা, ওর চোখে চোখে

তাকিয়ে বলল, চল।

হঠাৎ কি যেন মনে হল কান্তার, কাতর ধ্বনিকরে ওঠে, বলল, দোহাই আপনার। আর দুই একটা দিন আমাকে থাকতে দিন। এই দুর্যোগে আমাকে বাইরে ঠেলে দেবেন না। আমি নিজের থেকেই চলে যাবো। আমার পাপের শাস্তি আমাকে পেতে হবে। আপনাকে যে ঠকিয়েছি—

আমিও তো তোমাকে ঠকিয়েছি! ঝট্ করে তাকায় কান্তা, বুঝতে পারেনা ব্যঙ্গ না বক্তব্য। আজব এক কণ্ঠস্বর, চেহারায়ও অন্যরকম ছায়া। আস্তে হাত বাড়িয়ে আগলে ধরে। ওর চিবুক উঁচিয়ে বলল, আমিও ঠকিয়েছি তোমাকে!

না, না। এ কি বলছেন!

কেন, নবরত্ন সেট দেবো বলেছিলাম না? কাশিম যেন রহস্য করে, বলল, তাতে দেইনি?

কান্তা শান্তস্বরে বলল, এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনি যা দিয়েছেন, তা অনেক, অনেক। কিন্তু একটা জিনিশ-কাশিম একটু থেমে, কি ভেবে নিয়ে বলল, একটি জিনিশ তোমাকে আমি কখনো দিতে পারবো না যা তুমি আমাকে দিতে পারো।

মাথামুণ্ডু কিছছু বুঝতে পারছিনা।

কঠিন কিছু বলছিনা তো? দুইহাতের তালুতে ওর দুই গাল আগলে ধরে চোখের ভিতরে চোখ রেখে বলল, যা হবার হয়ে গেছে, সেসব এত ভেবে লাভ কি। আমি সব বুঝে নিয়েছি। তোমার কোন কালিমা নেই। ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে না— তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। হ্যাঁ, একটা। একটাই যথেষ্ট তোমার-আমার সুখের জন্য। আর-কার কোন সন্তান আমরা চাইবো না।

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কান্তা, সবকিছুই ওর কাছে ধোঁয়াটে ঠেকছে। কি উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছে না। অনন্ত কৃতজ্ঞতার ধারাস্রোতে ওর অন্তরটা ভরে গেল।

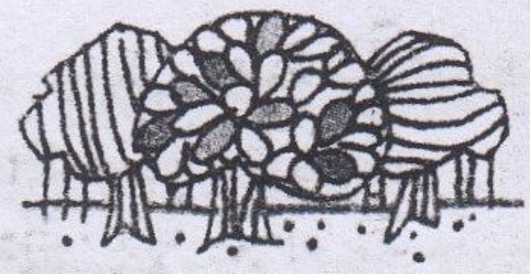
আরেকটু টেনে পাঁজা কোলা করে তুললে স্বামীর দুহাতে জড়িয়ে ধরল। ওর গায়ে গতরে একটা গভীর আস্বাদের সোঁদাগন্ধ আছে, হ্যাঁ ওই তো চোখের ভিতরে বিশ্বাসের অগাধ হাতছানি। বেডরুমে নিয়ে বালিশে শুইয়ে দিলেও সে ঘোর কাটে না। যেন এক হতচেতন। কানে, গলায় ঝিকঝিক করছে জেওর, সোনার চুড়ি ভরা দুহাত বাড়িয়ে দিলে এগিয়ে এলো, ভালুকের মতো। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নেমে এলে কান্তা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তুমি খুব ভালো। আমি তোমাকে ভালবাসবো।

তোমাকেও আমি শুধু ভালোবাসাই দেবো, প্রাণ উজাড় করে দেবো। আমার আর কিছু দেবার ক্ষমতাই নেই তো!

কিছু বুঝলোনা কান্তা, ভবল বিনয়, নিবিড় আবেগে তার বুকের মধ্যে মিশে গেল।

মার্চ ২০০১

স্মৃতি, তোকে ভুলবো না



স্মৃতি, তোকে ভুলবো না। কোথায় লুকিয়েছিল এই কথাগুলো হাল্কা কুয়াশার মধ্যে না স্থির বাতাসের পরতে পরতে, কয়েকটি ছোট্ট পাখির মতো? সহসা তাকিয়েছিল কিছুটা হকচকিয়েই। কারণ কানের কাছে এসেই বাজে। আঙুল দিয়ে ঘাঁটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বোঝে তার মনের মধ্যেই লুকিয়ে, মাঝে মাঝে এমনিতেই নড়াচড়া করে মাত্র।

একটু দূরেই ছাড়বার জন্য প্রস্তুত দূরপাল্লার বাসটা, ক্রাচে ভর করে সেদিকে যেতে থাকে দ্রুত।

আটটা বাজবে এখনই। আটটায় যে বাসটা ছাড়ে তাতেই প্যাসেঞ্জার হয় বেশি। কারণটা বোধ হয় রাজধানীতে যাচ্ছে অফিস-আদালতে দুপুরের আগেই ধরনা দিতে কিংবা তদ্বিরে যাওয়া উত্তম। এটা দিবসের প্রথমভাগ। এক নবীন কবিরও রোদ থাকে, বৃষ্টি হলেও মন্দ না। চারদিকে গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজ, খবরের কাগজের হাজিরা। আরেকটা রাত্রির পরে পৃথিবীর চাকাটা আবার ঘুরছে, তা কম সান্ত্বনার বিষয় না। আসলে এ সময়ে সমস্যা শোনার পালা জোরেশোরে শুরু হয় না। ফলে কর্তাব্যক্তিগণ খোশ থাকেন এবং দ্বাররক্ষী পিয়ন আর্দালিরাও টোশমেজাজ। বাংলাদেশের ক্রেমলিন সচিবালয়—একে যারা সমীহ করতে শেখে তারাই কিছুটা সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পায়।

কিন্তু এখন সিটিং বাসটা ধরতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার দশা। বয়স খুব বেশি তা নয় সংগ্রামের সময় ছিল কুড়ি, অতএব এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। এমন ওমরে অনেকে জোয়ানই থাকে। কিন্তু তর মাথা ভরতি কাঁচাপাকা চুল, জঙ্গলের মতো দাড়িগোঁফ। বিশেষত কাপড় জোব্বাজাব্বা। ডান পায়ের অর্ধেকটা আছে। খয়েরি রঙের যে ফুলপ্যান্টটা পরেছে তা হাঁটুর কাছে উলটিয়ে ভাঁজ করা, গায়ে ছেঁড়া শার্টের উপরে একটা পুরাতন কোট। অদ্ভুত আদমিটি বাসের দরজার কাছে জলদি আসে এবং একটা আছাড় খেয়ে পড়ছিল প্রায়। বাসের রডটা ধরে নিজেই নিজেকে সামলে নিল।

একটাই তার বিশেষত্ব, চোখজোড়া ঠিক আছে। ছানি পড়েনি, তাকালে জ্বলজ্বল করে। ছোকরা হেলপারটা তখনো নিচে ছিল। সে পিতলাগলায় বলে উঠল, হেইবুইড়া হালা। বেইন্যালার খ্যাপডা নষ্ট করিস না। বিসমিল্লাতে ফহিরফাহরা নিতে পারুমনা।

কি কসরে তুই বাপজেঠঠা, জাওরা। একটা চটকানা মাইরা তর সবগুলা দাঁত ফালাইয়া দিয়াম। যখন বলছিল তার দৃষ্টি থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে বলল, আমি ফহির মিসকিননা। নগদ পইসা ভাড়াদা যাইয়াম।

ইসু! বাহাদুর কত!

এদিকে গোলমাল শুনে ড্রাইভার সোনাগাজি স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে নেমে আসে।

কিরে মাইন্কা! খুব বেডাগিরি করতাছস্ দেহি, খবরদার! লোকটার বাঁয়ের বাজুতে ধরে, তারপর তাকে নিয়ে সামনের দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল, এই পোলাপান গুলা ঘাউরা কুত্তা অইয়া গেছে গা, ময়মুরুব্বি চিনে না, মানে না। আপনে আমার লগে বইবেন।

কেডা তুমি বাজান। সোনাগাজির দিকে কিছুটা তাজ্জব চোখে তাকায়, বলল ছদ্মবেশী

ফিরিশতা না তো?

না, চাচা মিঞা। তা অইয়াম কেমনে। আমি এক গরিবগোবরা। গাড়ি চালাই, সারাদিন জানে খাইট্টা দুই পইসা পাই। বৌ পোলাপানরে কষ্টে বাঁচাইয়া রাখছি। দোয়া রাখবেন বড় ছেলেডা আর ছোড মাইয়াডা ইসকুলে পড়তাছে।

মাশাল্লা, মাশাল্লা। সোনাগাজি সাহায্য করলে, নিজের যতটা জোর আছে তাও কাজে লাগায়। তার বাঁ পাশের সিটটায় বসল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কি যেন ভাবতে থাকে, তারপর ডান দিকে একটু ফিরে জিজ্ঞেস করল, একটা কথা কই বাজান?

কন্‌না। স্টার্ট দিয়ে গিয়ার টানে যাত্রা করবার জন্য, একসিলেটার চাপতে চাপতে সোজা করে স্টিয়ারিং হুইল। এটা ঢাকা-সিলেট বিশ্বরোড, সামনে তাকিয়ে দেখল অনেক দূর ইস্তক।

আচ্ছা, তুমি যে আমারে ইমুন সম্মান দেহাইলা, তুমি কি আমারে চিন? আমার নাম জান?

চিননের দরহার আছে চাচা? ধরন ধারণ দেখলে বুঝা যায় না? আপনের চালচলনই তো কইয়া দেয় আপনে একজন-

আমি কি? কইয়া ফালাও বাজান। দেহি শুদ্ধ না ভুল। আপনে একজন মুক্তিযোদ্ধা। সোনাগাজি হাল্কা গোঁফের নিচে মৃদু হেসে বলল, মুক্তিযোদ্ধা আবু কাওসারের নাম এই তল্লাটের কেনা জানে। বাঘের মতো গর্জন করত। আমি কি ভুল করতাছি?

অইছে, অইছে। আর কইয়োনা বাজান। বেশি কইলে আমি সইতে পারুম না। আমি চেঁচাইয়া উডুম—! প্রায় কেঁদে ফেলে, ভাঙাস্বরে বলল, আমিতো সবকিছু ভুলতে চাই বাজান। কিন্তুক ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না। হুঁ হুঁ নাম জানে অনেকে তাতে কি। এইড্যা কিছুক্ষণ বাঁচা, যাতে সুখ নাই শান্তি নাই?

ছেঁড়া কোটের জেবে হাত দেয়, একটা ডিবা বার করে আবু কাওসার। ভৈরব কলেজের প্রাক্তন উচ্চমাধ্যমিক। সেই সময় থেকে ঝড়ে বৃষ্টিতে রোদে বাদলায় ধূলায় মাটিতে থাকতে থাকতে একটা যেন আদিমে রূপান্তরিত হয়েছে, ভদ্র ভাষাও অনেকটা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে উঠে আসে সেই চোস্ত জবান, কেমন করে টের পায় না। ওটা আপনা-আপনিই হয়, মৃত-শহীদ আত্মীয় পাড়াপড়শী সাথীদের মনে পড়া যেমন। আঙুলের এক চাপে কৌটাটা খুলল। ভেতরে কালচে শাদাপাতা, একধারে কিছু চুন। বাঁ হাতের তালুতে কিছু নিয়ে ডান হাতের আঙুলে ডলতে থাকে তারপর মুখ হা করে। ডান কলের মধ্যে গুঁজে দেয়। প্রতিদিনই তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোন একটা, ছোট হেকে বড় হোক ধাক্কা খেলেই ঝট্ করে বিগড়ে যায় মেজাজটা, মাথায় যেন রক্ত চড়ে। ক্রাচদু'টো ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে। হাঁপাতে থাকে। যদি তক্ষুণি উপযুক্ত জবাব দিতে পারত তখন এমন হতো না। এমন সময়েই তার মনে পড়ে নেশার কথা। তার নেশা করা মানে তো এইটুকুই, খইনি। কিছুক্ষণেই মাথার ভিতরটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে, আরও কিছু দেরিতে শরীরে অসাড়তা। দুলতে থাকে স্মৃতিবিস্মৃতির দোলায়।

পিছন থেকে একটা মালবোঝাই ট্রাক বারে বারে হর্ন দিচ্ছিল ওভারটেক করবার জন্য। এরকম অবস্থায় ঠাণ্ডাস্বভাবের সোনাগাজিও ঠিক থাকতে পারে না। কিন্তু একটুখানি কপাল

কোচকানই সার। সে জায়গা ছেড়ে দিতে দিতে পাশ নিতেই ওটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলে যায়।

আরও কিছুদূর এগুলে খড়র্ খড়র্ ঝাঁকুনি খেয়ে চলে। এসময় কাওসার অনুভব করে চোখ জড়িয়ে আসছে, তন্দ্রার ভিতরে ডুবে যাবে। সর্বদা এরকমই অভিজ্ঞতা। ডানদিকে কিঞ্চিৎ কাত হয়, বাঁ হাতের কাছে ঠেকিয়ে রেখেছে সারাক্ষণের বন্ধু ক্রাচজোড়াটি। বিড়বিড় করে বলল, আমার ঘুম পাইছে, বা'জান। একটু ঘমাই?

কোন উত্তর দেয়না সোনাগাজি।

মনোযোগের সঙ্গে চালাচ্ছে।

দেখা যায়, সামনে আরও ভাঙা।

স্পিড স্লো করে। পাশে তাকায় সামান্য। তার মনে হল, না ঘুমালেও মগ্ন, চোখ বুঁজে আছে।

এটা নিদ্রা নয়, অন্যরকম চেতনা, স্বপ্নের মতো। অস্পষ্ট প্রথম, ধোঁয়ার মতো, ক্রমে স্মরণের দরোজা যেন খুলে যায়। সেখানে ঢেউ, তারপর আঁকাবাঁকা। ক্রমে একটা ধারা লাভ করে। স্বাভাবিক ঘটনার জাগরণ। নিজেকে নিজেই দেখছে। আসছে হামাগুড়ি দিয়ে, এবড়ো মাটিতে বুক ঘসে সরীসৃপের মতো। আসছে, আসছে। হারেনি, হয়েছে জয়ী। তবু একি বেঁচে থাকার একটু আশ্রয় খুঁজে নেয়ার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা? যদি তাই হয়, খারাপ কি। যদি সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটাই পেয়ে যায়, তবে তো আরও ভাগ্য। লড়াই শেষ হয়নি, চলবে বিজয়পর্যন্ত এবং তা ছাড়িয়েও—মরলে চলবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা, এক বিশিষ্ট শক্তি। অবিরাম অগ্রাভিযান, এটাইতো অঙ্গীকার। আশুগঞ্জ ঘাঁটি থেকে চুপি চুপি ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় এসেছিল দুটো বোটে করে, দুশমন। শ্মশান বরাবর থামে, আধো অন্ধকারে দূর থেকে দেখা যায় ছায়ার মতন। প্রামাণ্য সংবাদ সংগ্রহ করার পরেই প্ল্যান করেছে নিশ্চয়। শোনা যায়, ইন্ডিয়া আর দেরি করবে না, আর যদি দেশের ভিতরে অভিযান চালায় তাহলে এই হবে একটা প্রধান রুট। তাদের সঙ্গ দেয়াই বোধ হয় উদ্দেশ্য। মুক্তির একটি দুঃসাহসী গ্রুপ এই দক্ষিণ জগন্নাথপুরে অবস্থান গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, কাওসারের মাথায় খেলছে এটা তারই দল। ঝোপে ঝাড়ে, খালের খাদের কিনারায়, গাছের আড়ালে পজিশন নিয়েছিল। শত্রু তিন সারিতে ভাগ হয়ে সাবধানে এগুচ্ছিল। চিতাস্থলের বিপরীতে খালপারে আসতেই এদিকে থেকে গর্জন করে ওঠে অস্ত্রগুলো, গ্রেনেড উড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত, ফটাফট্।

অগ্রহায়ণ পনেরো, বুধবার। ডিসেম্বর এক তারিখ। পঁচিশে মার্চের পরদিন থেকেই জনপদ শূন্য হতে শুরু করেছিল। এদিক থেকে কিছু সংখ্যক যায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে পশ্চিমে আত্মীয়কুটুম পরিচিতদের বাড়ি বাড়ি; কিন্তু বেশির ভাগই নদী কিংবা স্থলপথে দলে দলে যেতে থাকে আগরতলা। এমনিতে সহজসরল দেহাতি লোকজন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেমন করে যেন টের পায়। আজ রাতে যে আক্রমণ হবে এটা বিকালের দিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, কানাঘুষাও চলছিল। কাজেই তখনও যারা অন্য কোথাও যায়নি তারা সন্ধ্যার পর পরই গাটরিবোচকা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে গেছে। শুধু যায়নি পঞ্চবটির একটি মালো পরিবারের দুইজন। আবু কাওসার ওপার থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছিল। বেশ কয়েকটি অপারেশনে সাফল্য লাভ করে আবু গ্রুপ। আর এখন তো শেষ পর্যায়। সাহস বহুগণ হয়ে গেছে। শত্রু গ্রামে ঢুকতে পারলো না, বরং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেটে পড়ে।

আজকেও অপরাজিত আবু কাওসার। কিন্তু ডান পায়ে গুলি লেগেছে। মাথার গামছাটা খুলে ওটা আঁট করে বেঁধে দিয়েছিল সহযোদ্ধা দেলোয়ার। হামাগুড়ি দিলেও রক্ষ্য ওর ঠিকই ছিল। কৈশোরকালে যে বাড়িতে প্রায়ই দিনারাত কাটাত, যাচ্ছেতাই করত, বিশেষত নানাজাতের মৎস্যভক্ষণ সেটা চিনতে দেরি লাগবে? বাঁশের বেড়ার কাছে এসে গেল। জানতো মরদ আছে একমাত্র বুড়া হরিমোহন মল্লবর্মণ। সরাক্ষণ শুয়ে থাকে আর কাশে খুক্‌খুক্ করে। তার একটা পাগলামি, এমনিতে যমের হাতে ধরা দেবেনা। গুলি খেয়ে মরবে। তাই যে কোনদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনলে লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে ওদিকে যেতে চায়। আজকে বের হয়নি কেন, বোঝা গেল না।

বেড়ার দরোজায় আওয়াজ শুনে বেড়িয়ে আসে স্মৃতিরানী-ময়লাকাপড়, আলুথালু বেশ।

দু'হাত ভর করে সোজা হয়ে বসে উঠানে আবু কাওসার, ফিসফিস ডাক দিল, স্মৃতি!

আবুদা আইছেন?

অয়ো, তুই কিমুন আছস।

ভালাই, তবে খাওনটাওন কিচ্ছু নাই। গুণ্ডাবদমাইসও তো সব চম্পট মারছে।

হ, বুঝলাম। কাকাবাবুর কাশি হুনলাম, উনি আজগা বাইরে গেলেন না? এত বড় একটা জং অইলো!

উনি মত পাল্টাইছেন। গুলি খাইবেননা, যমবাবাজির পদধূলিই নিবেন। হেসে ওঠে কাওসার। বলল, ভালাই অইছে! অহন জলদি মরবেন না।

আজগা খুব বড় যুদ্ধ অইছে, মনে অইলো। আপনে শহীদ অইলেন না?

না স্মৃতি। অইতে পারি নাই। পায়ে গুলি খাইছি, খুব ব্যথা অইতাছে। এ গাঁয়ে ডাক্তার কবিরাজতো অহন একদম নাই।

আমি পাতার রসদা ব্যান্ডেজ কইরা দিমুনে, আমার তোলা শাড়িডার আঁচল ছিঁড়লেই অইব। আপনেরে তো জাগা দেওন লাগব। আমি একটা বড় গাতা খুঁইড়া লতাপাতার চাকনি দিয়া রাখছি। ওডাতে থাকবেন?

না, একটা ঘরের কোথাও ব্যবস্থা কর। এই নাও এলেমজিডা, আমি হুতলে শিয়রে রাইখ্যো।

আমি আপনের খাওনের চিন্তায় আছি।

দূর পাগলি! খাওন লাগবোনা। জল আছে তো?

খালি জল খাইয়া রাইত কাডাইতে পারবেন?

অয়ো, পারুম। গান্ধীজি অনশন করতেন না?

হেইড্যা তো ঠিকই। দুইন্যায় পান্ডাইয়া গেছে না? স্মৃতি ম্লানস্বরে বলল, আইচ্ছা আবুদা আমার কাছে যা আছে তা দিলে খাইবেন তো?

তোর জিনিশ খাইতামনা, এইডা কি সম্ভব।

আইচ্ছা, ঠিক আছে।

দক্ষিণ ভিটিতে জবুথবু ছোট একটা চালাঘর। তার এদিকটায় একটা মাটির পাকাল, যাতে রান্নাবান্না হয়ইনা, বলা যায়। বড়ভাই ছিলেন মনোমোহন, প্রথম অবস্থাতেই পরিবার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ওপারে চলে গেছে। বৌদি শান্তিবালা এটাতে পাক করতেন। এখানে হাত তিনেক জায়গা আছে, পিঁড়িতে বসে জনাতিনেক খেতে পারে। বাদবাঁকি সবটা জুড়েই

আবর্জনা স্তূপ। ভাঙা কাঠ, বাঁশের টুকরা। ছেঁড়াছোড়া পুরাতন জাল। নৌকার গুলুই বাতাকপিকল, দড়িদাড়া। অন্ধ নয় স্মৃতিরানী। দুই চোখে ভালো দেখে, কিন্তু আঁধারেই যেন দেখে বেশি। নিখুঁতভাবে কাজ করে যায় হাতড়ে হাতড়ে, খুব একটা ভুল হয়না। কোথাও ঠেস্ খায়না। সঠিক আন্দাজে ওখানকার ভিতরে এক চিলতা জায়গা সাফ করে এবং সেখানে ছালা বিছায়। একটা পুরাতন কাঁথা খুঁজে আনল।

বুড়া হরিমোহন বিলাপ করছিল। আর বলছিল, আমার মেইয়া আমারে মারতাছে হারামজাদি। হারামজাদি খাওন দে আমারে! খাওন দে।

বিছানায় গিয়ে বসেছিল আবু কাওসার। তাড়াতাড়ি, হঠাৎ মনে পড়লে, কোমরে বাঁধা, ছোট কাপড়ের থলেটা খোলে। ওটাতে কয়েক টুকরা শুকনা রুটি এবং গুড় ছিল। স্মৃতি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, ওর দিকে হাত বাড়িয়ে ওটা দিয়ে বলল, এর মধ্যে কিছু আছে খাবার। জলদি গিয়া দে।

স্মৃতি আদেশ পালন করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে এবং তার পা'য়ের কাছে বিছানায় বসে। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর কথা কয়ে ওঠে স্মৃতিরানী, বলতে থাকে, লোহে আমারে বেশ্যা বানাইয়া ফালাইছে। আমি নরকে যাইয়াম। কিন্তু আমার পোলাডা কি পাপ করছিল? এক বছরের পোলাডা? হ্যারে আমার কোলের থে কাইড়া নিল। শ্মশানের পাকায় আছাড় মাইরা মাইরা শেষ করল। তারপর নদীৎ ছুঁইড়া ফালাইল। হের বাপ না হয় দোষ করছিল। তারে শাস্তি দিতো। কিন্তু শিশুরা তো স্বর্গের, হেরার কোন অপরাধ থাকতে পারেনা। আপনে মুক্তিযোদ্ধা, ন্যায়বিচারক। কিছু কন্ আমারে—বিছানা থেকে উঠে বসেছিল, থ মেরে তাকে আবু কাওসার। কণ্ঠস্বর যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এইতো এখনো জ্বল্‌জ্বল্ করছে, একাত্তরের দোসরা এপ্রিল এখানে বড় একটা যুদ্ধ হয়েছিল। আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার, গৌরিপুর-সব এলাকা তছনছ করে। নামে কালরাত। শত্রুরা মালো বাড়িতে ঢুকে স্মৃতিরানীর ওপর বলাৎকার করে এবং তার বড় বোন প্রীতিরানী ও ছোট বোন গীতিরানীকে ধরে নিয়ে যায়। ধর্ষণের ফলেই গর্ভবতী হয়েছিল স্মৃতিরানী।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলে আবু কাওসার টের পায় স্মৃতি তার বিছানায় এসে বসেছে। তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অসহ্য লাগছিল। আস্তে আস্তে উঠল। ডান হাতটা বাড়িয়ে পরখ করে। মুখের ভিতর থেকে আওয়াজ বার হয়, একি স্মৃতি তুমি!

হ, আমি আবুদা। স্মৃতি নিচুস্বরে বলল, আমি বুঝতে পারি তুমার খুব খিদা লাগছে। আমারও বুহের মইধ্যে টনটন ব্যথা। আর সহ্য করতে পারতাছি না। তুমি কথা দিছিলা না আমি যা দিব তুমি খাইবা? আমার বাচ্চারে মাইরা ফালাইছে; কিন্তু আমি মা, আমার দুধ তো ঠিকই আছে। জমা হয়। ফুইল্লাফুইল্লা উডে। আমি ছটফট্ করি। মনে লয়, ছুরি দা কাডি। সব বার কইরা দেই। তুমি তো দেশপ্রেমিক, তোমার সাহস আছে না?

আছে স্মৃতি। কাওসার অকম্পস্বরে বলল, কি দিবে, তুই দে।

তখন লেছড় মেরে ওর আরও কাছে যায় স্মৃতি, ঘাড়ের পিছনটায় বাঁহাতে বেষ্টন করে ঠেলে তার মুখটা নিচু করে। প্রথমে বাঁ স্তনের বোঁটাটা তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঠেসে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার দুধ খাও, পেট ভইরা খাও। তুমার খিদা থাকবো না। আমি শান্তি পাইয়াম।

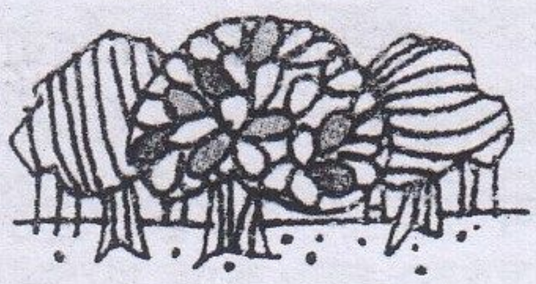
বাস থেকে ফকিরাপুলে নামবার পর একটা রিক্সা নিয়ে নির্যাতিতা মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়েছিল। বিজয়ের পরপরই ঢাকায় এসে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল পায়ের অপারেশন করাতে ডাক্তাররা হাঁটু অবধি বাকিটা কেটেই ফেলে দিয়েছিলেন। তখন তার সঙ্গে স্মৃতিরানীও এসেছিল। সেখান থেকে পঞ্চবটি ফিরে গেলেও, কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলে আবার ঢাকায় আসে। সহকারী ম্যাট্রন হিসাবে ক্রমে কাজ পায়। বছরখানেক পরে কলকাতায় যায় ভাইকে খুঁজতে।

সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় এই গ্রামেরই একজন নিপীড়িতা গৃহিণী আশ্রয় নেয়ার পর গ্রামে গেলে সে বলল, স্মৃতিরানী ফিরে এসেছে। কিন্তু সেখানে ক্রাচে ভরে হাঁটতে হাঁটতে তন্নতন্ন করে খোঁজে, অনেককেই জিগ্‌গেস করল। ম্যাট্রন মন্তব্য করলেন, ছুটি তো কখন ফুরিয়ে গেছে। ছুটি বাড়ানোর দরখাস্তও করেনি। বোধ হয়, আর আসবে না।

এখন কোথায় আছে স্মৃতিরানী? ফিরতি বাস ধরতে চলে আসার সময় তার মনে গুঞ্জন করে ফিরছিল যদি নাই আসে ফিরে কোনদিন, স্মৃতি তো কাছেই আছে। আছে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, চোখের তারায়। আবু কাওসার আপন মনে একবার মৃদু উচ্চারণ করে, যেখানেই থাকিস, আমি চেতনাভ্রষ্ট হলেও, স্মৃতি, তোকে ভুলবো না। আমি তোকে ভালোবাসিনি, তবু জনম জনম খুঁজে যাবো। তুই ছিলে আমার প্রাণদাত্রী দেবী।

জানুয়ারি ২০০১

মুখকোশ



আদিগন্ত থমকে থাকা থোকা থোকা মেঘমালা, তার নিচে নদী জনপদ জুড়ে তার ঘুটঘুটে ঘনছায়ার সঞ্চরণ, এলোমেলো। একি বাদলা আবহাওয়ার ধরন, না অমাবস্যার রূপ তা বোঝা যায় না। সন্ধ্যা নেমেছে। তার কিছু পর থেকেই তল্লাট জুড়ে গমগমে ভাব, ঘরবাড়ি পাড়াগুলো ঝুম্ মেরে আছে। কিছু ঠাণ্ডার আমেজ। এ রকম অবস্থায় দুর্যোগ শুরু হলেও ভারি গলাফের প্রয়োজন হবে না, গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে রাখলেও চলবে; কিন্তু সেজন্য লোকজনের ভিতরটা জমে আছে, তা নয়। অন্য সে কারণ। খারাপ রাতে মিলিটারির আগমন হয় এটা সেই আতঙ্ক। কাছের দুই গ্রামের সঙ্গে তাদের সঙ্গে জবরদস্ত মোলাকাত, দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে এখন এই শ্রীরামপুরকে দরমুজ করতে আসা অসম্ভব নয়, বিশেষত যখন সীতা সখিনাদের প্রতি তাদের মনোযোগ চমৎকার। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানেও পারদর্শী—এই যেমন গুলি করে কমিয়েছে একটাতে তেরোজন, আরেকটাতে আঠারো। এসব আসল খবরই। শুনতে শুনতে দেহাতি আদমিরা এখন অভ্যস্ত, কারুর কারুর কপাল একটু কুঁচকে যায় মাত্র।

একটু পর উত্তর দিকে গুড়ু গুড়ু আওয়াজ, মাঠ ঘাট মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে ঃ প্রকৃতি তো বেদিশা, মজার দৃশ্য দেখতে আয়োজন চালাচ্ছে বুঝি।

হঠাৎ আকাশ চিরে বিজলিও খেলে যায়, চাবুকের মতো। এটা কার? জানেনা, তবে এক রকম আলো। তার আভায়, কাছে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো দেখা যায়, কিন্তু তা'কে যায় না চেনা। এমন জলদি। সারাটা এলাকা। আঁধারের চাদরে মোড়ানো বৈকি, কিন্তু কোন কোন বাড়িতে বাতি আছে। তবে লুকানো। কুপি হলে গাইলের ভিতর, আর হারিকেন হলে খালি কেরোসিন টিনের মধ্যে। এমনভাবে রাখা যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়।

এখন কাঁদছিল মহল তা নয় কারণ কাঁদলে তো একটু হলেও শব্দ হোত, অথচ ওর গলার কিংবা নাকের কোন ধ্বনিও ছিল না। এক ঝলক স্থির আলো এসে পড়ে আছে ওর মুখের ওপর। কেউ যদি দেখে, দেখা যাবে এক বিষাদপ্রতিমা, যার দু'চোখ থেকে অবিরল পানি গড়িয়ে পড়ছে, গাল ভাসিয়ে দিয়ে।

একই ঘর। ঝাঁপের ওপাশে চুলা বানিয়ে নিয়েছেন যাতে রান্না করতে বাইরে কাটাতে না হয়।

গোলগাল চেহারার হাজেরা খাতুন মুখ বাড়িয়ে দেখলেন মেঘের কাণ্ড। নিঃশব্দে ভ্রূকুটি করলেন। সোমত্ত হয়েছে তো কম না, শাদি দিলে ছেলের মা হোত। আর এখনো ছেলেমানুষী গেল না। শাসন করা দরকার। ইনি টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকা ভাতের পাতিলটা ডেওওয়া নিয়ে নাড়তে নাড়তে একটা ডাক দিয়ে উঠলেন।

মহল, মহল! অনেকক্ষণ কোন জবাব না পেয়ে খালি জায়গাটায় এসে দাঁড়ান, কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে বললেন, তোর ভেগ্‌ভেগানি থামাইবি না দিয়াম কিছু? গুম্‌মুর, গুম্‌মুর? লাই পাইয়া মাথায় উঠছস্, না? বুড়ি অইছস্ তবু ছুড়ির ভাব গেল না! আয় ইদিকে। তুই ফেন্ গাল্‌বি, আমার অন্য কাম আছে। গোলামের পুতেরা কুম্বালা না আবার আইয়া পড়ে—

ওড়নার একদিকের কিনার তোলে জিনাত মহল, চোখমুখ মুছতে মুছতে আস্তে করে উঠল।

ওই একটি কথা, যার সঙ্গে ছোটবড় সব্বাইর চলন বলন গাঁথা। কোত্থেকে নামে এই গজব? শোনা যায় কয়েকরকম, কিন্তু ঠিক আছে একটাই। এখন বর্ষাকাল, গাং পানিতে টইটুম্বর ঃ রাতের আঁধারে আসে ওরা আশুগঞ্জ ঘাঁটি থেকেই, চুপি-চুপি এগোয়, ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না। সারা ইউনিয়ন জুড়ে তোলপাড়, ছুটাছুটি, চিৎকার। এদিকে তাদের সাহায্যকারী দলবল আছে, ক্রমেই বাড়ছে উৎপাত। দোসরা এপ্রিল শুক্রবার হেলিকপ্টার ঘুরেছিল নরসিংদির আকাশে, আর সেদিন সাঁঝের বেলা থেকেই লোকজনের নগর বর্জন শুরু হয়ে যায়। উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম, গাটরিবোচকা বেঁধে বেশিরভাগ পরিবারই আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নিতে চলে। রব উঠেছিল, রেললাইনের ধার ধরে মার্চ করে আসছে পাঞ্জাবীরা। দু'পাশের কাছাকাছি বাড়িঘরে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন লাগাচ্ছে, দাউদাউ করে জ্বলছে, অঞ্চল। দূর থেকেও দেখা যায় যার ছটা। ভয়েডরে দিশাহারা। পিতা মুন্সি হেলাল মামুদ, তড়িঘড়ি বাসায় এসে ঢুকেছিলেন। স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষক। খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। পিরহানের ভিতরে গতরটা তার কাঁপছিল। পঁচিশ তারিখের আসল খবর এতদিনে পাওয়া যাচ্ছিল ঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত। বুদ্ধিজীবী হত্যা, নারী নির্যাতন। এখন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকেও আসছে যখন বলাবলি হচ্ছে, তখন কিছুটা সত্যতা আছে নিশ্চয়ই। এ অবস্থায় বাঁচার উপায় নিজ গেরামের বাড়িতে চলে যাওয়া যদিও সেটা মেঘনার পার। মুন্সিবাড়িতে আরও দুই শরিক, চাচা ও জ্যেঠা। এদের অংশ ওরা কাজে লাগিয়েছিলেন। বিনা নোটিশে গিয়ে হাজির হলেও উত্তরভিটায় তাদের হিসসার বড় ঘরটা অল্পসময়ে খালি করে দিলেন। পুবভিটির বাংলা ঘর ইজমালি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরেক সমস্যা, উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সোহেল ভাই, সহপাঠী বন্ধু মাসুদ ভাইয়ের দলে ভিড়ে ওপারের উদ্দেশ্যে মেলা দিল। চুল উসকোখুসকো, পিঠে একটা কিটব্যাগ-ঝুপ করে মা'য়ের কদমবুচি শেষে বেরিয়ে যায়।

মাসুদ কি মনে করে ফিরল। কাছে আসে। কাঁধে হাত রেখে বলল, আসি মহল। দুশ্চিন্তা করিস্ না। মাঝে মাঝে খবর পাঠাবো। আমরা ফিরে আসবো। তিন মাসের ট্রেনিং দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

অশ্রুতে ভরে, এসেছিল চোখজোড়া, কিছু বলতে পারেনি, বিড়বিড় একটু কেঁপেছিল ঠোঁট। বিদায় নিয়েছিল, অনুমতি চায়নি। কোন কোন সময় অস্বাভাবিক, আর এমনিই হয় বিদ্রোহের কাল।

গোপন বার্তাবাহক আগে আরও দু'বার জানিয়েছিল, এখন আরেকবার। ওরা দেশের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া বর্ডার দিয়ে। চক্ষের নিমেষে যেন কেটে গেছে নব্বুইটা দিন। গতকাল এসে পৌঁছেছে হোসেননগর। এখানে আসতে দেরি হবে না, মাঝখানে একটা বড় খামার মাত্র। এই আসায় অনেক আশা আছে বটে কিন্তু তা সর্বনাশও হতে পারে। পদে পদে ওয়াচার। একটু গন্ধ পেলেই কোন কথা নেই, ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেয়। আর তখন থেকেই ছোট ছোট কেয়ামত।

আলুথালু বেশ, কয়েক গোছা চুল মুখের পাশ দিয়েও ছড়িয়ে আছে। পাকালের কাছে এসে জলচৌকিটা টানল।

ওর ম্লান চেহারাটা লক্ষ্য করে মায়া হলো মায়ের, একটু এগিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলেন।

আদর করতে করতে ডুকরে উঠলেন, বলতে লাগলেন, কিছ্ছু মনে করিস্ না মা, তোরা তো দেখতে পাস্ না। আমার কইলজাডা ভাজাভাজা অইয়া গ্যাছে গা। তুই বাপকে দেহার লাইগ্যা কান্দস্—আর আমার হগল কান্দন হুগাইয়া গেল। আমি কি করুম? কই যাইয়াম মাইন্সের ঠিসারা আর আমার সহ্য অয়না। তাইন্রে হগলতে রাজাকার কয়, অথচ ইমুন ভালামানু এলাকায় আর কেডা আছিন্। কেমনে ইমুন বদলাইয়া গেল। কি পাপ আমি করছিলাম, যে আমারে ইমুন শাস্তি।

আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, এবার চোখ বড় বড় করে তাকায় মহল জননীর মুখের দিকে। জিভ শুকিয়ে গেছে ওর। কথা সরে না। একজন কঠিন মহিলা হিসাবে পরিচিতা, তার চোখেও পানির ধারা! এইটা তাজ্জব। তার যে চেনা চেহারাটা, তার নিজের নয়!

এ সময় চট্ করে মনে পড়ে সাহাপাড়ার সই মন্দাকিনী, আর তার বড়দিদি মনোরমার অন্তর্ধানের জন্য ওর বাবাকেই সবাই দায়ী করে। আরও অনেক আছে। এবং অভিযোগ বাড়ছেই কেবল। প্রথমদিকের গোলমালের মধ্যে একঠেলায় কয়েকটি হিন্দু ও মুসলিম পরিবারের বেশকিছু, যে গণকবরে চলে গেছে, লোকের বিশ্বাস তাতেও উনার হাত ছিল। এসব শুধু আপত্তিকর নয়, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।

ওকে ইনি যেভাবে বুঝেছেন, তাই সেটা আসলে ভুল। সারা শৈশব, কৈশোর। এই সেদিন সংগ্রমের আগ পর্যন্তও বাবার আদর স্নেহ, ওর প্রতি এসব মধুময় ছিল, তার তুলনা হয় না। বাইরে থেকে যখন আসতেন, একটা না একটা কিছু হাতে কিংবা পকেটে করে আনতেনই। কাছে না ডেকে খেতে বসতেন না। একদিনের জন্য দূরে থাকবেন, এটা ছিল অসম্ভব। এখন দু'সপ্তাহ চলছে, তা'কে দেখছে না। কষ্টকর বটেই। কিন্তু আম্মা ঠাহর করতে পারেননি বাবাকে দিনের পর দিন না দেখে আছে বলে চোখের পানিতে সে গাল ভাসায়নি, যদিও কাছেই পুবপাড়া আর তা পা'য়ে হাঁটায় দশবারো মিনিটের পথ। এটা অভিমানের কারণ হতে পারত। রোদনটা ঠিকই ; কিন্তু এইভাবে ভাববার আদল দেওয়া একটা আবরণ। এটা যদি না হয় তবে কি জন্য এই নীরব অশ্রুপাত? তা'ও জানে না। সন্ধ্যার সময় বাইরের পথে ছিল। এদিকে যেন কেউ নেই, কিছ্ছু নেই। আনমনা মুখ উঁচিয়ে দেখছিল ঘনায়মান কাজল রূপায়ন তারপর দৃষ্টি নামে বড় খামারের দিকে, বুঝি দিগন্ত বিস্তৃত। কালো কালো পোচ আছে। কিন্তু সব শূন্য, শূন্য।

তখন মাথার ভিতরটা ঝিম্ঝিম্ করছিল, ক্রমে অসহ্য লাগছিল। আস্তে আস্তে একপা দু'পা ক'রে চলে আসে ঘরের ভিতরে।

আম্মা ঝাঁপের ওপাশে মাগরেবের নামাজ আদায় করছিলেন। ছোটভাই নেহাল। ঘ্যান্ঘ্যান্ করতে থাকলে ওর সাথী পাশের বাড়ির হিরণের সঙ্গে নিজেদের বাড়িটা দেখে আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আসল মতলব ছিল, বাবার গতিবিধি দেখে আসবে। সে এখনো ফেরেনি। ছোট মামা কালাম বেপারী অসহযোগের শুরুতেই নিরাপদ স্থান দূর লক্ষ্মীপুরের শ্বশুরবাড়িতে চলে গিয়েছিলেন, বড় মামা সালাম বেপারি অচল আদমি, পবিত্র কোরআন খতমের তেলাওয়াত করছেন। বছর মুতি চান্দু আছে। সে রেঁধে খাওয়ায়। আসলে কোনদিকে কেউ নেই, কিছ্ছু নেই ঃ তবু আবার তাকিয়ে পরখ করে নিল। ভাঁজ

করা কোমরে গোঁজা ছিল টুকরো কাগজটা, হাত নিয়ে যায় কামিজের তলায়। ওটা বার করে খুলে ধরল। একটি বাক্য, ফেরার আনুমানিক তারিখ জানিয়েছে। দস্তখত একটি গোলের মধ্যে 'এস'। মাসুদ ভাই কিছু লেখেনি। কেন, কেন। দু'তিনটা শব্দও বলপেনে এঁকে দিতে পারত না? কিন্তু এজন্যই কি গভীর বেদনার নিঃসরণ? না, না মনে হয়, না। হৃদয়ের একেবারে তলদেশ থেকে গুমরে গুমরে যে নিবিড় ঠেলে ঠেলে ওঠে গলা ইস্তক, তার সঙ্গে যেন বাইরের পৃথিবীর কোনকিছুরই যোগ নেই। সে যেন একটা সময়, একটা স্মৃতি। একটা বিস্মরণ। জন্মের ওপার থেকে আসছে, আসছে কৈশোরের রূপকথা ডিঙিয়ে। বয়স পঞ্চদশে পৌঁছবে কি? মানুষে মানুষে কেন এত ঘৃণা, কেন হিংসা। মারামারি, কাটাকাটি। সব আশা, সব ভরসা ওলটপালট। সব ইচ্ছা তছনছ। আবছায়ার মতো যে জননীর নড়াচড়া ভাসছিল তা'ও যেন অবাস্তব, এমন টলটলে অশ্রুও অচেনা। কাগজটা আবার কোমরে গুঁজে রেখে ডানহাতের পাতায় চোখজোড়া ও গালটা একবার মুছে নিল। এই মোছা সান্ত্বনা নয়—যে অজানা আপনা থেকে আসে তা'কে কি থামানো যায়? সমগ্র জাতি আজ অস্থির, রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। অনেক বড় কথা, ভাষণ শুনে আসছে, কোথায় মিলিয়ে গেল সব। অত্যাচারিত, চিরনির্যাতিত জনগণের জীবনকে রাক্ষসের পাঁয়ে বলি দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার কি মাহাত্ম্য আছে। অসহায় মৃত্যু বয়ে আনবে কি মঙ্গল।

সেই একদিন। ইসকুলে একপাল মেয়ের তর্ক শুনছিল। পক্ষ প্রতিপক্ষের যুক্তি মাথার ভিতরে যখন কিলবিল করছিল তখন সোহেল ভাই প্রায় দৌড়ে বৈঠকখানায় ঢুকেছিল, সঙ্গে তার বন্ধু মাসুদ। হ্যাঁ, সেটা ছাব্বিশের অপরাহ্ন। এখনো একটু চোখ বুঁজলেই দেখা যায় রুমালে ঘাম মুছে চেঁচিয়ে বলছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, যুদ্ধ। আর পিছনে হঠার উপায় নেই। হয় স্বাধীনতা, নয় আবার ক্রীতদাস। এবার পরাজিত হলে আগামী একশো বছর আমরা আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবো না।

চৌকির কোণে বসেছে। মাথাটা একটু কাত করে তার মনোযোগ। মাসুদ ভাই ধীরস্থির, বলল, যুদ্ধে নামলে অস্ত্র চাই। যুদ্ধ আমরা জিতবো কি ক'রে অস্ত্র ছাড়া? শত্রু সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে সোহেল ভাই, সবজান্তার ভঙ্গিতে জবাব দিল, যুদ্ধজয়ের জন্য আসলে দরকার বুদ্ধি ও সাহস। অস্ত্র তখন বর্ষার কইমাছের মতো আপনা আপনি এসে ধরা দেয়।

এটা রূপকথা, বাস্তবতা নয়। মাসুদ ভাই দৃঢ়ভাবে বলল, অস্ত্র মানেই আত্মবিশ্বাস। আত্মবিস্বাস ছাড়া আমরা একপাও সামনে এগুতে পারবো না। আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধে যাচ্ছি। খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি।

কি রকম? হাতের তালু ঘষে সোহেল ভাই, তা জানতে চেয়ে।

অকম্পস্বরে বলে মাসুদ ভাই, আমরা গণহত্যার মুখোমুখি হবো। পঁচিশের ঘটনা থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

এর প্রতিকার কি?

উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হওয়া।

সেটা কিভাবে সম্ভব?

যেভাবে সম্ভব তা ঘটে গেছে, তা জনতার জাগরণ। এখন আমাদের মিত্র খুঁজতে হবে,

মিত্র।

এর আটদিন পরেই ছিল যাত্রা। আজকেই যদি এসে পৌঁছায় নিজ গ্রামে দেখবে প্রায় বিরান মুলুক।

উত্তর আকাশে মেঘের ডাক আরও বাড়লে আম্মা হাজেরা খাতুন উঠে পড়েন, মাথায় কাপড় টেনে ডানদিকের বড় ঘরে যান। বড় ভাই সালাম বেপারি জায়নামাজে বসে তসবিহ্ জপছিলেন, ছানিপড়া চোখে চশমা, ওটা ঠিক করে তাকালেন। থক্‌থকে তার গলার আওয়াজ, কেডা গো হাজু নিহি?

জ্বি হাঁ ভাইসাব। আপনেরে একটা কথা জিগাইতে আইছি।

কি কথা, কওনা।

নানান গুজব হুনতাছি। আজ রাইতে আমরা এহানে থাহুম, না অন্য কোনদিহে যাইয়াম গা। লগে ডাঙর মাইয়া। কোন্‌ডা নিরাপদ।

উনি একটু চিন্তা করলেন। তারপর ছোটবোনকে বললেন, যাইবা আর কই এই রাতের বেলায়।

অহন কি দিনরাইত আছে, ভাইসাব।

না, আমি কই। বাড়িতেই থাহ। মানু কত কথা ছড়ায়, সব ঠিক না। তাছাড়া আমি তো আছি, মুরুব্বি। আমি খাড়ইলে কোন বেডা কি করবো।

আইচ্ছা হেলালডা কই। রাইতটা যহন খারাপ, খোঁজ নিতে আইবোনা? কোন নিশান তো দেখতাছি না। দুই হপ্তা হইয়া গেছে আমি গোস্বা কইরা বাপের বাড়িৎ আপনের কাছে আইয়া পড়ছি। একদিনও তো আইলো না। অনেক কামে নাকি ব্যস্ত। মৌলানা মানু, তার আর এত কি কাম।

দুইন্যাডনাই উল্ডাইয়া গেচে না বইন। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বড় ভাই বললেন, দেহছ্ না? তোর ভাউজ আমারে ফালাইয়া বাপের বাড়িৎ গেছে না। পোলাপান নাতিনাৎকর লইয়া? আমি কই ভালাই অইছে। তবে চান্দুডা না থাকলে না খাইয়া মরতাম।

ওরা যখন কেরোসিন কুপির লালচে আলোছায়ার মধ্যে আলাপ করছিলেন, তখন মেঘনার পার থেকে দু'টো কালো-কালো ছেলে দৌড়ে আসছিল। বেশি আলোড়ন শুরু হয়েছে উপরে, দূর থেকে যেন মাতাল হাওয়া আসছে ধেয়ে। ক্রমে নারকেল গাছগুলোর পাতা ঝাপট খেতে লাগল।

নিজেদের বাড়িতে এসে ওঠে, বুক ওঠানামা করছিল। হাঁপাচ্ছিল নেহাল। এবং হিরণও। ছায়ার আড়ালে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোনাকুনি দেখে দশ বারোজন সাঙ্গ পাঙ্গ সিগারেট ফুঁকছে, আর ফুর্তিফাতার কথা বলছে। বড় ঘরে বাজানের কাছে গেলে জানতে চান কি জন্য এসেছে। জানায় দেখতে, এখন নানি বাড়ি ফিরে যাবে। যাক্ না না যাক কিছু আসে যায় না। উনি ওদের বার করে দিলেন। ছোট হলেও জানত, এমনটাই করবেন। তবে সে আভাসও ছিল না যখন ওসমান লেম্বর বাড়িতে এনাকে তলব করে নিয়ে ধমকাচ্ছিলেন এবং কাজে গাফেলতির সাজার কথা বলছিলেন। উনি ভয় পাননি। সাহসের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছেন। বলেছেন, মেজর শাহাব শরীফ লোক, তার জন্য প্রয়োজনে জান কোরবান করবেন।

এসবই দুই বন্ধু টিনের বেড়ার ফাঁকে দেখেছে। কিন্তু কিছু কথা প্রথম বুঝতে পারেনি।

এই যেমন পান্তোয়া, চম্‌চম্‌। রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা বুঝতে পারেননি মনে হয়, বা'জান—হেলাল হুজুরও। তিনি বোকার মতো তাকিয়ে ছিলেন। তার সুবিধার্থে লেম্বর সাহেবের চোখের ইংগিতে ব্যাখ্যা করে চামচা জুম্মন। পান্তোয়া পুরাতন বউ, চম্‌চম্‌ নাচগানের শিল্পী। রসগোল্লা টসটসে তরুণী, আর কাঁচাগোল্লা নবীনা, যে যৌবনে পড়েছে। শেষ কিসিমের প্রতিই নাকি 'প্রধান' স্যারের আগ্রহ বেশি।

গেরামখান তো খা খা করছে, কোথায় পাবেন খাঁ সাহেবের খাদ্য। কিছুক্ষণ চুপ থেকে অপলক তাকিয়ে থাকেন। মনস্থির করে ফেললেন যেন, বললেন হয়ে যাবে। সব ব্যবস্থা ঠিক রাখবেন।

একটানা শোঁ শোঁ, সাঁ সাঁ, সব বৃক্ষের ডালপালা হেলছে দুলছে, ঝাপটা খাচ্ছে। ঘরের চালে অনেক থাবড়। বৃষ্টি ও বর্ষণ আসতে আর দেরি নেই বেশি। অন্ধকার গাঢ়তর। বাড়ির সামনের গাছতলায় এসে হিরণকে বিদায় দিল, এবং নিজে সাবধানে পায়ে হেঁটে বড় ঘরে ঢুকল। পাশ থেকে জলদি এসে ওকে ধরে মহল, তার ঠোঁটে আঙুল। মানে, কোন কথা নয়। আম্মা ঝাঁপের আড়ালে কোণার দিকে বসে আছেন, তার দু'হাতে আগলে ধরা একজন, ঘাড় অবধি উসকো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ রেখা। আড়াল করা হারিকেনের হালকা আলোর আভা এসে পড়েছে ওদের উপর।

ওকে নিয়ে মহল কাছে যেতেই একটা হাত উঠে আসে উপরে এবং একটানে নিচু করল। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর, কিমুন আছিস্‌ নেহাল! কিমুন আছিস্‌? আমারে চিনতে পারতাছস্‌ না?

পারছি সোহেল ভাই। সে উসখুস করে মুখটা একটু ছাড়ালো, নিচু গলায় বলতে থাকে, গাঙের পারে হুইন্যা আইছি মেঘের পর ছোডো লঞ্চ আইব মাল নিতে। তার আগে চলব ঘাতক দালালদের আক্রমণ—

ঠিক আছে, আমরা সব জানি। আইতে দে। তারপর দেখবি কি মজা।

জ্যাকেটের ভিতরে ডানহাতটা ঢোকায় সোহেল, একটা ডবল বোর বিদেশী রিভলবার বার করে। সেটা মহলের হাতে দিয়ে বলল, আমরা এগারোজন আছলাম। অহন দশ। বর্ডারের এমবুশে মাসুদ আমরারে ছাইড়া গেছে। মহল! এই অস্ত্রডা তোকে ওর উপহার।

উপহার! অস্পষ্ট ফিস্‌ফিস্‌ উচ্চারণ। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পাষাণ প্রতিমার মতো। আরেকটু নড়ে ঠোঁট, মাসুদ ভাই শহীদ!

কতক্ষণ চলে গেল? এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা? সময়ের যেন কোন আর পরিমাপ নেই—বর্ষণ থেমেছে, এখন শুধু অন্ধকার আর আকাশের দ্রিমিদ্রিমি দুর্বোধ্য সংলাপ। ছোট টর্চের আলোতে ঘড়ি দেখে রাত তিনটা। পথে পথে, গাছের আড়ালে, ঝোপেঝাড়ে সাথীরা প্রস্তুত। পজিশন নিয়ে আছে।

নীরবতা, হাতঘড়িটা চলছে টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌। বাইরের দিকে খোলা বাংলাঘরের দরোজা, একটা টেবিল কাত করে ফেলে রেখে আড়াল তৈরি করেছে, তার পিছনে উপবিষ্ট কমান্ডার সোহেল মামুদ। সঙ্গে ডানদিকে জিনাত মহল, বাঁপাশে নেহাল। আম্মাও আছেন তারপরে একটা চাটাইয়ের উপর, হাতের কাছে ধারালো, বটি। হ্যাঁ, এই তো। হঠাৎ কাছেই এদিকটায় লোকজনের কলরব, পরে চিৎকার শোনা যায়। মনে হলো, ছুটোছুটিও শুরু

হয়েছে। কিন্তু অল্পসময়। বাইরের পতিত জায়গাটায় কালোছায়ার ভিতর থেকে উড়ে এসে পড়ে ভীষণ শব্দে ফাটল একটা গ্রেনেড। চতুর্দিকে হৈচৈ বাড়ে আরও। এদিকে ওরা ঘাপটি থেকে উঠে, টেবিল ছাড়িয়ে, আলোচনামতো, প্রাঙ্গণের আমগাছটার তলায় চলে যায়। ঘন ঘন বিজলির চমক। দেখতে পেল একপাল কালো মূর্তি। প্রত্যেকের হাতে একনলা বন্দুক। থেমে থেমে, হুঁশিয়ার, আবার এগিয়ে আসছে। এরপর একটা ছট্‌কা দিয়ে এসে অদূরে, দাঁড়ায়।

সম্মুখে মুখোশপরা একটা, সে-ই নেতা নিশ্চয়।

বন্দুক উঁচিয়ে ধরে ঠাস্‌ঠাস্ করে বলল, সাবধান! যে যেখানে আছ নড়বানা। হাতে কিছু থাকলে ফালাইয়া দাও। জেনানা, তোমাগো ভয় নাই, আমরা তোমাগো রক্ষা করুম্—!

অন্যগুলোও তাক করে আছে।

থমথমে, কিছুক্ষণ।

তোরা রক্ষা করবে হারামী শয়তান। কে, কারে রক্ষা করে দ্যাখ্। একটানা রিভলবার চলতে থাকে, নিমেষে ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে বুক গলা মুখ, কালোমূর্তিটার আর্তনাদ করে পড়ে গেল। তার একটু আগেই অবিরাম ঠাঠা ঠাঠা আওয়াজ, এলেমজি চালিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরা কয়েকটিকে ধরাশায়ী করতেই বাকিগুলো অস্ত্র ফেলে চম্পট দিল।

একটু সামনে এগিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দেয় কমান্ডার, দুশমন তোমরা ঘেরাও অইয়া আছ, বেয়াদবি করলে সবগুলিনরে জাহান্নামে পাডাইয়া দিয়াম!

তখন লোকজন ও গেরিলারা এসে পড়েছে। বন্দুকধারীদের লিডার ঘাসের উপরে কাতরাচ্ছিল। খুব দূরে নয়, ওখানে যায় ভাইবোন। অন্যেরা তাদের পিছুপিছু। ভিড় করেছে। তিনচারটা হারিকেন এসেছিল। সবগুলাই তার মাথার দিকে ধরে। উবু হয়ে বসে সোহেল। একটানে ছিঁড়ে ফেলে মুখ ঢাকা কালো কাপড়টা, দেখে বা'জান, হেলাল হুজুর। দেখে ওরা বিস্মিত হলো না।

পানি দাও, একটু পানি। কেউ সাড়া দেয় না। শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। বেশ কষ্টে বলতে থাকেন, সোহেল, সোহেল! বাজান তুই ফিইরা আইছস্? তুই মুক্তিতে গেলে হেই অপরাধে আমি গোলাম অইলাম! আমি-আমি-আ-মি। এই যে মা মহল! তরে আমি সবচে-সবচে বেশি-আদর ক-র-তা-ম। তুই আমারে গুলি কর-ছস্, আমা-রে-মার-ছস্। ওরে-ওরে ক'তো-রা-একবার ক'-আল্লা-হ্, আল্লা-হ্ আমার গুণা-মাফ করবো—না?

না—! হঠাৎ সটান দাঁড়িয়ে এলেমজিটা উচ্চে তুলে ধরে এবং একটা তীব্র টানা চিৎকার করে ওঠে সোহেল, যা মাটি বৃক্ষ বন উপবন ছড়িয়ে তীক্ষ্ম তীরের মতো অন্তরীক্ষকে বিদ্ধ করল। ঘণ্টাখানেক পরে যখন আবার বর্ষণ নামে, তার একটানা ঝরঝর ঝম্‌ঝম মুখরতায় যেন বাজতে থাকে তার প্রতিধ্বনি॥

মার্চ ২০০১



দরিয়া দখল

আলো, অবশেষে বাতিঘরের আলো দেখা দিল লাল জোনাকির মতো। ঝিক্‌মিক্ করছে একটু পরপর-পিছনে থইথই সাগর, ডানে এবং বাঁয়েও। সন্ধ্যা নামছে। অল্প-অল্প বাতাস। এরই মধ্যে দূর থেকে এসে কানে লাগছে পারে ভেঙে-পড়া চলমান ঢেউয়ের একটানা সরসর আওয়াজ।

প্রায় কুঁজোপিঠ বুড়ো, কিন্তু হাতজোড়া কালো-কালো শক্তমক্ত। ঝাপসা চোখেও মাঝেমাঝে ছোট ঝলকানি, কখনো আবেগে, কখনো হিংস্রতায়। সামনেই ইঞ্জিনঘর, ডারাইবার ফালাগাজি চাক্কা ঘোরাচ্ছে। গলুইয়ে কয়েকজন। পাছায় সোপান ধরে আছে এই জগমোহন জলদাস, তেরো জেলের সবচে' বয়সী জন। সামনের দিকে দূরে দৃষ্টি, তার ভরাগলার ভিতর থেকে কথা বেরুতে লাগল ঃ

হায় বাত্তিঘর, সারাজীবন খালি তোরেই দেইলাম। তুই আঁধারৎ আঁরে কত ফর দেহাইছস কিন্তু আঁর জীবনে তো কোন আলোই ন পাইলাম। জিন্দি চাই ইন্দি শুধু আঁধার দেহি। ঈশ্বর আঁরে কিয়র লাই জর্ম দিল। আই হইত ন পারি। বহুৎ বন্ধুবান্ধব আছিল। কিন্তু অহন কেউ নাই। আই এহনো আছি। হায়রে কোরা কয়াল। মুক্তারে যদি হানুর অঙ্গে বিয়া দিতে ফাইরতাম তইলে মনে একটু শান্তি পাইতাম। তইলে বন্ধুর আত্মাও শান্তি পাইত। কিন্তু কোন এককানও নঅর। কি গইত্তাম—

এ রকম বকবকানি আর কতক্ষণ চলবে কেউ জানে না। জগা যেন কথার একখান বড় পিপা। একবার মুখের ঢাকনাটা খুলে দিলে পড়তেই থাকে, ঝরতেই থাকে শব্দরাজি। শুরু হয়ে গেলে সঙ্গের নাইয়ারা থাকে চুপচাপ। একটু-একটু হাসে কেউ-কেউ। চোখ ঠারে যখন কোন রসের জায়গায় এসে পড়ে। তার কথাগুলো বহুৎ দূর অতীত পর্যন্তও ঘুরপাক খায়। কখনো কখনো ঘুমের মধ্যেও কথা বলতে থাকে, হয়তো স্বপ্নের ঘোরে। সাগরের যেমন কেবল আওয়াজ, উঠে আসে অনন্ত জলরাশি থেকে তারও স্মৃতির মধ্যে তেমনি যেন বিশাল এলাকা আছে, যখন উছলে ওঠা ধ্বনিই কেবল শোনা যায়। দরিয়ার জবান বোঝা যায় না, ঘোরের সময়ে জগার জবানও। ছোটবেলায় পরবের সময়ে সারারাত শুনত। কথকের বয়ান। তার ভিতরে এলোমেলো পুরা একখান মহাভারত। কোন এক জায়গায় একটু টোকা দিলেই ব্যস, পেয়ে বসে। সবচেয়ে প্রিয় দোরপদি।

আমি আবুল বাশার, চবিতে বাংলার সহকারী অধ্যাপক। আমার ছাত্র একজন, সালাম। তৃতীয় বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে উঠিয়াছে। ওর বাপের হুঁশিয়ারি ফাইনালে ভালো করিতে না পারিলে, খবর আছে। মামাতো বোন সাবানীর সঙ্গে শাদির কথাবার্তা পাকা, তা ফেনার মতন উড়িয়া যাইবে, এবং রোজগারের জন্য পাড়ি জমাইতে হইবে টাউনের ফিসারি ঘাটে, কিছু ইংরাজি শেখার পরও এ তো রীতিমতো অধঃপতন! ঠেলার নাম বাবাজি, তাই সেসনের গোড়াতেই আমার কাছে ভিড়িয়াছে। কি কি পড়িবে, কিভাবে পড়িবে—তারই হিসাব চায়—যাহা পড়িবে তাহাই পরীক্ষায় আসিতে হইবে—নষ্ট করিবার মতো সময় তাহার নাই। দিকনির্দেশনা চায়, ঠিকঠিক সাজেশনও। আমার ভাতিজা হইলে ওর গালে একটা বিরাশি সিককার চড় মারিতাম। কিন্তু ওকে শুধু ধমক দিলাম। সে দমিল না। ভিসির বাসাতো কৈলাস, মানে সর্বোচ্চ জায়গায় ঃ আমি যেখানে জরুরিভিত্তিতে ঠাঁই পাইয়াছি সে দু'নম্বর অতিথি ভবন

কয়েক সিঁড়ি নিচে, যদিও পাহাড়ের ওপরেই। ক্যামপাসে তো পিছে পিছে হাঁটেই, দু'চারদিন পর-পর ওপরেও ওঠে। ওকে ছাঁটিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য নিয়া আসল সমস্যা কি জানিতে চাহিলাম এবং বাড়ি কোথায়, তাও। এর জবাবে আমি ভীষণ খুশি। সামুদ্রিক দ্বীপেই শুধু বাড়ি নয়, মাছ ধরিবার নৌকাও আছে। কখন কাহার ছাপ্পর ফাঁড়ে কহা যায় না; কম্পাসের কাঁটার মতো শুধু একই বিন্দু স্পর্শ করি বলিয়াই হয়তো এতদিনে কপাল খুলিয়া গিয়াছে। চাকরির প্রথম পাঁচ বছরের টাকা পয়সা সাহিত্যের পিছনেই ঢালিয়াছি—কোন কাজ হইল না। দাঁতে কামড় দিয়া প্রথম কাব্যগ্রন্থ বার করিয়াছিলাম। একটা কপিও বিক্রয় হইল না। উল্টা পুস্তক বিক্রেতার ধমক খাইয়া গাঁটের পয়সায় রিক্সা ভাড়া করিতে হইল। শেষে এক টাকা কেজি দরে এক ঠোঙাওয়ালাকে গছাইয়া দিলাম। বইমেলায় লাইন ধরিয়া টিনএজার পোলামায়ারা আমার কিতাব কিনিবে না, জানি কেন, আমি তাহাদের রসদ দিতে পারি না। একরাতে ভাবিতে ভাবিতে, ইউরেকা! আমি গাঙে গাঙে ঘুরিয়া বেড়াইব। পদ্মানদীর মাঝির মতন একখান উপন্যাস লিখিব। ব্যস, গরম গরম রুপেয়া না মিলিলেও, এনাম মিলিবে—সম্মান। তখন সেই সুযোগে খারাপ জিনিশ বাজারে ছাড়িব। আমাকে অবহেলা? পাঠিকাদের ঘুম হারাম করিয়া দিব। কিন্তু এখন? আহাহা এখন দেখিতেছি আমার গোবেচারা পড়ুয়াটি সোনা নয় হীরাখনির সন্ধান দিয়াছে, এই ছোট ছোট—এখন আমি আর নদীর কাহিনী লিখিব না। লিখিব সমুদ্র উপাখ্যান। নামও একটা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি—বার দরিয়ার জেলে। একেবারে আলাদা, টাটকা জিনিশ! আমার বই সুইডেন হইতে আরেকটি নোবেল ছিনাইয়া আনিবে। এবার নিয়া তৃতীয়বার আসিলাম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। বিষয়বস্তু ভিতরে ঢুসাঢুসি শুরু করিয়া দিয়াছে। আর দেরি না। শহরে ফিরিয়া লিখিতে শুরু করিব।

অধ্যাপক কেতাদুরস্তই আছেন, কিন্তু তা'বলে ছায়াছায়াকায়া হলেও একজন লেখককে কিভাবে পরাস্ত করবেন? তা অসম্ভব। আমি অদৃশ্য, সারাক্ষণ এদের সাথেই আছি।

আসলে জানের কসম ছাড়া কোন বড় কাম করা যায় না, এটা ঠিক। এসপার কি ওসপার। কোনকিছু জয় করতে দুঃসাহসী হওয়া চাই। সত্তরের সাইক্লোন তো ছিল আদপেই কেয়ামত, লাখ লাখ আদমি শিশু নারী গবাদিপশু মারা গিয়েছিল। বাড়িঘর তছনছ, কোথাও কোথাও চিহ্নহীন। সেই এক বড় কিসসা। যদিও ছাত্র, শিক্ষকের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। ওদের ঘরবাড়ির পরিচয় দিতে গিয়ে যে নামটা উচ্চারণ করে, তা কুতুবদিয়া। মহান কুতুব আউলিয়ার নামে নাম। এর ইতিকাহিনী বলতে থাকে সালাম, আপন মনেই।

কুতুবদিয়া এখন ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা। কান পেতে থাকতে চক্‌চক্ করে অধ্যাপকের চোখ, যত সাধারণই হোক এ-ই তার ট্রেজার আইল্যান্ড! ছাই কুড়াতে কুড়াতে হঠাৎ রত্ন মিলবে না; তা কে জানে! ছয়টির মধ্যে একটি আলি আকবর ডেল। নিম্নশ্রেণীর জেলেদের বাস। পুবপাশে সমুদ্রতীর। সেখানে ওদের পাড়া। লোকসংখ্যা কম না, বেশ কয়েক হাজার। ঘূর্ণিঝড়, গর্কিতে কমে যায়, আবার বাড়ে। সাগরে জাল ফেলে মাছ ধরাই ওদের জীবিকা। মাছই ওদের রুপালি ফসল। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক অবস্থা, তার মধ্যেও ঘরে থাকতে পারে না। বাঁচার তাগিদে ত্যাগ করে জীবনের মায়া। তাতেও ঠিক মতো পেট চলে না, ধনী হওয়া তো দূরের কথা। ওরা শতকরা আটানব্বই ভাগ নিরক্ষর। খায় মোটাচালের ভাত, আর মাছ। কখনও শুধু সেদ্ধ। মাছের মধ্যে প্রথম ইছা লৈট্টা বাংলা ফিস পাতা। কালাহাঙ্গর কাছিম কাট্টা কাঁকড়াও বাদ যায় না, এগুলান সাধারণত মুসলমানেরা খায় না। কাপড়চোপড় সামান্যই, তাও অনেকের ছেঁড়া নয় ময়লা। মেয়েরা কম দামী চলতি শাড়ি পরে, সোনারুপার অলঙ্কার কম। বেশিরভাগ প্লাসটিক।

এমন খারাপ হাল, তবু যেন নিশ্চিন্ত, কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। অনেকের কলজেও বড়। আরেকটি, ব্যাপার, স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখে তারাও। কিসের স্বপ্ন? সে সবের মধ্যে একটা অদ্ভুত : কেউ কেউ ভাবে এবং কারুর কারুর কাছে এটা এক অন্ধ বিশ্বাসও সমুদ্র একদিন তার রহস্যের ঝাঁপি খুলে দেবে, মাছের বদলে ওরা পাবে মণিমুক্তা হীরাজহরত। কপাল ফিরে যাবে তখন। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে মরে যায় একদিন।

একটানা এভাবেই চলেছে প্রবাহ। বৈচিত্র্যের মধ্যে একটিই শুধু আছে, দুর্যোগে গণমৃত্যু।

আরাকান কিংবা বর্মা থেকে সম্ভবত হজরত দরবেশ যখন আসেন এবং চরের মাটিতে আস্তানা গাড়েন-সে প্রায় চার শ' বছর-তখন এখানে জনমানব বিশেষ ছিল না। সাগর থেকে উঠেছিল। ভূখণ্ড কুমীরের পিঠের মতো। সাধকগণ সাধারণত সৈয়দ বংশের আওলাদ-পরমভক্ত, প্রেমিক দরদী, ন্যায়বিচারক। এমনি একজনকে ঘিরে তাঁর উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে বসতি। তখন ডোমেরা মাছ ধরত। গ্রামের ভাষায় ডোম, পরিচয় দিয়ে বলে, জলদাস। এরা ধর্মে হিন্দু, তাঁদের বারোমাসে তেরো পূজা। বাঁশের তৈরি ছোট ছোট কুঁড়েঘর। সব এলোমেলো। পাড়ার ভিতরের রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, জোয়ার এলে ডুবে যায়, তখন ঘরের মধ্যেই বসে থাকতে হয়।

তিন রকম চলন মাছ ধরার : বড়শি যান্ত্রিক নৌকা-এগুলো পারের কাছাকাছি ছোট মাছ ধরার জন্য। ইলিশ ধরতে ফিশিং বোট। এটা খুব জনপ্রিয়।

ভাদ্রের মাঝামাঝি মানে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম থেকে মরশুম শুরু। দ্বীপের ঘাট থেকে রওয়ানা দিয়ে সোজা দক্ষিণে আকিয়াব বর্ডার ইস্তক চলে যেতে হয়, লাগে উনিশ ঘণ্টার মতো। গতিবেগ ঘণ্টায় পাঁচ মাইল, তাই দূরত্ব পঁচানব্বই। পঞ্চাশ তিরিশ বিশ ফিট, পাহাড় সমান ঢেউ সর্বদাই। নৌকা পানির ভিতরে ঢোকে এবং বাহির হয়, কে সামলায়? সোয়ালি যে-ই হোক তার বুকের পাটা কম থাকলে চলে না। অন্যেরা তখন হয়ত ঘুমাচ্ছে, ওর উপরই বাঁচাবার পুরা দায়িত্ব! দিয়া থেকে বার হয়ে মাছ ধরার পর সোজা চট্টগ্রাম, মাছ বিক্রয় করতে। টাউনের ফিশারিঘাটে কুতুবালি থানার সোজা দক্ষিণে আধা মাইলের মতো। দ্বিতীয় ব্রিজঘাট, তৃতীয় চেয়ারম্যান ঘাট এবং চতুর্থ ইয়াকুবনগর। সব পাশাপাশি। এত কষ্ট। দর আর কত। প্রতিমণ সাত শ' থেকে হাজার টাকা।

ইলিশ ধরা পড়ে দশ থেকে পনের দিন। মাঝে মাঝেই, কানুর ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে শুনতে ওদের কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। দশ দিন মাত্র জাল ফেলেছে, জাল টেনেছে। আগেভাগেই ফিরে আসতে হল। দশ দিনে মাছ উঠেছে নেহাৎ কম না। সেলে দিতে যেতে হবে অবশ্যই, বাপবেটাকে ঘাটে নাবিয়ে দেবার পর।

এদিকে বড় তরঙ্গ নেই, অল্প ঢেউয়ে বোট ভালোই চলছিল—ইঞ্জিনের ভট্‌ভট্ আওয়াজ শোনা যায়। বাতাস থাকলে জলের ছিটা এসে পড়ত। ওদের ভালোই লাগছিল, ঘুম-ঘুম ভাব।

অনেকক্ষণ কথা বলছিল না জগমোহন এবং যখন চুপ হয়ে থাকে তখন তাকে লাগে কালোপাথরের মতো। গোধূলির রং মুছে-গেছে, আঁধার নামছে। দ্বীপের কাছে এসে পড়েছে ওরা, হঠাৎ খেয়াল হতে পাষাণটাই যেন আওয়াজ দিয়ে উঠল, হানু! হানু! ও হানু! আর কিয়র চিন্তা! আরা তো বাড়ির হাছে আইগি গে।

উৎসাহহীন কানু, মুখটা তুলে সামনে তাকিয়ে দেখে, ঠাণ্ডা গলায় বলল, হ আইগি গৈ।

আর তো বিড়ি নাই। একটু জোর দিয়েই বলল জগমোহন, আর লাই উগ্‌গা তারাবিড়ি লই আয়।

আইর—। মনমরা কানুর জবাব।

বক্‌রবকর করতে থাকে জগমোহন, আরে ও হানু। তুই তো হপন দেইলি খুউব

খররাপ। আমিও ইমুন হপন দেইতাম। কি অইল। যদি আই হামাক্কা মারা যাই তইলে তুই হি গরবি।

একটা বিড়ি বাড়িয়ে দেয় বাপের কাছে এসে—কানু বলে, হি গৈরগম আর—

জগমোহন বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলল, আ তোর মা বহুৎ ভালা মাইয়া আছিল। আরে হত দেইত পাইত্তো। আর মুক্তারে নিজের মাইয়ার তোন্ বেশি জাইন তো। আরে ফালাইয়া হনদিন হন পিডা নহাইত। আর তোর মারে লইয়ারে পইল্যা মইষখালির তীর্থৎ যহন গেইলাম, তীর্থর মেলা দেইয়েরে তোর মার কি খুশি, আজও মনৎ ফড়ে—

এ সময় কানু হালটার দিকে হাত বাড়ালে ওকে ছেড়ে দেয় ওটা, তারপর নিচের দিকে পাটাতনে গিয়ে বসে।

সে কি দুঃস্বপ্ন দেখেছিল যে জন্য এতটা অস্থির, সাহস করে জিগগেস করতে পারেনি কেউ। সে কেবল জানে। মুক্তা, মুক্তা। দু'রাত ওকে দেখেছে সে বিয়ের সাজে, সে কি হাসিখুশি! হাতে পায়ে কানে নাকে মাথায় গলায় সোনার জেওর, পরনে বেনারসি শাড়ি! বরটা ছায়ার মধ্যে ছিল, চেনা যায়নি। যে পিছে লেগে আছে, সেই তো হবে। সানাই বাজছিল। এবং ঢোলডগর। এখন স্মৃতিতে আবার ভেসে উঠতেই সে বিড়বিড় করে, মুক্তা! ও মুক্তা! তুই আরে ফেলি ন যাইস। তুই গেলে গৈ, আই না বাইচ্চম।

দরিয়ার পানিও কোন জায়গায় গিয়ে শেষ হয় কিন্তু গরিবের দুঃখ অনন্ত, অসীম। দুর্গতি তো অনেক রকম। একদিকে সমুদ্রের জো বাড়ে, ঐ সময় ঘরে ঢুকে পড়ে নোনাপানি। অন্যদিকে তুফানের কাল। তার মার বর্ণনা করা যায় না। এরই মধ্যে বিত্তশালী লম্পটদের নানা কারবার। ওদের মধ্যে শিকদার বাড়ির এক ভদ্দরসন্তান। নাম জাফর আলম। সামান্য টাকার জন্য সে জেলেপাড়ার হরিহর জলদাসকে জেলে পোরে। এদের আদালত নেই, নেই উকিলমোক্তার। তার মেয়ে সুন্দরী নবযৌবনা বিছুনিকে বিয়ে ক'রে ফেলল। আগের বৌ তো আছেই। এই ঘরে এখন দুই ছেলেমেয়ে। ওদের ভরণপোষণ চালায়। অথচ নিজ নিজ ধর্মে আছে। অনেকের মধ্যে আরও দু'জন : রহিমদাদ সওদাগর আর ইসহাক বহদ্দার। জেলেপাড়ার মোড়ে প্রথমজনের চটকদার জিনিশে সাজানো মনোহারি দোকান। বিশাল এক মাকড়সার মতো এই জাল পেতে রেখেছে। সুশ্রী ও তরুণী, মেয়েদের ধরবার জন্য। টাকা পয়সা শাড়ি দিয়ে বিছুনিকে গোপনে হাত করেছে। বাইরে মিঠামিঠা বোল, সে এখন কুটনি।

মুক্তার জন্য ওকে লাগিয়েছে। একানব্বইয়ের তুফানে জখম হয়েছে সাধু জলদাস, মুক্তার কাকা। রোজগার নেই, পঙ্গু। তাকে বাগ মানাতে আর কতক্ষণ? জগমোহনের পাতানো বন্ধু ছিল মুক্তার বাপ রামচন্দ্র জলদাস একই ঘূর্ণিতে সাগরে নৌকাডুবিতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তাই বেশি মুশকিল।

সাঙাৎ জেলেরা কেউ কেউ জানিত কিন্তু কোন গুরুত্ব দিত না। দু'চারজন হাসাহাসিও করিত। কিন্তু ঠিকই বুঝিতেছিলাম রোগটা কি এবং কতদূর যাইতে পারে। সালামটা শাদাসিধা, বোকাও বটে। মুরুব্বির সঙ্গে কথা বলিতে কোন কোন জিনিশ গোপন করিতে হয়, সেদিকে ওর খেয়াল থাকিত না। আমার সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে ঝুলির বিড়াল সব আউট করিয়া দিয়াছিল। সে মজা পাইত। গল্প নয়, সত্য কথা। তার ঘটনার সূত্র ধরিয়া বিশ্লেষণ করিতে করিতে এবার গভীর সমুদ্রে যাইবার সময় আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। যে রকম কার্যকারণ, কেসটা তো হোমিসাইডালও হতে পারে। কৈশোর প্রেম সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মোহময়। আবার মারাত্মকও। সহজে প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতেও পারে। লায়লী

যজনু কৈশোর প্রেম, রোমিও জুলিয়েট কৈশোর প্রেম। দুই বন্ধুর পুত্র কন্যা, বাড়িও পাশাপাশি না হইলেও কাছাকাছি। একানব্বইয়ের ভয়ঙ্কর তুফানে যে বাঁচিয়া ছিল সে প্রায় দৈবী ঘটনা। ছাব্বিশ তারিখ হইতে মেঘাচ্ছন্ন, আটাশ তারিখ আসমান শুধু লাল। চারদিকে রেডিও সঙ্কেত, রেড ক্রিসেন্ট সঙ্কেত। তাতেও বিশেষ ভীতির সঞ্চার হইল না। এমনি ধরন। কিন্তু বিকাল চারটায় উত্তরপুব কোণ হইতে যখন বাতাস একটু-একটু আরম্ভ হইল, তখন কিছুটা বিশ্বাস হইল তুফান অবশ্যই আসিবে। রাত সাতটায় গতিবেগ আরও বাড়িয়া গেল। বাতাস বাতাস। আরও বাড়িতেছে। নয়টার দিকে ভয়ানক। ছোট ছোট ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উড়াইয়া নিতে লাগিল। রামচন্দ্রের ঘর সবটা, জগমোহনের অর্ধেক। ছেলেমেয়ে বৌ আগলাইয়া বাতাসে ঠেলিয়া ঠেলিয়া এদিকে আসে। কানুর পরনে হাফপ্যান্ট মোটা গেঞ্জি, ঘরের চালের শেষাংশে দড়ি বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। জগমোহন ধীরস্থির, পরিবার তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কানু হঠাৎ শুনিল মুক্তার চিৎকার। সব ছাড়িয়া দৌড়াইয়া গেল। তাহাকে জাবড়াইয়া ধরিল। তখন কানুর বয়স পনেরো, মুক্তার নয় বছর।

কুপি তো আগেই গিয়াছিল, আড়ালে রাখিলেও, হারিকেনগুলিও বেশিক্ষণ রহিল না। থাকে কেবল ঝড়ের শোঁ শোঁ শন্‌শন্ শব্দ, আর অন্ধকার, আচানক কাণ্ড। কানু মুক্তাকে জড়াইয়া ছিল। টানিতে টানিতে কোণের বড় গাছটার নিচে নিয়া গেল। তোলপাড়ের মধ্যে কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। মুক্তার কানে সবটা জোর দিয়া কানু বলিল, এই তুফানে তারা বাঁচিতে পারিবে না, মারা যাইবে। মরিবার আগে তাহাদের বিবাহটা হোক। মুক্তা কিছু বুঝিল না, বলিল ঠিক আছে। কানু স্বামী হইল, মুক্তা স্ত্রী হইল। কানু কোমরে গোঁজা চাকুটা খুলিয়া বাঁ হাতের তর্জনিতে ঘাই মারে। টিপ দিলে রক্ত বাহির হইল। সে-রক্ত, ডান হাতের আঙুলে নিয়া মুক্তার কপালে টিপ আঁকিয়া দিল, এবং সিঁথিতে মাখিল সিঁদুরের মতো। পরের দিন দুইজনকে পরস্পর ধরাধরি অবস্থায় সাগরপাড়ে পাওয়া গিয়াছিল। ধন্যবাদ সালাম, মনে-মনে বলি, এমন চমৎকার একটা ঘটনা পাইব কল্পনায় ছিল না। আমার বইটা অনন্য হইবে, কেউ তা ঠেকাইতে পারিবে না।

একটা অমর সৃষ্টি হবে, ভালোই তো। নতুন শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্যের একটা নতুন গৌরব হোক এটা প্রয়োজন।

অনেক কিছু জড়ো হয়েছে, কিন্তু শেষটা? শিল্প সফলতার ভরকেন্দ্র উপসংহার। অধ্যাপক এদিকে সচেতন আছেন, আশার কথা।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ছাত্রের বাড়ির বৈঠকখানার খাটে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কানুর মানসিক অবস্থা শোচনীয়। মনে হতেই উঠে বসেন। সালাম ভিতরে ছিল, ওকে ডেকে আনলেন। এবং তক্ষুণি খোঁজখবর নিতে জেলেপাড়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

ফেরবার কিছু আগেই রাত নেমেছিল। সারাটা পাড়া অন্ধকার, কোন কোন কুটিরে হারিকেন। বাপটাকে ঘরে রেখে কানু বেরিয়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে হাঁটছে। এক কোণে থামে, কান পেতে শোনে ভিতরে কে ঠাস্‌ঠাস্ করে বলছে, মুম্মা হই—মু আব্বা ডাকের। মু হাক্কুরে হইলাম দে মুর জিনিস, হান ঠিক হরিবাল্লাই। মু হাক্কু ঠিক হইরল না।

আরেক জায়গায় গাল দিচ্ছে কে, ইতির মতো হাইতাম বলিআরউ, ও তোর হইলজা হাইতাম বরিআরউ। তুর বাপদাদারে দিতাম বরিআরউ। শব্দ শুধু কানে বাড়ি খায়, সব শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। বোট থেকে নামলে কিছু দূর থেকে সুধাংশু জলদি এসেছিল। বলেছিল, হুঁশিয়ার হতে। মুক্তাকে সওদাগরের কাছে দিয়ে দিতে। ফিসফাস আলাপ চলছে। চিৎকার করে উঠতে চাইছিল কানু, কিন্তু কষ্টে সামলে নেয় নিজেকে।

বাড়িতে ফিরে রামদাটা বার করে রেখেছে।

পা টিপে টিপেই কাছে আসে : মুক্তাদের কুঁড়ের ভিতরে দুটো হারিকেন। একটা বড়, একটা ছোট। বড়টার কাছে জলচৌকিতে বসে আছে মুক্তা, পরনে চেক শাড়ি ঠোঁটে রং। ছোটটার কাছে কাকু, মা চন্দনা। এবং কুটনি বিছনি। প্রবীণা দু'জনেরও সাজগোজ মন্দ না। কিছুক্ষণ দেখেই মাথায় ব্যথা, ঢিবঢিব্ বুকে দরোজায় থাপড় মারে। চন্দনা উঠে এসে খোলে, কানুকে দেখামাত্র বলে, ও ডা তুই?

কানু জবাব দিল, আই আইগি গৈ।

ওকে ভিতরে নিয়ে চৌকির ধারে বসায় এবং প্রথম আস্তে আস্তে কথা বলতে থাকেন সাধুচন্দ্র জলদাস। তখন সালাম গিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু সাড়া দেয় না। যতটা পারে দেখে বেড়ার ফাঁকে এবং কথা শোনে। সাধুর পরে চন্দনা, চন্দনার পরে বিছুনি। সুন্দর সুন্দর, মহৎ কথাবার্তা। ভালো ভালো উপদেশ। সবকিছু শুনে কলজে ঠাণ্ডা। ওদের আলাপের সময় লাস্যময়ী মুক্তা মিটিমিটি হাসছিল।

কালোমুখে কানু উঠে দাঁড়াল। মুক্তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটি মাত্র শব্দ বলে, আইর।

নিজেই দরজা ঠেলে বাইরে গেলে কারুর অনুমতি না নিয়েই মুক্তা তার পিছে গেল। একটুখানি রাস্তা। প্রায় ঠেলা মেরে সামনে যায় এবং ঝপ্ করে নিচে বসে দু'হাতে জাবড়ে ধরে তার পা দু'খানি, কাঁদো কাঁদো বলতে থাকে, আরে মাফ গরি দিয়ো। আই তুরে ভালোবাসি। আরা ভালামত বাঁচতে চাই। লোকটা আমাগোরে টাউনৎ লই যাইব। কাকুর অপারেশন গরাইব। আমাগোরে ভাল বাসাৎ রাইবো।

বহুৎ হইর, যা যা। সজোরে ঝাড়া দিয়ে ফেলে লম্বা লম্বা পায়ে কানু চলতে শুরু করে। কোথায় যাচ্ছে? মুক্তা ফুঁপিয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ হাউকাউ করলে পড়শিদের এল কয়েকজন। বিপত্নীক জগমোহনের প্রতি সহানুভূতি আছে। বিন্দুর মা একটা ইলিশ কে[illegible]জে। মোটা চালের ভাতও রেঁধে দিয়ে গেল।

নিশিতে পাওয়া লোকের মতো, কেউ যেন হাঁটাচ্ছে কানু জলদাসকে, বাড়ির কাছেও এনেছিল। ভিতরে ঠেলে দিলো না। প্রস্তুত করে রাখা চাপাতিটা পড়ে রইল তেমনি। উপলব্ধি করে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাউকে খুন করার মতো শক্তি ওর নেই।

নিজেদের বাহির আঙিনায় দাঁড়াতেও পারছে না, আবার কে যেন তাঁকে ঠেলতে শুরু করেছে। নিয়ে আসে সাগর পার। যায় জলের কাছাকা[illegible] ঢেউ এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিমেষে অতীত বর্তমান [illegible] একটা ঝাপটা দিয়ে গেল। সে আত্মহত্যাই করবে দরিয়াতে ডুবে। আত্মহত্যা, আত্মহত্যা।

এখানে ঘোর অন্ধকার নয়, নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে আভা-আভা।

হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলেছে। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তৈরি হয়ে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় শোনে সামনে কাদের যেন ঝোপাঝোপা কণ্ঠস্বর। সমবেত টানা বলছে, এই কি গরস তুই হানু, ভুল গরছস্, দরিয়াৎ হুনো জায়গা নাই, আরা আজার আজার মানু দখল গইরা রাইছি। মাইন্ষে মারছে, গরহিতে মারছে, আহালে মারছে, আরা মরা। তুই জ্যাতা। ভাগ্ ভাগ্।

হতাশায় বালুর ওপরে লেপটে বসে পড়ে, এখন মাথাটা ঘুরছে। দূরে ওপরের দিকে সালামকে নিয়ে অধ্যাপক কি ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত কানুকে পা টেনে টেনে ফিরে আসতে দেখে উঠে পড়লেন এবং বাড়ির উদ্দেশে দু'জনে চলতে লাগলেন।

ফেব্রুয়ারি ২০০১